প্রথম সংস্করণ

চার টাকা

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে সত্যশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক
প্রকাশিত ও সোমা প্রকাশন ২এ, কেদার দত্ত লেন, কলিকাতা-৬ বাবুলাল প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত।

পিতৃস্মৃতি ও মাকে

রচনাকাল : ১৯৫৯-৬০

রচনাকাল : ১৯৫৯-৬০

॥ এক ॥

দ্বারিক সর্দার গান ধরেছে। সমুদ্র থেকে সে গান হাওয়ায় হাওয়ায় অনেক মাতলা বাসন্তী পুরন্দরের মুখ পেরিয়ে মাঝি-মাল্লাদের গলায় সুর তোলে। কেমন যেন বুক ভরে যায়। ক্লান্তি ঘোচে। মদদ লাগে দুই বাহুতে। ঘোর আঁধারে নোনা জলে আগুন জ্বলে।

খেয়াপাড়িতে শেষ সুর লাগে বৈঠার। নদীর ঢেউয়ে নাচন লাগে। দূরে কলের জাহাজ। আলো পড়েছে ঢেউয়ের চূড়ায়। প্রপেলারের বিমুগ্ধ শব্দ বাতাসে ছড়ায়। হাসনাবাদের কলের জাহাজ জল কাটে। যেন রাজহাঁস রে! দোলা লাগে নৌকার তলপেটে। কেয়ার খোলের মত নাচে। শক্ত করে বৈঠা ধরে দ্বারিক সর্দার। ভাঁটার মুখে জল কেটে পাড়ে নৌকা ভিড়ায়। একে দুয়ে সওয়ার নামে। গাংভেড়ির পথ ধরে। দ্বারিক গ্যারাপি ফেলে। আরেক দিকে গেঁওর ডালে কষে বাঁধে নৌকার রশি। কি জানি, শেষরাতের জোয়ার বেলায় নৌকা ভেসে কোথায় যাবে, তখন মাথার ওপর বাঘের চোখের মত চকচকে চাঁদ। যেন ভেটকির একটা আস্ত আঁশ।

সন্ধ্যাতারা এখন মাথার ওপর। আকাশে চাঁদ নেই। ও একা জেগে আছে। একটুকরো মেঘ বুকে জল নিয়ে প্রসব বেদনায় নিথর। ঝর ঝর ঝর। এখনই শুরু হবে বুঝি। গড়খাইয়ের জলে পায়ের কাদা ধুতে ধুতে একবার আড়চোখে চায় দ্বারিক। বৈঠা কাঁধে গাংভেড়িতে উঠে আসে। ঘরের পথ ধরে। অন্ধকারে ঘরের পথে তরতরিয়ে চলে সে। কত চিন্তা ভিড় করে আসে; যেমন আসে আসমানের বুকে মেঘেরা। সারা বেলা কাজে গেল। তখন ভাববার সময় কোথায়। ঘরের পথে ভাবনায়, চিন্তায় সুখ আছে।

বাতাসে টান ধরেছে। আকাশ থমথমে। দূরে মেঘের বুকে একটা ঝিলিক খেলে গেল। বাবলার বনে, গড়খাইয়ের জলে, হেঁতালে-গেঁওতে একটা নীল লাল সবুজ আকাশি-তরমুজ আলো ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল, আর সর্দারের নিকষ কালো পেশল বুকে, মুখে আর চোখে। দ্বারিক সর্দার থমকে দাঁড়ায় বাঁকের মাথায়। সামনের হিজল গাছটার শুকনো ডালে একরাশ অন্ধকার সাপের মত জড়িয়ে আছে' সারা গাছটায় লতিয়ে উঠেছে তেলাকুচোর ঝাড়। তার লাল টকটকে ফলগুলো দিনের আলোয় কেমন সুন্দর। এখন থোকা থোকা অন্ধকার যেন। দ্বারিক গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল। তখন ওর মনে ধূসর স্মৃতির রোমাঞ্চ লেগেছে। একটা পিঙ্গল ভাবনা, তার সাথে কতকগুলো প্রতিজ্ঞা আর প্রতিশ্রুতি। পাঁচটি বছর ধরে সেগুলো সে মনে মনে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর যতবারই রাত্রির অন্ধকার নির্জনতায় বাঁকের মুখে এই হিজল গাছটার সামনে এসে সে হোঁচট খেয়েছে, ততবারই মনে হয়েছে ঐ তেলাকুচোর ফলের মত দুটো চোখ তাকে পাঁচ বছর ধরে অনুসরণ করছে। তার চলাফেরা ওঠাবসা,:এমন কি মনের ভাব-ভাবনাগুলোর খোঁজও চোখ দুটো রাখে। তাই গাছটার সামনে এসে থামতে হয়; মাঝে মাঝে আতঙ্কে, আশঙ্কায় আর প্রাচীন শালের মত এক পুরনো ভয়ের ভাবনা তার সারা মনে তখন কাজ করে। ঘরের জাফরির ফাঁকে যেমন সূর্যের আলো, মনের ভয়-ভাবনার ফাঁকে তেমনই ঘটনাটা উঁকি দেয়।

দিনটা ছিল হেমন্তের ভোর। আগের রাত্রিতে দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম বিদ্যাধরী আর পাঠানখালির পাড়ে ঘুরে ঘুরে সম্ভব অসম্ভব সব ঘরে খোঁজ করে, বিল-বাদা ডহরের পাড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আশঙ্কা আর উত্তেজনা নিয়ে এসে থেমেছিল এই হিজল গাছটার নীচে। শুকরামই প্রথম দেখল কি যেন একটা ঝুলছে হিজল গাছটার ডালে। হেমন্তের কুয়াশায় লাসটাকে ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না। লণ্ঠনের আলো তুলে ধরতেই তারা দেখল শুক্রমনিই বটে। দ্বারিকের বিবি। দ্বারিক পাথর হয়ে গিয়েছিল। শুকরামই লাসটা কাঁধে করে নামিয়ে নিয়ে এল। সারারাত্রির হিম আর কুয়াশায় শুক্রমনির শরীরটা হিমশীতল। চোখদুটো বেরিয়ে আছে আধফোটা রক্তজবার কুঁড়ির মত।

সেই চোখ দুটো এখনও দ্বারিককে অনুসরণ করে। এই মুহূর্তেও দ্বারিকের পেছনে থমকে আছে। বিশ্বাসটা দ্বারিক সর্দারের বদ্ধমূল, কিন্তু কথাটা যখন সে ভাবে তখন আতঙ্কের চেয়ে দুঃখই পায় বেশী। এই অন্ধকার সারৎসারে হিজল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সেরকমই এক বিশেষ বেদনায় দ্বারিকের মাথাটা সামনের দিকে বেশীরকম ঝুঁকে পড়ে। একটা রাতচরা উকাশ আকাশ দিয়ে উড়ে গেল ডানায় শব্দ জাগিয়ে। সেই শব্দেই হুঁশ হল তার।

এক সময় বাঁকটা ঘুরে চলতে শুরু করে দ্বারিক। ঝুমুরবিবির কথা মনে হয় ওর। এমন রাত্রিতে ওর কথা বেশী করে মনে আসে। তাই ঘরের পথ ছেড়ে জানাঘেড়ির পথ ধরে। রাক্ষসবন্দি ঘাটের ডানহাতি হোগলায় ছাওয়া কুঁড়েটায় সে যাবে। সেখানে থাকে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার ঝুমুর ধাই। কিন্তু দ্বারিকের কাছে এখনও সে ঝুমুরবিবি। তার সাথে দুদণ্ড কথা বলবে দ্বারিক। এক সময় মনটা হাল্কা করে বাড়ি ফিরবে। শুক্রমনির চোখ দুটো এখনও দ্বারিকের পেছন পেছন চলেছে। তার সাধের বিবির আধফোটা রক্তজবার কুঁড়ির মত চোখ দুটো, যে চোখ জোড়া একদিন গড়খাইয়ে ফুটে থাকা পদ্মের মত নীল ছিল। মনে মনে একবার কল্পনা করল দ্বারিক চোখ জোড়াটা। তার পাশে ঝুমুর বিবির চোখ শান্ত, কোমল। দ্বারিকের পেছনের চোখ জোড়া রক্তজবা, আর সামনের জানাঘেড়ির রাক্ষসবন্দি ঘাটের চোখ দুটি শান্ত কোমল। দুইয়ের মাঝে দ্বারিকের চোখ জোড়া কেমন দিশেহারা বিহ্বল মনে হল। আর চলতে চলতে এ সত্যটা উপলব্ধি করে বিস্মিত হল সে। সারাদিনের খেয়াপারের ক্লান্তি, ঝুমুরবিবির ঘরের দিকে যাবার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা, আর হিজলগাছের অন্ধকারে সেই বিশেষ অনুভূতি—এই সব মিলেমিশে তখন তাকে সত্যিই দিশেহারা করে দিয়েছে। একসময় ডান কাঁধ থেকে বৈঠাটা বাঁ কাঁধে সরাল সে চলতে চলতেই।

সামনে সুন্দরী খাল। তার পাশে নোনাঘেড়ি। নোনাঘেড়ির পাশ দিয়ে একটা পথ সরকারী কৃষিক্ষেতের দিকে, আরেকটা তিন নম্বর ঘাটের দিকে চলে গেছে। তিন নম্বর ঘাটের পথটাই ধরল দ্বারিক। কিছুটা এগোতেই সঞ্জয় গাঢ়ুর বাড়ি। বাড়ির সামনে গোয়ালঘর। তার পাশ

দিয়ে রাস্তাটা সোজা রাক্ষসবন্দি ঘাটে গিয়ে উঠেছে। মোড় ফিরতেই সঞ্জয় গাঢ়ু হাঁক ছাড়ল—কে বটে। দ্বারিক কোন উত্তর দিল না। এ ধরনের প্রশ্নে সে কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। বিশেষতঃ সঞ্জয় গাঢ়ুর প্রশ্নে। আর একবার হাঁক ছাড়ল সঞ্জয় গাঢ়ু। দ্বারিক তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। গেঁও আর হেঁতালের বনের আড়ালে পড়েছে। তারই ফাঁক দিয়ে সে দেখল সঞ্জয় গাঢ়ু লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। আশেপাশে কোন কিছু না দেখে দ্বারিকের পায়ের শব্দটাকে পাড়ের ধ্বস-নামার শব্দ মনে করে আবার ঘরে ঢুকল। দ্বারিকের বেশ একটা কৌতুক বোধ হল দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার জোতদার সঞ্জয় গাঢ়ুর জন্য। লোকটা সারাজীবন ধানের গোলা পাহারা দিয়েই কাটাল। সন্ধ্যা থেকেই ঘরে বসে সস্তা তামাকের হুঁকো ভুড়ুক ভুড়ুক করে টানবে, আর 'কে বটে, কে বটে' হাঁক ছাড়বে। দ্বারিকের সাথে মাঠের ফসল নিয়ে গাঢ়ুর লোকদের একবার কাজিয়া হয়েছিল। গাঢ়ু মশাই কথাটা জানতে পেরে সর্দার পল্লীতে এসে লাঠিতে ভর দিয়ে শাসিয়ে গিয়েছিল। ভাঙ্গা গলায় (সারাবছরই সঞ্জয় গাঢ়ুর গলা ভাঙ্গা থাকে) টেনে টেনে বলেছিল —এ যে দেখছি ব্যাঙাচির সাঁতার কাটার শখ! তা কাট, শেষে পেট ফুলে মরতে হবে তা বলে দিলাম। দ্বারিক সে কথার কোন জবাব দেয় নি। শুধু মিষ্টি হেসে বলেছে—তা-আ সেদিন এসে পেটটা চিইড়ে দে-খেন। এ রসিকতায় গাঢ়ু আরও চটেছে। যেতে যেতে বলেছে—যত সব ছোটলোকের জাত! বলতে বলতে কোঁচা আর লাঠি জোরে জোরে নেড়েছে। অনেকদূরে গিয়ে লাঠিটা তুলে সর্দার পল্লীর দিকে মুখ তুলে পাশের গোমস্তা রামকানাইকে কি যেন বিড়বিড় করে গাঢ়ু বলেছিল। হয়ত দ্বারিককে জব্দ করার ফন্দি-ফিকিরের কথা। অথবা তার চোস্ত খিস্তিগুলো, যেগুলো সে দ্বারিকের সামনে বলতে ভয় পায়। সেই থেকেই সঞ্জয় গাঢ়ুর সঙ্গে দ্বারিকের বাতচিত বন্ধ।

বাঁশের কঞ্চির তৈরী দরজাটায় দ্বারিক টোকা মারে। সাড়া পেতে একটু দেরি হল। ঝুমুরবিবি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। দ্বারিক বারকয়েক টোকা মারল। সে শব্দে ঝুমুরবিবির পাতলা ঘুমটা ভাঙ্গে। উঠে বসে তাক থেকে কুপিটা জ্বালিয়ে দরজার কাছে আসতে আসতে

বলল—নেশাভাঙ করে আসিস নি তো? এত রেতে বাপু আবার জ্বালাতে কেন!

জানত দ্বারিক এসেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে দ্বারিক মনে মনে হাসে। জানে কথাগুলো বুলি মাত্র। যেটুকু ঝাঁঝ আছে তা গোঁসার নয়, অন্য কিছুর।

দরজা খুলতেই ঝুমুরবিবি দেখল দ্বারিকের মুখটা অসম্ভব রকমের থমথমে; কেরোসিনের কালো শিখায় খুব ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। তবে নেশার কোন গন্ধ পেল না সে। কেমন যেন মায়া হল তার। এদিকে দ্বারিক বাইরে দাঁড়িয়ে ঝুমুরবিবির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর একটা হাত ধরে টান দিল ঝুমুরবিবি। হুঁশ হল দ্বারিকের। এলোপাতাড়ি এক ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছিল। এখন যা আর মনে করতে পারবে না, অনেক চেষ্টা করেও। কিন্তু, সেগুলো মনে করবার কোন চেষ্টা না করেই সে ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

হোগলায় ছাওয়া ঘরটা তকতকে নিকান। একপাশে একটা সুতলির খাটিয়া। তাতে একটা তোশকের ওপর চাদর ও ছোট একটা বালিশ। পাশ-বালিশও একটা আছে। ঘরের এক কোণে মরচে-পড়া একটা তোরঙ্গ। পাশে একখানা জলচৌকি; তার ওপর একখানা লক্ষ্মীর ছবি বাঁধান। সামনে বসান মাটির ঘট। তেল সিঁদুরের চিত্রি করা। আর আছে একটা কাঠের দেড়কো। ঘরের আরেক কোণে একটা তোলা উনুন। কয়েকটি বাসন-কোসন। ছোট ঘর। স্বল্প সেই ঘরের আসবাবপত্র আর আয়োজন। কিন্তু সমস্ত কিছুতে একটা নিখুঁত যত্নশীলতার ছোঁয়া আছে। দ্বারিক খাটিয়ায় বসে সব কিছু নজর করে দেখছিল। এক সময়ে তার নজরে পড়ল লক্ষ্মীঠাকুরণের ছবিটার ওপর একটা সিঁদুরের ঢেপলা উঁচু হয়ে উঠেছে। বুঝল, পুজার সময় ঝুমুরবিবি রোজ ঠাকুরণের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরায়। দ্বারিকের একবার দেখার ইচ্ছে হল ঝুমুর-বিবিও কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরে কি না। সিঁদুরের টিপটাকে কেমন যেন রসিকতা বলে মনে হল ওর। এ যেন পোড়োবাড়িতে গোলা কবুতরের বাথান; এমন সময় ঝুমুরবিবি পাশ থেকে ঠ্যালা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—এলি তো চুপ করে রইলি যে বড়। ঠ্যালা খেয়ে

দ্বারিক নড়েচড়ে বসে। এতক্ষণ তার পা-দুটো খাটিয়ার নীচে ঝোলান ছিল, এবারে পা-দুটো উঠিয়ে নিয়ে আসন গেড়ে বসতে বসতে সে জিজ্ঞাসা করল—তোর কি ডর করে না? প্রশ্ন শুনে ঝুমুরবিবি কেমন যেন একটু হাসে। পরে একটু ঝাঁঝের সাথে বলল—আমার একথাই জিজ্ঞেস করতে মরদ এসেছে রেতে বেরাতে জ্বালাতে, আর সময় পেল না। তারপর আরেক ঠ্যালা দ্বারিককে মেরে দরজার দিকে যেতে যেতে বলে—যা যা, ঘর যা, দানাপানি চাট্টি পেটে দিয়ে ঘোমাগা, ছেলেমেয়ে দুটো একা আছে।

কিন্তু দ্বারিকের ওঠার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

এক সময় ঝুমুরবিবি এসে খাটিয়ায় দ্বারিকের পাশে বসল। কেরোসিনের শিখা কেঁপে কেঁপে ওপরের দিকে উঠছে! একটা মৃদু আলোছায়ায় সারা ঘর ভরে গেছে। সেই আলো-আঁধারের ছায়ায় ঝুমুরবিবির চোখে আরেকটি ঘনকালো ছায়া নেমেছে। এই প্রথম সে দশ বছর পর শুনতে পেল একজন জিজ্ঞাসা করছে, একা থাকতে ওর ডর লাগে কিনা। তাও আবার প্রশ্নকর্তা দ্বারিক সর্দার। সরল মনেই দ্বারিক প্রশ্নটা করেছিল, কিন্তু সে জানত না সূর্যবেড়িয়ার অজগর ময়াল প্রান্তরের হোগলা ছাওয়া ঘরের নির্জন-বাসিন্দা ঝুমুরবিবির জীবনের একটা প্রচণ্ড উপহাস সেই প্রশ্নের আড়ালে লুকিয়ে আছে।

চোখের সেই ঘন কালো ছায়াটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। আর সেই বিচিত্র হাসিটা টেনে টেনে ঝুমুর একসময় বলল—এই নিশি রেতে সেকথা শুনে তোর কি আখের আছে রে! ঝুমরের গলার স্বরটা দ্বারিকের কানে কেমন ভারি ভারি ঠেকছে। সব কিছু বুঝতে না পারলেও দ্বারিকের কেমন যেন মনে হল গলার এই ভারি আওয়াজ আর ঠোঁট-চোখের ঐ বিচিত্র হাসিটুকু কেমন যেন একটা দুঃখের নিশানা দেয়। হিজল গাছের নির্জন অন্ধকারের বিশেষ অনুভূতির সাথে যেন এর কোথাও একটা মিল আছে।

ঝুমুরবিবি…কি যেন বলতে গিয়ে দ্বারিক থেমে গেল। ভয় পেল সে। হয়ত না জেনেই আবার কোথায় ঝুমুরকে আঘাত দিয়ে বসবে। তার চেয়ে চুপচাপ ওর মুখের পানে তাকিয়ে থেকে মনের মেঘটা

হাল্কা করে একসময় ঘরে ফিরবে সে। এছাড়া আর কোনও কথায় সে ভরসা পেল না।

—এবারে মাঠে যাবি না।

—না—সংক্ষিপ্ত জবাব দিল দ্বারিক। কিছু ক্ষণ পর মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে জানাল—নৌকা ভাসিয়েছি জলে, আর ডিঙ্গালের ছায়া মাড়াব না।

—অন্য কোথাও তো যেতে পারিস?

—তা হয় না, জমি বহুত বিষ হয়ে গেছে, দরিয়া অনেক ভালো। দ্বারিক কথা বলতে বলতে ঝুমুরবিবির রুজি-রোজগারের কথা ভাবল। তারও এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা কর্তব্য। কিন্তু কি ভেবে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। ঝুমুরবিবি যেখানে ঝুমুরধাই সেখানে দ্বারিকের কোন কৌতূহল নেই। এবারে ঝুমুরের চোখে জল আসতে পারে। আশঙ্কাটা তার হঠাৎই হল যেন। কিংবা আশঙ্কাটা তার ভাবনার সাথে একটা তির্যক যোগাযোগ ঘটিয়েছে।

সে অন্য এক রাতের ভাবনা যেদিন ঝুমুরবিবি এসে দ্বারিকের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। রাঘব ডিঙ্গালের রক্ষিতা এক সর্দার ক্ষেতমজুরের কাছে আশ্রয় চাইছে। ভাবতেই অবাক হয়েছিল সেদিন দ্বারিক। কিন্তু আজ আর তেমন কোন বিস্ময়বোধ হয় না। ধীরে ধীরে সব কিছুই জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। শুধু মাঝে মাঝে দুই এক জায়গায় খটকা বাধে।

কালো জঙ্গল সাফ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পত্তনদার রাঘব ডিঙ্গাল তার লোকজন নিয়ে এসে বসতি গড়েছিল সূর্যবেড়িয়ার মাটিতে। লেঠেল প্রসাদ পিঁড়ি আর তার নয় বছরের মেয়ে ঝুমুরও এসেছিল সেই সঙ্গে। সে সব তিরিশ সন আগেকার কথা। দ্বারিক চোখ বুজলে এখনও স্পষ্ট দেখতে পায় একটা দশবছরের কিশোরী মেয়ে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার রোদজল বাতাসে একটা রঙিন প্রজাপতির মত হেসে খেলে নেচে বেড়াচ্ছে। মা-মরা মেয়েটাকে প্রসাদ পিঁড়ি আদর দিত খুব বেশী। আদরে আদরে মেয়েটা বাড়তে থাকে। কিন্তু একদিন সবাই শুনল মেয়েটা রাঘব ডিঙ্গালের ফাঁদে আটকে গেছে। অনেকে কথাটা জেনে খুশী হয়েছিল। যা নাচন-কোঁদন ছিল ছুঁড়ির। এ-রকম একটা কিছু

ঘটবে তা অনেকের আগেই জানা ছিল—কেউ কেউ বলল কথাটা। তারা প্রসাদ পিঁড়িকে আড়ালে গাল দিয়ে মনের ঝাল মিটাল; খুশী হল। কিন্তু রাঘব ডিঙ্গালের ওপর কারও কোন অভিযোগ ছিল না। এটা বক রাক্ষসের প্রতিদিনকার নৈবেদ্যর মতো ব্যাপার। যে নৈবেদ্য হল তার ওপরই যত গালমন্দ। প্রসাদ পিঁড়ি তখন বুড়ো হয়ে গেছে। মদ গিলে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। তা না হলে সাধ্যি কি কোন মরদের পিঁড়ির মেয়ের ইজ্জত নিয়ে টান মারে, তা সে যত বড়ই মরদ হোক—একথাও বলাবলি করেছে অনেকে। অবশ্য এ সব কথা শুনেছে দ্বারিক ঝুমুরবিবির কাছে।

তারপর সেই ভর সন্ধ্যা। সমস্ত সূর্যবেড়িয়া সেদিন হাসছে। ঝুমুরবিবি এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারিক সর্দারের সামনে।—বনিবনা হল না, তাড়িয়ে দিল, আমায় একটা ঘর বেঁধে দে, যা লাগে দেব। দ্বারিক আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে নি। শুকরাম আর শুক্রমনির আপত্তি সত্ত্বেও পরদিনই বাঁশের আর হোগলার ঘরটা রাক্ষসবন্দি ঘাটে দিনাদিনি উঠিয়ে দিয়েছিল। এ জমিটুকু প্রসাদের ছিল। এখনও বছর বছর বাঁশ আর হোগলা বদলে দিয়ে যায় দ্বারিক প্রয়োজন মতো। আর সেই থেকেই এই ঘরে আটটি বছর ঝুমুরবিবি বাস করছে। আর এই আট বছরের ইতিহাস ঝুমুরবিবির ঝুমুর ধাইয়ে বদলে যাওয়ার ইতিহাস। লোকমুখে কথাটা শুনেছে দ্বারিক ঝুমুর নাকি গাছগাছড়ার শিকড় বেটে বজ্জাত জন্ম বন্ধ করে; গোপনে পেট খালাস করে। আরও কত কি! এ নিয়ে কোনদিন প্রশ্ন করে নি দ্বারিক। আজ সহানুভূতির ঘোরেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও সে থেমে গেল পাছে ঝুমুর অন্য কিছু ভেবে নেয়।

সুতলির খাটিয়া ছেড়ে দ্বারিক এক সময় উঠল। ঝুমুর জিজ্ঞাসা করে—যাচ্ছিস।

দ্বারিক বৈঠাটা কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে।

তৃতীয় প্রহরে চাঁদ উঠবে। তার আগে ভীষণ অন্ধকার। দ্বারিক তার ঘরের পূবকোণের কদবেল গাছটার কথা ভাবল। কালুয়া তখন তার পিছু নিয়েছে। মুখ দিয়ে সাড়া জাগায় দ্বারিক। কালুয়া পা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

মুখ ঘষে আর গোঁ গোঁ শব্দ করে। আমোদের শব্দ। লেজ নাড়তে নাড়তে আবার চলতে শুরু করে। কালুয়ার উপস্থিতিতে কদবেল গাছটার কথা ভুলে গেল সে আপনা আপনিই।

রাত এখন কতটুকুই বা আর। এরই ভিতর সর্দারপল্লী ঘুমিয়ে পড়েছে। গাংভেড়ির পাশে গেঁওর ডাল দিয়ে তৈরী খোপড়ায় শুকরামের মোষটা ঘুমাচ্ছে। ঘুমাতে ঘুমাতেই মুখ নাড়ছে। বেদানা খাল বাঁ হাতে রেখে দ্বারিক আর কালুয়া এগিয়ে চলে। ও পারে রাঙাবেলিয়ার একটা ধানের কল বসেছে। তারই চিমনিগুলো মাথা তুলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। সেদিকে একবার তাকাল দ্বারিক। ডান কাঁধ থেকে বৈঠাটা বাঁ কাঁধে নেয়। কিন্তু ততক্ষণে সে তার ঘরের দরজায় পৌঁছে গেছে।

বৈঠাটা নামিয়ে রাখে দ্বারিক। অন্ধকার দাওয়ার এককোণে সন্ধ্যায় ফুটান ভিজে লাল ভাতের মাটির হাঁড়িটা হাতড়ে কাছে টেনে আনে। তীক্ষ্ন কুতকুতে ক্লান্ত চোখে ঢেউ ওঠে। পুরু ঠোঁট দুটি কলাই করা থালায় ভাত ঢেলে নেবার আগেই ওঠানামা করে। জলের ভেতর বলিষ্ঠ কুঁকড়ানো আঙ্গুলগুলো আকুপাকু করে ওঠে। কিসের যেন স্পর্শ; সোনা-মাখান জলের তলে ফোলা ফোলা ঘাসের বীজের মত লাল দানার ভাত। ভাত পেয়েছে দ্বারিক। পাকস্থলীটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সে ভাত খাবে। সারাদিন কাটিয়ে। ভাত আর হাঁড়িয়া তার কত প্রিয়, কিন্তু কত দুর্লভ। থালায় ভাত আর জল ঢেলে নেয় দ্বারিক। ভাতের ওপর কিছুটা নুন ছিটিয়ে দেয়। সামনের অন্ধকারে কালুয়া বসে লেজ নাড়ছে, আর চোখ তুলে দ্বারিকের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে ঘোলাটে লাল চোখটা চকচক করে। পাবিরে, পাবি—মনে মনে বলে দ্বারিক। সে খেলে কালুয়াও খাবে। মানুষ আর কুকুর। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার দ্বারিক সর্দারদের বছরে আর কদিনই বা ভাত জোটে। কালুয়ার তবুও কোন বন্ধন নেই। সূর্যবেড়িয়ায় ভাত না জুটলে নদী সাঁতরে বা যাত্রী নৌকায় উঠে সে গোসাবায় বা অন্য কোথায়ও চলে যায়। কিন্তু আবার একদিন ফিরে আসে। দ্বারিক সর্দারের পিছু পিছু। হয়ত গোসাবায় নৌকা নিয়ে গেছে দ্বারিক। কালুয়া কোথা থেকে এসে নৌকায় উঠেছে। দ্বারিক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। শালা কুত্তা কা জাত, নেমকহারাম, কাঁহা

ছিলি। দ্বারিক গালিগালাজ দিয়েছে। কিন্তু কালুয়া গাংভেড়ির ওপর বসে ঠিক নজর রেখেছে; নৌকা ছাড়ার আগে দৌড়ে এসে নৌকায় উঠেছে। কুঁই কুঁই করে কেঁদেছে। অপরাধ স্বীকার করেছে। দ্বারিকও আর কিছু বলতে পারে নি। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায় ভাত না জুটলে গোসাবা, রাঙাবেলিয়া, কচুখালি, মসজিদবাড়ি কোথাযও গিয়ে তাদের ভাত জুটবে না। কালুয়া তবুও এখানে সেখানে ছুটো খুঁটে খায়। যখন সে কালুয়াকে ভাতের ছিটে ফোঁটাও দিতে পারে না।

দ্বারিক থালাটা এগিয়ে দেয় কালুয়ার কাছে। খানিকটা জল আর ভাত অবশিষ্ট আছে। লে খা, বলে দ্বারিক। কালুয়া চুকচুক শব্দ করে জলভাতে জিভ ঠেকায়। দ্বারিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর হাসে।

কালুয়া হল বাঘার নাতি। বাঘা এসেছিল দ্বারিকের সাথে কালো জঙ্গল কাটার সময়। সেই বাঘার নাতি কালুয়া।

এতক্ষণে দ্বারিক একটা বিড়ি ধরাল। পারাপারের কোন চেনা-মুখের কাছ থেকে দ্বারিক বিড়িটা চেয়ে এনেছিল। এখন সুখটান দিচ্ছে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে কখন একফালি কাস্তে চাঁদ উঁকি দিয়েছে। বিদ্যাধরীর স্রোতটা হঠাৎ উল্টো বইতে শুরু করে; জোয়ারের বেলা। আর চাঁদটা যেন ক্রমশই ফুলছে। কাঁচি হলুদ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে নদীর জলে, হেঁতালের কুঁচ সবুজ পাতায় আর প্রান্তরের রিক্ততায়। স্থবির, নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ বাইরের প্রান্তরভূমি। সেই স্থবিরতার আমেজ লাগে দ্বারিকের মনে। বিস্ফারিত চোখে দাওয়ায় বসে তার মন গলে গলে পড়ে। বড় মিঠে সেই সুর। সারাদিনের ক্লান্তিতে তখন দ্বারিকের চোখে ঘুম নেমেছে। বিড়িতে শেষ টান দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। চাঁদের আলো সোনামনি আর চরণের মুখের উপর এসে পড়েছে; দ্বারিক সারাদিন পর মেয়ে আর ছেলেটার মুখ দেখল সেই আলোয়। তারপর এক সময় সোনামনির পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ দুই ॥

আষাঢ়ের নিথর রাত্রি ফিকে হয়ে এল। ঝিমধরা রাত্তিরে হাওয়া ছিল না। ভোরবেলার হাওয়ায় একটা মাতন ধরল। সেই ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম ভাঙ্গল দ্বারিক সর্দারের। তার ঘামে ভেজা শরীরটা জুড়াল। কাল রাত্রিতে হয়ত কোথায়ও বৃষ্টি হয়ে গেছে। সে শুনতে পেল শুকরাম বলছে—পানি আলাই।

বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠের কালবৈশাখী উঠেছে সমস্ত সূর্যবেড়িয়া দ্বীপকে মাতিয়ে। এক সময় নোনা বাতাস ক্ষেপেছে, ফুসেছে; ধুলোর ঝড় বয়েছে দ্বীপের ওপর দিয়ে। আবার একটা রঙদার গানের মত হঠাৎ এক সময় থেমে গেছে। দিয়ে গেছে ধুলো, নোনা বালির নোনা স্বাদ; দেয় নি জল, দেয় নি ভরসা। তখন তারা মাথা গুঁজে ধুলো খেয়েছে, মুখ থুবড়ে দোয়া মেগেছে জলের। কালোমাটিতে আসমানের জল; কিন্তু জ্যৈষ্ঠের আকাশে ঝাঁঝাল রোদের আঁচ কালোমাটিকে ফাটিয়ে চৌচির করেছে, ফাটল ধরেছে শক্ত কালোমাটিতে। সে ফাটল আগুনের উল্কা ছড়িয়েছে। পায়ের তলায় সে মাটি যত গরম ঠেকেছে, যত ফুটাফাটা মনে হয়েছে তত তারা আসমানের দিকে চেয়ে দোয়া মেগেছে জলের। জল আর জল। কালোমাটির ফাটল বুজাতে জল। কালোমাটিকে ভিজাতে জল। কালোমাটি ভিজবে, গলবে; ভিজে মাটি মাখবে তাদের নোনা ঘাম। নোনা ঘামে মাটি হবে সোনা। নোনামাটি হাসবে; সোনা ছড়াবে।

সেই আষাঢ়ের আকাশে জ্যোৎস্নাকে ঢেকে দিয়ে এক সময় চুপি চুপি মেঘ ঘনিয়েছে। মেঘ জমেছে সারারাত্রি ধরে। ভোরবেলার হাওয়ায় সে মেঘ জল হয়ে নেমে এল মাটির বুকে। ঝম-ঝম-ঝম। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল।

বাইরে এসে দাঁড়াল দ্বারিক। দেখল সেই বৃষ্টিভেজা কাকভোরে গাংভেড়ির ওপর ভিড় করেছে সর্দার পল্লীর মেয়ে-মরদেরা। শুকরামই হয়ত ডেকে জানিয়েছে—পানি আলাই। গাংভেড়িতে দাঁড়িয়ে সোনামনি,

চরণ আরও অনেক মেয়ে-মরদের দল জটলা করছে। দোস্ত শুকরাম তার ভইসাটার পিঠের উপর। ভইসাটা চোখ বুজে। নোনামাটিতে প্রথম জলের ফোঁটা। স্বপ্নের উল্লাস ছড়িয়ে দিল ডিঙা, ডিঙাল, সিংহজানা-ঘেরিতে আর গাংভেড়ির পাশে পাশে সর্দার পল্লীর নিকষ কালো মাগী-মরদের মনে। আহা রে, পানি আলাই। বড় বড় চোখ মেলে বলছে ওরা ; যত মেয়েপুরুষের দল মুখোমুখি হয়ে। একদল জোয়ান ছেলে বুড়ি দুর্গামনিকে চ্যাংদোলা করে এনে নামাল মাটিতে। বুড়ি হাঁটতে পারে না ; চোখেও দেখতে পায় না। পাঁচকুড়ি বয়স হয়েছে ওর। বুড়ি চেঁচামেচি শুরু করেছিল। ঘরে ছেঁড়াকানির ওপর শুয়ে হল্লা জুড়েছিল, আর নাতি-নাতনি ছেলে-বৌদের নাম ধরে গালাগালি শুরু করেছিল। আষাঢ়ের নতুন জল ; সে জল অঙ্গে লাগাবে না সে! নতুন জল অঙ্গে লাগিয়ে নতুন করে বাঁচবে! সেও বাঁচবে, মাটিও বাঁচবে। বুড়ি একবার মুখ তুলে তাকাল। অন্ধচোখেও যেন দেখবার, অনুভব করার চেষ্টা করল আষাঢ়ের আকাশটাকে। বিড় বিড় করে কি যেন বলল, শোনা গেল না। মনে হল আশীর্বাদ করছে। বৃষ্টিতে তার মুখ ধুয়ে চকচক করছে। একটা জলধোওয়া ঘষা পয়সা যতটা চকচকে হতে পারে। সে মুখে অনেক রেখা এঁকেবেঁকে নেমেছে, উঠেছে। সে রেখার পরতে পরতে অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক কাহিনী-উপকাহিনী, অনেক মেজাজ-মর্জির কথা জমে আছে। আট বছরের চরণ লাফিয়ে লাফিয়ে, নেচে নেচে বৃষ্টির জলে স্নান করছে, আরও অনেক কচি ছোকরার দল ঘুরে ঘুরে ছড়া কাটছে আর নাচছে। আসমানের ঠাণ্ডা জলে সারা অঙ্গ ভিজাচ্ছে সোনামনি, জবা আরও অনেক বৌ-ঝিরা। তাদের নাকের নোলক দুলছে। রূপোর নোলকে রূপালী আলোর রঙ ধরেছে। সারা অঙ্গ জুড়াচ্ছে দোস্ত শুকরাম। তার ভইসাটাও চোখ বুজে বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠের রোদ ঝলসানো শরীরটাকে ভিজাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে আওয়াজ করছে গা-আঁ-আঁ। কালুয়াও ভিজে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর লেজ নাড়াচ্ছে। দ্বারিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। সেও ভিজছে, তার অঙ্গও জুড়াচ্ছে। কিন্তু ঐ গাংভেড়িতে গিয়ে সে হাসতে পারল না। জটলা পাকাল না। গলা ফাটিয়ে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়াকে

জানাতে পারল না—পানি আলাই রে। আস্তে আস্তে নিজের অজ্ঞাতেই ঘরে ফিরে এল।

দাওয়ায় বসে আকাশটার দিকে একবার তাকাল দ্বারিক। আষাঢ়ের বর্ষণরত সজল আকাশ। এ আকাশ অতি পরিচিত তার। এ আকাশের মেজাজ-মর্জি বুঝতে পারে সে। মাথার ওপর আকাশ আর পায়ের তলার মাটি—এই দুইই তার অন্তরঙ্গ। বচপনের সাথী। বৃষ্টি ধোওয়া নোনামাটিতে নতুন গন্ধ উঠেছে। সে গন্ধ বাতাসে মিশেছে। সে গন্ধ স্বপ্ন জাগায়, বিভোর করে। সামনের গাংভেড়ির পাশে হেঁতালের কুঁচ সবুজ পাতা বৃষ্টির ছাঁটে মাথা দুলাচ্ছে। গেঁওর ডালে আর পাতায় জল ঝরছে। দ্বারিক দৃষ্টি মেলে ধরেছে। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার মাটির বুকে বৃষ্টির ঢল নেমেছে। মাটি ভিজছে, মাটি গলছে, মাটি হাসছে। কিন্তু দ্বারিক সর্দারের প্রসারিত দৃষ্টি সব কিছুকে ছাড়িয়ে মাটিকে ভেদ করে, আকাশ ঘুরে, এই বর্ষণমুখর কাকভোরকে একপাশে সরিয়ে রেখে অনেক অনেক দূর চলে গেছে। যেন জলধোওয়া শ্লেটের ওপর আস্তে আস্তে খড়ির দাগ জাগল। যেমন জাগে। আর শিশু বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে যে রেখাটা, যে আঁকটা সে একবারের জন্য ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিয়েছিল, অনেক পরে শুকনো শ্লেটে সে আঁকটাই—সে রেখাটাই আবার ফুটে উঠেছে, ফিরে এসেছে! এও তেমনি অবস্থা। ভুলে গিয়েছিল দ্বারিক সর্দার। ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিল। চমক লাগে ভাবনায়, মনটার কাণাতে কাণাতে। সত্যিই কি ভুলে গিয়েছিল সে, না ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিল। না, কোন কিছু চেষ্টা করে ভুলে যাওয়া যায়! আলে বাঁধা এক খণ্ড জমি। বিস্তৃত প্রসারিত জমির বুকে সে জমিটুকু দ্বারিকের একান্ত নিজস্ব। সে জমিও ভিজত, গলত। নোনা জমি নোনা ঘাম মাগত। সে ঘাম দ্বারিকের। একদিন হেমন্তের সোনার ফসলে হেসে উঠত।

আজ নয়, অথচ এমন একদিনে এ সুখস্মৃতিটুকু সত্য ছিল।

সেদিনও আষাঢ়ের আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছিল। অনেক আকুতির অনেক প্রতীক্ষার বৃষ্টি। গাংভেড়িতে দাঁড়িয়ে মেঘমন্দ্র স্বরে দ্বারিক সর্দার সবাইকে চেঁচিয়ে জানিয়েছিল—পানি আলাই রে। ঠিক আজ

যেমনি ভাবে দোস্ত শুকরাম সবাইকে জানাল। সেদিনও আজকের মতো গাংভেড়িতে মেয়ে-মরদের ভিড় জমেছিল। সবাই নতুন জলে নতুন করে বাঁচবে বলে বৃষ্টির ধারায় ভিজেছিল। দ্বারিকও ভিজেছে, জলের স্পর্শ নিয়েছে প্রাণের খুশীতে। একসময় বৃষ্টি ধরে আসতে ছুটেছিল জমির দিকে। তার একান্ত নিজস্ব একখণ্ড জমিতে ধানের টিনটিনে চারাগুলো রুইবার আগে জমিতে লাঙল চালাবার জন্য। সঙ্গে ছিল দোস্ত শুকরাম। দোস্তের জমিও দ্বারিকের পাশেই।

ভূতনাথ জানার ঘেরি বাঁ হাতে রেখে বেদনাখালের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছিল দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম। চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় তারা। বাতাসে ভেসে আসছে ডুগডুগির আওয়াজ। কোথায় যেন সর্বনাশ ঘটেছে। আশঙ্কায় বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ভরসায় বুক বেঁধে আবার চলতে শুরু করে। কিন্তু রাজু মুন্সীর চালাটা ছাড়াতেই স্পষ্টই দেখল দ্বারিক তারই জমির চারপাশে একটা ছোটখাট ভিড় জমেছে। আর ডুগডুগি বাজিয়ে রাঘব ডিঙ্গালের পেয়াদা ঘোষণা করছে জমির নিলামের কথা। পেয়াদার মুখে নিলামের কথা বড় রঙচঙে শোনাচ্ছে। তার পোশাকের সাথে মিলিয়ে সে যেন কথাগুলো জিভ দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে ভিড়ের দিকে। আর ভিড়টা নড়েচড়ে উঠছে। হাসি ঠাট্টায় তামাশায়, নানান গালগল্পে টগবগিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে।

দু সনে রাঘব ডিঙ্গালের কাছ হতে দ্বারিক টাকা ধারে। সে টাকা শোধ করতে পারে নি সে। নগদে না, ফসলেও না। তাই এই নিলাম। জবরদস্তি ব্যবস্থা। বৃষ্টিতে ভিজেছে মাটি, এবার সর্দারেরা লাঙল নিয়ে জমিতে নামবে। একথা জানত রাঘব ডিঙ্গাল। তাই আর অপেক্ষা করে নি। জমি নিলামে চড়াতে এসেছে লেঠেল পেয়াদা নিয়ে। একপাশে দাঁড়িয়ে চুরোট টানছিল রাঘব ডিঙ্গাল খুব নির্বিকারভাবে। তার চার পাশে চারজন লেঠেল। দৌড়ের ঘোড়ার মতো পা, আর লাঠি উঠাচ্ছে নামাচ্ছে। দ্বারিক ধনুকের ছিলার মত রাঘব ডিঙ্গালের সামনে এসে দাঁড়াল। অনেক মিনতি করল। কসম খেল সে দেনা মিটিয়ে দেবার। কিন্তু রাঘব ডিঙ্গাল শান্ত নির্লিপ্ত গলায় একগাল নীল ধোঁয়ার সাথে জানাল—তা হয় না। সংক্ষিপ্ত জবাব।

ডাকটা থেমে গিয়েছিল। ডুগডুগির বাজনাটাও। রাঘব ডিঙ্গালের ইশারায় বেজে ওঠে ডুগডুগির বাজনা। ডুগ ডুগ ডুগ। দ্বারিকের মনে হল পেয়াদার হাতে ওটা ডুগডুগি নয়, তার কলজেটা বাজছে।

ভিড়ের ভেতর হারান মাইতি, সঞ্জয় গাড়ুর দল দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন জমির নিলামে তারা ছুটে আসে। জমি তারা ছাড়ে না। ডেকে নেয়। কিন্তু তারা দেখল ডিঙ্গালের লোকই নিলামে ডাক চড়াচ্ছে; অর্থাৎ জমিটা রাঘব ডিঙ্গালই রাখবে। হারান মাইতি আর সঞ্জয় গাড়ুর দল ভিড় ঠেলে চলে গেল। তারা রাঘব ডিঙ্গালের সাথে পাল্লা দিতে চায় না। কাজিয়া চায় না।

দ্বারিকও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব ফিকির-ফন্দি আর রঙ তামাশা। তার পাশে দোস্ত শুকরাম দাঁড়িয়ে। একসময় দ্বারিক তার জমির থেকে এক ঢেলা ভিজে মাটি উঠিয়ে নিয়েছে। মাটির ঢেলাটা দু হাতে চটকাচ্ছে। দুহাতে মাটির ছোঁয়া পাচ্ছে। এ মাটি তো সেই মাটি, জংলামাটি, যাকে ধীরে ধীরে নিজেদের মদদ আর মেহনত খাটিয়ে নোনা ধুয়ে উর্বর করেছিল তারা। নোনামাটিতে ফসল ফলিয়েছিল। কিন্তু সেই মেহনতে গড়া একটুকরো জমি অনেকেই ধরে রাখতে পারে নি। রাঘব ডিঙ্গালের ফাঁদ অব্যর্থ ছিল।

ডাক শেষ হতেই রাঘব ডিঙ্গালের লোক এসে জমির চারপাশে চারটা খোঁটা পুঁতে দিল। এখন এ জমি আর দ্বারিকের নয়। রাঘব ডিঙ্গাল হেলেদুলে ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গে তার সাঙ্গপাঙ্গ। লেঠেল পাইক-পেয়াদা।

রাঘব ডিঙ্গাল এসেছিল; একটুকরো জমি দখল নিল—এটুকু তার প্রয়োজন। আবার ফিরে চলল। ব্যাপারটা তার কাছে চুরোটের ধোঁয়া ছাড়ার মতো। দ্বারিকের কেন যেন মনে হল হঠাৎ একটা পরিচিত উপমা। ডিঙ্গাল মশাই দ্বীপের বুকে সর্দারদের মধ্যে তগির সুতো ছেড়েছিল। বঁড়শির মুখে ছিল মিথ্যা প্রলোভন আর মোহ। সে সুতোই ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছে সে। আর বড়শির মুখে শিকার হল সর্দারদের জমি। এটা একটা বড় রকমের তামাশা বটে। মাটির ঢেলাটা ভেঙে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে দ্বারিকের হাত থেকে। আর চোখের

সামনে একটা জগৎ যেন চিরকালের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে। দ্বারিকের মনটা ঠিক ঝড়ো হাওয়ার মত গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। জমি যেন আসমানের চিড়িয়া আর দরিয়ার ঢেউ। এই আছে, এই নেই। একটা নিঃশ্বাস চাপল দ্বারিক। হাতের মুঠি দুটো শিলীভূত পাথরের মতো শক্ত হয়ে এল তার। বিদ্যাধরীতে কি এখন জোয়ারের বেলা, না তার মনে!

নিঃশব্দে ঘরের পথে পা বাড়াল দ্বারিক; সঙ্গে দোস্ত শুকরাম।

এ-সব বিশ বছর আগেকার কথা! ছেঁড়া কাটা ছবি। তারকাঁটার মতো মনে বেঁধে।

আর আজকের এই ভোর। এই ভোরে আষাঢ়ের আকাশ বৃষ্টি ঢালল মাটির বুকে। গাংভেড়িতে মেয়ে-মরদেরা সারা অঙ্গে জলের স্পর্শ নিচ্ছে; নতুন করে বাঁচবে বলে মাটির সাথে। আর দ্বারিক চুপি চুপি তার দাওয়ায় ফিরে এসেছে। তার মন চলে গিয়েছিল আকাশ ফুঁড়ে, এ বাতাস ভেদ করে অনেক অনেক বছর আগের পিছে ফেলে আসা এমনি এক ভোরবেলায়। সেই হারিয়ে যাওয়া মনটা বিশ বছর আগের উধাও হওয়া একটুকরো জমির নিশানা খুঁজছে ঢল-নামা জলের বুকে। দু চোখে তার স্মৃতির তন্ময়তা।

যেন একটুকরো জমি নয়; একটুকরো গোলাপী স্বপ্ন।

এখন ধানের টিনটিনে চারাগুলো জমিতে রুয়ে ফেলার সময় হয়ে এল; এই জলটার—এই দিনটার অপেক্ষায় তারা অনেকদিন কাটিয়েছে। কাল রাতে ঝুমুর বিবি জিজ্ঞাসা করেছিল—এবারে মাঠে খাটবি না। কিন্তু দ্বারিকের মন অনেকদিন আগেই বাইরে গেছে। এ মাটিকে ছাড়িয়ে, এ আকাশকে ছাড়িয়ে। সোনামনি এক সময় গাংভেড়ি থেকে ঘরে ফিরে এসেছে। আষাঢ়ের জলে কালো অঙ্গ ধুয়ে শীতল হয়েছে। সারা দেহে নতুন জলের অনুভূতি। মনে জলের সুবাস। দ্বারিক বসে বসে দেখল সোনামনির চলাফেরায় যেন একটা নতুন রঙ লেগেছে।

একসময় সোনামনি দ্বারিকের সামনের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। দ্বারিকের মনে হল সোনামনির মা শুক্রমনিও এমনভাবে দাঁড়াত। পাঁচ বছর আগে। তারপর একসময় প্রশ্ন করত—মাঠমে নেই যাবি? রোজ নেই খাটবি? দ্বারিক ছোট্ট করে উত্তর দিত—নেহি। শুক্রমনি

চাইত তার মরদটা আবার জমিতে ফিরে আসুক, লাঙ্গল ধরুক। সবল আঙ্গুলের নিপুণ কসরতে ধানের টিনটিনে চারাগুলো জলের মধ্যে জমিতে পুতে দিক। সে তার পাশে পাশে ধান রুইবে। কিন্তু দ্বারিক শুক্রমনির সেই ইচ্ছে রাখতে পারে নি। আজ দ্বারিকের কেন জানি মনে হল শুক্রমনির মেয়ে সোনামনির চোখে সেই একই প্রশ্ন।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘর থেকে বৈঠাটা তুলে নেয় দ্বারিক। পাঁচ বছর আগে শুক্রমনির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে ছিল। মাঠে সে যায় নি। আজ ওর মেয়ে সোনামনিও জানুক, পিতাজীর কাছে জমিন বহুৎ বিষ হয়ে গেছে। নৌকা নিয়ে পিতাজী হরেক দরিয়ায় ভাসবে। খেয়া পাড়িতে সন্ধ্যা উতরিয়ে ঘরে ফিরবে। হয়ত রোজ খাটলে দুটো পয়সা বেশি আসত। কটা দিন পেট ভরে ভাত জুটত; কিন্তু সে নাচার।

বৈঠা কাঁধে দ্বারিক সর্দার ঘাটের দিকে চলল গত রাতে নৌকাটা যেখানে বেঁধে এসেছে। সোনাঘেড়ি পার হয়ে বেদনা খালকে বাঁ হাতে রেখে সে ডিঙ্গালঘেড়ির পথ ধরল। রাঘব ডিঙ্গাল এক জায়গায় মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করছে। বৃষ্টি হয়েছে; এখন চার লাগবে। দ্বারিক সেদিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে জোরে পা চালায়। দূর থেকে নৌকাটা দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল সে।

ভাটায় নদী দূরে সরে গেছে। গেঁওর ডাল থেকে কাছিটা খুলে নেয় দ্বারিক; পার ভেঙ্গে নীচে নামে। কাদায় হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবে যাচ্ছে। নৌকার কিনারায় বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে কাদা ধোয় সে। একসময় নৌকাটা এক ঠেলায় পারের অনেক দূরে এনে ফেলে। বৈঠা মারে।

পারে যাত্রী নেই। তাই আর অপেক্ষা না করে দ্বারিক গোসাবার দিকে নৌকা ঘোরায়। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়া দূরে সরে যাচ্ছে। তার গাছ-গাছালি, ঘর বাড়ি ক্রমশঃই অস্পষ্ট হচ্ছে। বাঁকের মাথায় এসে একবার গলাটা উঁচু করে তাকায় দ্বারিক। এ তার অনেক দিনের অভ্যাস। ঘরের কথা ভাবে। সোনামনি হয়ত এখনও খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; যেমন ভাবে শুক্রমনি দাঁড়িয়ে থেকে তার মরদের নৌকাটা কতদূর গেল ঠাওর করার চেষ্টা করত। প্রাণটা হু হু করে ওঠে দ্বারিকের; বিদ্যাধরীর মুখরা জলের উথাল পাথাল ঢেউয়ে নৌকাটা তখন খুব দুলছে।

আর দ্বারিক সর্দারের মনটা কাঁদে। এই বিদ্যাধরীর নির্জন মাঝ দরিয়ার বাতাস দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার সর্দার পল্লীর একটা ছোট চালা ঘরে হয়ত সে কান্না পৌঁছে দেয় না, পৌঁছালে শুক্রমনি জেনে যেত মরদটা তার কাঁদে মাঝ দরিয়ায় একা একা এক টুকরো জমির জন্য। মেহনতের ঘামে ফসল ফলাবার জন্য। শ্রাবণের বৃষ্টি জলে পা ডুবিয়ে টিনটিনে ধানের চারাগাছগুলো একে একে খুব যত্ন করে পুঁতবার জন্য। অঘ্রাণের ভোর বেলায় দাওয়ায় বসে পাকা ধানের গন্ধ বুক ভরে নেবে বলে। সোনামনি আর চরণ জানত পিতাজী কেন এমন কঠিন বেখাপ্পা বনে গেছে।

চারিদিকে নোনা স্রোতের প্রবাহ! ঢেউগুলো ভাঙতে ভাঙতে যাচ্ছে। ভাটায় বিদ্যাধরী সমুদ্র পানে উল্লাসে ছুটেছে। এই দরিয়ার বুকে, এই ঢেউয়ের মাথায় কি কাঠি পুঁততে পারে রাঘব ডিঙ্গাল! কভি নেহি—মনে মনেই বেশ জোরে কথাটা বলে দ্বারিক। আর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপে। মাঝি সে, বিদ্যাধরীতে খেয়া পার করবে; কিন্তু পরের জমিতে আর মদদ দেবে না। জন-মজুরের বড় জ্বালা, এক একটা করে ধানের চারা পরের জমিতে পুঁতবে আর মনে হবে এক একটা স্বপ্নকে সে গলা টিপে মারছে। তার চেয়ে এই ভাল, এই বেশ—দরিয়ায় নৌকা ভাসিয়ে চলা। মাঝে মাঝে মেজাজ এলে গলা ছেড়ে গান ধরা। আসমান আর দরিয়ার মাঝে নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতন একা ঘুরে বেড়ানো।

গোসাবার ধানের কলের চিমনিগুলো দেখা যাচ্ছে। পারে নৌকার মাথাগুলো আবছা দেখায়। হয়ত কারবারী নৌকা। গাংভেড়িতে ছোটখাট ভিড়। দ্বারিকের নৌকা পার ঘেঁষে চলেছে। হেঁতালের পাতায় নৌকার গায়ে সর্ সর্ শব্দ উঠেছে। জোরে বৈঠা মারে দ্বারিক। অনেকগুলো লোক কাদায় পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের বগলে ছাতি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলের কথা বলছে, চাষের কথা বলছে; কারবারের কথা হচ্ছে। সবাই গোসাবার লোক নয়, কেউ রাঙাবেলিয়ার, কেউ কচুখালির, কেউ বা সূর্যবেড়িয়ার। দ্বারিক সর্দার জানে জটলা করতে করতে লোকগুলো তারই নৌকার জন্য অপেক্ষা করছে।

নৌকা ভিড়তেই গোসাবার হাটের চালের আড়তদার ভবতারণ তা জিজ্ঞাসা করে কেমন জল হল গা ওদিকে।—বহুৎ, উত্তর দেয় দ্বারিক। ততক্ষণে লোকগুলো ঠেলাঠেলি করে নৌকায় উঠেছে। আরেকজন প্রশ্ন করে—তোদের রাঘব ডিঙ্গাল এবারে কত বিঘা জমি চষবে গা। দ্বারিক বৈঠা মারতে মারতেই মুখ তুলে তাকায়। দেখে প্রশ্ন কর্তা রাঙাবেলিয়ার জোতদার হারাণ গোঁসাই। কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে দ্বারিক চুপ করে থাকে। জবাব না পেয়ে হারাণ গোঁসাই অন্যদের কথা-বার্তায় মন দেয়। সুন্দরবনের সর্দারেরা স্বভাব-চাপা, কথা কম বলে; এ কথা জানে গোঁসাই। তাই কিছু মনে করে না।

আড়াআড়ি নৌকা পাড়ি দেয় দ্বারিক। তার নৌকায় পাঁচজন যাত্রী।

॥ তিন ॥

গাংভেড়ি থেকে একসময় চরণ ঘরে এসে ঘুরপাক খেল। সেই সন্ধ্যা-রাতে সে চারটি জলভাত খেয়েছিল। সকালে তার খিদে পায়। হাঁড়িতে ভাত থাকলে সোনামনি ভাইকে ভাত চারটি বেড়ে দেয়। কোন কোনদিন সোনামনিও ভাইয়ের পাশে এক থালায় বসে খায়। রাত্রে সবার শেষে দ্বারিক খায়; বাঁচাতে পারলে সে চারটি ভাত হাঁড়িতে রাখে। সকাল বেলায় চরণকে ঘুরপাক খেতে সেও লক্ষ্য করেছে। মুখে কিছু বলে না ছেলেটা; কাছে ডাকলে মুখ কাঁচুমাচু করে কথাট বলে। তাই ছেলেটার জন্য সবারই দরদ আছে।

এতক্ষণ চরণ সবার সাথে গাংভেড়িতে ছড়া গেয়ে নাচছিল। এই বৃষ্টিস্নানে তার শিশুমনও আনন্দে নেচে ওঠে। সেও বোঝে আষাঢ়ের নতুন জলের মর্ম। এখন খিদে পেয়েছে, তাই ঘরে এসে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু যখন সে দেখে ভাত বেড়ে দেবার কোন সাড়াশব্দ নেই, সোনামনি তাকে কাছে ডাকছে না; তখন ঘরের মাচায় ঝুলিয়ে রাখা চুকাটা নামাল চরণ। ডাণ্ডটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে কলাগাছের নীচে এসে দাঁড়াল মাছ ধরবার জন্য কেঁচো খুঁড়তে। এ জায়গাটার খুব সাত্তিৎ। কেঁচো খুব থাকে। খুঁড়লেই পাওয়া যায়। কলাগাছের তলায় কেঁচোর বুড়বুড়িগুলো•বৃষ্টিতে ভিজে গলে গেছে। একটা কাঠি দিয়ে মাটিটা খুঁড়ে সে। বৃষ্টি-ভেজা নরম মাটি থেকে দুটো কেঁচো মুখ বাড়ায়। একটাকে ধরে চুকায় রাখে চরণ। আরেকটা তেল-পিচ্ছিল পুষ্ট শরীরটা টেনে টেনে পালাচ্ছিল। সেটাকেও ধরে ফেলে সে। দুটো কেঁচোই বেশ বড়, মাছে খাবে ভাল। বাঁ হাতে চুকাটা ঝুলিয়ে ডান হাতে ডাণ্ডটা নিয়ে চরণ ডিঙালঘেড়ির পথ ধরে। গড়খাইয়ের ধারে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌঁছাবে সে।



আষাঢ়ের সজল আকাশে নরম রোদ উঠেছে। গেঁওর ডালের ফাঁক দিয়ে এক ফালি রাঙা রোদ গড়খাইয়ের জলে লুকোচুরি খেলায় মেতেছে। হেঁতালের ঝোপটা রোদের সোনায় মায়াময়। বুন-বাবলার পাতা থেকে বৃষ্টির জল এখনও টুপ টাপ ঝরছে। চরণ সেই বাবলা বনের ছায়ায়, নির্জন হেঁতাল ঝোপটার পাশে বসে কেঁচোটা তার বঁড়শির মুখে পরাল। গড়খাইয়ের জলে দুটো শালুক ফুল সকালের রোদে ফুটে আছে। পদ্মপাতাগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে এদিক ওদিক ভাসছে। পদ্মপাতা বাঁচিয়ে, শালুকের ঝাড়কে কাটিয়ে চরণ তার কেঁচোশুদ্ধ বঁড়শিটা ছুঁড়ল গড়খাইয়ের গহীন কালো জলে। বঁড়শিটা টোপ সমেত ডুবে গেল। দুধ-সাদা ফাতনাটা তখন মাথা উঁচু করে মাছের খুটের ঠাওর দিচ্ছে। এই নির্জন হেঁতালের ঝোপের পাশে বাবলা বনের ছায়ায় চরণ প্রতিদিন আসে ডাঙ আর চুকাটা নিয়ে, অনেকটা সময় কাটায়। এখানকার গহীন কালো জলের প্রতিটি মাছকে সে চিনে ফেলেছে। ছোট-বড়-মাঝারি পার্শে, ট্যাংরা, কই, ভোলা, বেলে, ভেটকী, কাইন মাগুর, গজাল—সব রকম মাছের খুঁট সে ইতিমধ্যেই রপ্ত করেছে। সে জানে কোন্ মাছটা ধূর্ত, কোন মাছটা বোকার হদ্দ, আর কোনটা গহীন জলের তলায় ফাতনা ছিঁড়ে নিয়ে পালায়। ট্যাংরা আর দুই একটা কই ছাড়া সে কোন মাছই আজ পর্যন্ত পায় নি; অথচ রোজ ভাবে পার্শে কিংবা কাইন মাগুরে তার টোপে খুঁট দিয়েছে। আরেকটু হলেই বুঝি বঁড়শিতে গাঁথা পড়ত। পড়ে নি কারণ সময়মত সে খ্যাঁচ মারতে পারে নি। মনে মনে সে নিজেকে এর জন্য তিরস্কার করে। শিশু মনের এই অগাধ কল্পনা, মনগড়া ভুলের জন্য নিজেকে তিরস্কার, আট বছরের সর্দার শিশু চরণের এক খেলা, এ খেলায় অচেতন ভাবেই সে মাতে। মনগড়া ভুলের জন্য নিজেকে তিরস্কারের ভিতর দিয়ে একটা অপটু শিশু-মন তার ছোট ডাঙটার বঁড়শির মুখে একটা ইয়া পার্শে মাছের স্বপ্ন দেখে; মাছটার চোখ দুটো নীল আর বেগনীতে মাখা। সারা গায়ে চকচকে রূপোর মতো আঁশ। অথবা একটা কুচকুচে কালো এক বিঘত কই মাছের। তেলতেলে, হৃষ্টপুষ্ট; স্বাদালো। সে যেন দেখতে পায় তার বঁড়শির মুখে পার্শেটা ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে, গহীন কালো জলের

তলায় চুপি চুপি এসে। আরেকটা কই খুঁটের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কচুরির নীলফুল হাওয়ায় দোলে। একটা ফড়িঙ সেই নীলফুলে বসে মধু খুটে খায়। আর লেজ উঁচিয়ে চোখ ঘুরিয়ে এ ফুলে ও ফুলে এ পাতায় সে পাতায় নেচে বেড়ায়। চরণের সেদিকে তাকাবার উপায় নেই। যদিও ফড়িঙটার উপস্থিতি, তার এই লেজ উঁচিয়ে নেচে বেড়ানোর ঢংয়ে চরণ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায় তবুও তার চোখজোড়া দুধ-সাদা ফাৎনাটায় আবদ্ধ রাখে। এরই মাঝে ফাতনাটা একবার ডুবেছিল। কিন্তু চরণ ফড়িঙটা দেখতে গিয়ে খ্যাঁচ মারতে ভুলে গেছে। মনে মনে ফড়িঙটার ওপর চটেছে চরণ। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়েছে কিন্তু ফাতনাটার দিকে সাধ্যমত নজর রেখেছে। কি জানি, পার্শেটা যদি ফস্কে যায়।

মাছে একটা খুট দিল; ফাতনাটা একটু ডুবল; চরণের বঁড়শির মুখে তখন ট্যাংরা উঠেছে। মুখটা রক্তে লাল হয়ে গেছে বেচারার। ট্যাংরাটাকে বঁড়শি থেকে মুক্ত করে চুকার ভেতর রাখল চরণ। কেঁচোর টুকরাগুলো পদ্মপাতায় জড়িয়ে রাখে। ফড়িঙটা ইতিমধ্যে একবার এসে চরণের নাকের ডগা দিয়ে উড়ে গেছে। ডাণ্ডটা দিয়ে ফড়িঙটাকে এক ঘা বসাবার চেষ্টা করে সে! শপাং করে জলের বুকে শব্দ হয়, খানিকটা জল ছিটে ওঠে তার মুখে চোখে। ফড়িঙটা দূরে সরে গিয়ে একটা শালুক ফুলের ওপর বসে। বঁড়শির মুখে আরেকটা কেঁচোর টুকরো লাগায় চরণ। বঁড়শির মুখে টোপ পরাতে গিয়ে তার ডাগর চোখ দুটো জলে। ওপরকার ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে। চোখে মুখে একটা আকাঙ্ক্ষার ঢেউ খেলে। যতবার বঁড়শিতে কেঁচোর টুকরা লাগায় সে ততবারই এক রকম ঘটে। একটা বড় পার্শে কিংবা নিদেন পক্ষে একটা কইয়ের স্বপ্ন দেখে সে। টোপ সমেত বঁড়শিটা ছুঁড়ে দেয় গহীন কালো জলে; ফাতনাটা ঝির ঝির করে কাঁপে। চরণের চোখজোড়া ফাতনাটার ওপর স্থির হয়ে থাকে। ছোট্ট বুকটা ওঠানামা করে আশায়-আকাঙ্ক্ষায়-উৎকণ্ঠায়।

জল পেয়ে বাবলার ডাল বেয়ে লাল পিঁপড়ের সারি নেমে আসছে।

চরণের পিঠে একটা লাল পিঁপড়ে হুল ফুটায় ; চরণ বাঁ-হাতে পিঁপড়েটাকে ধরে টিপে মারে। পিঠটা জ্বালা করছে।

একটা শামুকখোল পাখি হেঁতালের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। পাখিটা তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে পিঁপড়েগুলো টপাটপ মুখে পুরছে ; চরণের এসবে নজর নেই ; চার পাঁচটা ট্যাংরাই সে পেয়েছে। এবারকার খুটটা মারা গেল। হয়ত কাইন মাগুরে খুট দিয়ে থাকবে। চুকাটা কাছে টেনে চরণ পা ছড়িয়ে বসে। কোলের কাছে চুকাটা সে রেখেছে। ট্যাংরাগুলো এখনও নড়ছে। মুখ আস্তে আস্তে নড়াচ্ছে। মুখের সামনে রক্ত জমাট বেঁধেছে। চরণের বেশ মজা লাগে মাছগুলোকে নড়তে চড়তে দেখে। মাছগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে। কেমন যেন একটা আনন্দ আছে এই দেখায়! চার পাঁচটা মাছ ধরা হলেই প্রতিদিন সে ডাঙ উঠিয়ে চুকাটা কোলের কাছে টেনে পা ছড়িয়ে বসে। এসময় বেশ একটা আমেজ লাগে।

চরণের এতক্ষণে নজরে এল—বাবলার ডাল হতে লাল পিঁপড়ের সারি নেমে আসছে। মুখে ওদের আধার। হেঁতালের ঝোপ থেকে শামুকখোল পাখিটা উড়ে এসে ঠোঁটে করে পিঁপড়েগুলো একে একে ধরছে আর গিলছে। পাখিটার কমলা রঙের শক্ত লম্বা ঠোঁট। ঠোঁটের শেষে একটা ছাই কালো দাগ। শামুকখোলটা থাকে জানাঘেড়ির গাংভেড়ির একটা কৎবেল গাছের ওপর : ভোর হলে মাঠে মাঠে, ঝোপে ঝাড়ে গড়খাইয়ের পারে, নোনাঘেড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, উড়ে উড়ে গুগ্‌লি, শামুক, কাঁকড়া আর চুনোমাছ ধরে খায়। চরণের এই মাছধরার নির্দিষ্ট বাবলাবনের ছায়ায় রোজ আসে শামুকখোলটা। মাঝে মধ্যে স্ত্রী শামুকখোলটাও উড়ে এসে বসে। দুটোতে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে। চরণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কেমন যেন একটা পুলক আর বিস্ময় শিহরণ তার শিশু-মনে দোলা লাগে। তখন শামুকখোলটাকে বড় আপনার মনে হয়। সূর্যবেড়িয়ার ঝোপে-ঝাড়ে গাছ-গাছালিতে অনেক শামুকখোল থাকে। কিন্তু আট বছরের শিশুমন ভাবে প্রতিদিন একই পুরুষ শামুকখোল তার মাছ ধরার জগতে উড়ে আসে, খুঁটে খুঁটে লাল পিঁপড়ে খায়। দিনে দিনে এই বিশ্বাসে শামুকখোলটা তার অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

আরেকটা পাখি উড়ে এসে বসে পাশের গেঁওর ডালে, সেটা শ্যামা। অনেকটা ময়নার মত, কিন্তু আকারে ছোট। আর আসে একটা গাং-শালিখ, ঠোঁটজোড়া হলুদ আর কমলায় টুকটুক। দুটোরই ভারী মিষ্টি ডাক।

হেঁতালের কুচ সবুজ ঝোপ, গেঁওর সারি, বাবলার বন, গড়খাইয়ের গহীন কালো জল, পায়ের তলায় কচি দুর্বাঘাস, ফাঁকে ফোকরে ডোরাকাটা নিরীহ দাঁড়াস সাপ, লাল পিঁপড়েদের ব্যস্ততা চরণের এই মাছ ধরার নির্জন জগতে সকলেই একটা নিজস্ব আবেদনে ধরা দেয়।

ঐ ছোট্ট ফড়িঙটা লেজ উঁচিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নাচে। তাতে শিশু মনে পুলক লাগে আবার বিরক্তিও আসে। শালুক ফুলগুলি গহীন কালো-জলে ফোটে, কচুরীর নীল ফুল গন্ধ ছড়ায়। জলের তলায় মাছেরা বুড়বুড়ি কাটে। পুরুষ শামুকখোলটা স্ত্রী শামুকখোলের ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে। গাং-শালিখটা ডাকে, শ্যামাটা লেজ নাড়ায়। এরা সবাই মিলে এক ঐক্যতান সৃষ্টি করে। প্রত্যেকেই ভোরের রাঙা রোদে অথবা সন্ধ্যার ধূমল অন্ধকারে বিশেষ হয়ে ওঠে রঙে-রসে-রূপে। সে রঙে কচি মন রাঙায় : সে রসে শিশু হৃদয় নাচে ; সে রূপে অবোধ চোখ মুগ্ধ হয়।

সোনামনি কখন একসময় চুপিচুপি চরণের পিছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতেও চুকা আর ডাঙ। সেও মাছ ধরতে বেরিয়েছিল। প্রথম প্রথম চরণ সোনামনির পাশে বসে মাছ ধরা দেখত। কোন মাছ বঁড়শির মুখে উঠলে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠত। খিল খিল করে হাসত। একদিন কিন্তু চরণ জানতে পেরেছে সে নিজেই এখন মাছ ধরতে পারবে আর সেদিন থেকেই সে তার নিজস্ব একটা ছোট ডাঙ বানিয়ে নিয়েছে। তাই সে এখন একা একা মাছ মারতে বের হয়। সোনামনির সাথে যায় না। নির্জনে মাছ মারায় সুখ আছে। বাবলার এই ছায়াঘেরা জায়গাটুকু তার আবিষ্কার, তাই তার একান্ত নিজস্ব। এখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই। অন্ততঃ সে তা হতে দেবে না। সোনামনি ভাইয়ের এই পাগলামিতে ভারী মজা বোধ করে। মাছ মারা হয়ে গেলে সে এই বাবলার ছায়ায় চুপি চুপি এসে দাঁড়ায়, দেখে চরণটা কি করছে। পিছন

থেকে চরণের চুকায় উঁকি মেরে দেখে কটা মাছ সে পেয়েছে। একলা লুকিয়ে দেখতে সোনামনির ভাল লাগে। চরণ দেখতে পেলে ক্ষেপে যায়। চুকার মুখ তাড়াতাড়ি কচুর পাতা দিয়ে ঢাকে। কোনদিন মাছ না পেলে তার কেমন লজ্জা করে।

সোনামনির ছায়াটা পড়েছিল মাটির ওপর। চরণ বেশ বুঝতে পেরেছে দিদিটা এসে পেছন থেকে চুপিচুপি তার চুকায় উঁকি দিচ্ছে। দেখছে সে কটা মাছ মারল,—কি কি। কিন্তু চরণ এসব বুঝেও কিছু বলে না, ভাবটা এরকম দেখুক দিদিটা সে মাঝারি রকমের পাঁচটা ট্যাংরা পেয়েছে। দেখুক ভাল করে, আর হিংসে করুক। চুকাটা নিয়ে অনেকক্ষণ চরণ বসে রইল। সোনামনিকে সুযোগ দিল তার মাছগুলো দেখতে। তারপর একসময় পেছন ফিরতে তুজনায় মুখোমুখি হল। তুজনার চোখেই হাসি। সোনামনি চরণের পাশে এসে বসে। চরণ তখন তার ছোট ছোট হাত পা ছুঁড়ে সোনামনিকে বোঝায় সে আরেকটু হলেই একটা বড় পার্শে পেয়েছিল আর কি! অল্পের জন্য ফস্কে গেছে। নিশ্চয়ই মাছটার ঠোঁট কেটে গেছে। মজাটা বুঝবে জলের তলায়। সোনামনি চরণের কথায় সায় দেয়। যদিও সে ভালভাবেই জানে এসমস্তই চরণের বানানো, মন গড়া কল্পনা তবুও সে এই কল্পনাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চায় না। শিশুকাল থেকে চরণ তার সাথে ছায়ার মত লেপ্টে আছে। সূর্যবেড়িয়ার নদ-নদী, খাল-বিল, মাঠ-ঘাট, গাছ-গাছালি, গড়খাইয়ের মাছ, নোনাঘেডির কাঁকডা সে ভাইকে চিনিয়েছে। প্রত্যেক সময় শিশু চরণের হাবাগোবা প্রশ্নগুলোর যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছে সে। যেমনটি পিতাজী দেয় না, শুধু হাসে চরণের বোকা বোকা মিঠে প্রশ্নে। তাই সোনামনি চরণের এই মনগড়া কল্পনাকে ভেঙ্গে চৌচির করে দিতে চায় না। সে বড় নিষ্ঠুর হবে। তাতে চবণ বড় ব্যথা পাবে। সোনামনির কেমন যেন চরণের জন্য মায়া হল।

চরণ সোনামনির চুকাটা কাছে টেনে আনে। সোনামনি তাতে বাধা দিল না। চরণ দেখে দিদি কটা মাছ পেল ; তার চেয়ে বেশী পেয়েছে কিনা। মনে মনে সে মাছ মারায় সোনামনিকে প্রতিদ্বন্দী কল্পনা করে। মাছ ধরায় সে কারো কাছে হারতে রাজী নয়। এমনকি সোনামনির কাছেও না।

সেদিন নিবারণের তগিতে একটা দশ সের ভেটকী উঠেছিল। সর্দার পল্লীতে মাছটাকে নিয়ে অনেক কথা চলেছে। নিবারণ মাঝে মাঝে কথা বলছে; গলার স্বরে বেশ গর্বের সুর। চরণ পাশে দাঁড়িয়ে, সে ইতিমধ্যেই নিবারণকে তার মাছ মারার প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে নিয়েছে। একসময় সে বলে বসল তার বঁড়শিতেও সেদিন একটা বড় ভেটকী খুট দিয়েছিল, সে অন্যমনস্ক থাকায় একটুর জন্য রেহাই পেয়েছে মাছটা। ভিড়ের মধ্যে আটবছরের ছেলের এধরণের কথায় সবাই বেশ কৌতূক অনুভব করে। নিবারণ তার কথা থামিয়ে মস্করা করে। মেয়েরা হেসে লুটায়! চরণের ডাঙটি চরণের মত ছোট, বঁড়শিতে ভেটকী কেন, ট্যাংরা আর ছোট দুই একটা কই ছাড়া কোন মাছই ওঠা সম্ভব নয়। সবার এই হাসিতে সে তখন হতভম্ব। তার শিশুমনের উদ্দাম কল্পনা রচনার কোমল জায়গাটিতে আঘাত করল সে হাসি। তবুও সে বলল—আলবৎ খুট দিয়া। তারপর মুখ কাঁচুমাচু করে ভিড়ের ভেতর থেকে এক দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল। সোনামনিও ছিল সেই মাছ মারার খোস গল্পের আসরে। ভিড়ের বাইরে এসে সে চরণকে ধরে। কাছে টেনে এনে মাথার চুলে বিলি কাটে! চরণ তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মেয়েদের হাসির হুল্লোড়, নিবারণের মস্করা, ভিড়ের ভেতর থেকে তির্যক হাল্কা হাসির প্রশ্ন তাকে আঘাত করেছে। সেদিন সারা বিকেল একা একা ঘুরেছিল চরণ; নির্জন গাংভেড়ির পাশে পাশে।

চরণ ও সোনামনির ভেতর এই বিচিত্র মান অভিমানের খেলা কতক্ষণ চলত বলা কঠিন, কিন্তু একসময় সোনামনি ওঠে। বেলা হল; আজ ঘরে চাল নেই। শালুকগুলো ছাড়াতে হবে। সেদ্ধ বসাতে হবে। চাল যদি আসে তবে সেই সন্ধ্যায়! পিতাজী আনবে। মুনিয়া আর সজনীকে নোনাঘেড়ি কিংবা গই বাক্সের ধার থেকে তাড়িয়ে আনতে হবে। দুটোকে চোখে চোখে রাখতে হবে। জোয়ারের বেলা এলো বলে, তখন আবার নদীর ধারে কাদায় ডুবে না থাকে। সোনামনি ডাঙ আর চুকা হাতে গড়খাইয়ের পথ ধরে ছুট মারে। হাওয়ায় ওড়ে সোনালী খয়েরী রুক্ষ চুল। হাওয়ায় ওড়ে লাল ডোরাকাটা শাড়ির আঁচল।

॥ চার ॥

দিনকয়েক পর মাথায় বৃষ্টি নিয়েই সোনামনি ঘর থেকে বের হল। সঙ্গে ভাই চরণ। সংগ্রহকরা সমস্ত শাপলা শালুক ফুরিয়ে গেছে। তাই এই ভোরবেলা মাথায় বৃষ্টি নিয়েই ওরা ঘর থেকে বের হয়েছে। শাপলা-শালুকের খোঁজে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই চরণ আর সোনামনি বিলে বাদায় চুঁড়ে চুঁড়ে শালুক তুলবে। কয়েক দিন আগে সোনামনি সুন্দরী খালের এক জায়গায় অনেকগুলো শালুক ফুটে থাকতে দেখেছে। তার পাশে কাঁটাগাছের ঝোপ। জায়গাটা তাই সচরাচর কারও নজরে আসে না। সোনামনি চরণকে নিয়ে সেই পথই ধরল। কারও পৌঁছাবার আগেই সেখানে যেতে হবে ; কেউ দেখে ফেললে আর রক্ষে নাই। সোনামনি আর চরণ জোরে পা চালায়। বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় বিধ্বস্ত হয়েই পথ হাঁটে।

বর্ষার জলে সুন্দরী খাল চল চল করেছে ; যেন বান ডেকেছে। শেয়াল-কাঁটার ঝোপের পাশে কয়েকটা ফণীমনসা গাছ। তারই পাশে খালের জলে সোনামনি সেদিন শালুকের ঝাড় দেখে এসেছিল। আজ গুটি গুটি সংশয় উদ্বেল মনে বোন আর ভাই সেখানটাতেই এসে দাঁড়াল। নৈঋত আকাশে একটা আগুন হলুদ আলোর বন্যা কালো মেঘের গভীরে দাগ কেটে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব-দক্ষিণ হয়ে ওপর থেকে মাটিতে নেমে এল। গুরু গুরু গুরু। একটা তাৎক্ষণিক শব্দ ধীরে ধীরে আকাশ বাতাসকে কাঁপিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জনে ফেঁপে ফুঁসে ফেটে পড়ে। বোন আর ভাইয়েতে তখন জড়াজড়ি করে হঠাৎই ভয় পেয়েছে।

সেই আলো-ললকা আকাশ-মাটির বিজন প্রান্তরে ফণীমনসার গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে সোনামনি আর চরণ দেখল শালুক শাপলা উধাও। তাদের আসার অনেক আগেই সাফা হয়ে গেছে। গেছে তো

গেছেই। ভাই আর বোনে তাকিয়ে আছে তো আছেই। সেই গহীন কালো জলের স্রোতে চার চোখের দৃষ্টি হতাশ আক্ষেপ ক্ষুব্ধতায় পাক খেতে খেতে হারিয়ে গেল। ওদের খেয়াল নেই মাথার ওপর বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম অবিশ্রান্ত।

জানাঘেড়ির কালু সর্দারের দেড় দশকী মেয়েটা তখন শেষ শালুকটা তার কোমরের আঁচলের কোঁচড়ে রাখল। এই ছুঁড়িটা বিলে বাদায় চুঁড়ে চুঁড়ে সূর্যবেড়িয়ার তামাম শাপলা শালুক তুলে বেড়ায়। শিয়ালকাঁটার বনের ওপাশ থেকে মাথাটা উঁচু করতেই সোনামনি আর চরণ দেখল ছুঁড়িটাকে। সোনামনির চোখ দুটো জলছে। ছুঁড়িটা শয়তানের বেহদ্দ। তা না হলে জানাঘেড়ি থেকে জল আর কাদা ভেঙ্গে কেউ এতদূরে আসে সুন্দরী খালে শাপলা খুঁজতে। কথাগুলো মনে মনে ভাবল সোনামনি। বোন আর ভাইয়ে মুখোমুখি হল। একটা তিতো কান্না চরণের বুক থেকে গলায়, গলা থেকে ঠোঁটে, ঠোঁট থেকে চোখে ঘুরে ঘুরে ঠেলে ঠেলে ওপরের দিকে উঠছে। তিতো কান্নাটা বৃষ্টির জলের সাথে আস্তে আস্তে মিশে গিয়ে একটা বিষাদে পরিণত হল। এখন যদি কোথায়ও আর শাপলা শালুক না পাওয়া যায়, অনেক চুঁড়ে চুঁড়ে, ঘুরে ঘুরে বিলে বাদায় গড়খাইয়ে, তাহলে! চরণ অসহায় দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে তাকাল।

দু'জনায় ঘুরে দাঁড়ায়। বৃষ্টিতে ভিজে সোনামনির শাড়ি গায়ের সাথে লেপ্টে গিয়ে লজ্জা দিচ্ছে। ষোল বছরের যৌবনে এই লজ্জার বড় দায়। বুকের কাছে কাপড়টা টেনেটুনে ঠিক ঠাক করে নেয় সে। রূপচাঁদ হয়ত এখন কোন ঝোপের পাশে বসে অকারণেই তাকে লক্ষ্য করছে আর মনে মনে মাতাল হচ্ছে। কথাটা মনে হতেই সোনামনির ভুরুতে একটা ঢেউ উঠল। সেটা জলের বুকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো সারা দেহে একটা মিষ্টি রাঙা চেতনার আমেজ তুলল। হাই ওঠে সোনামনির।

ওরা আবার পথে পথে, মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। দু'জনার সতর্ক দৃষ্টি প্রতিটি জলের, খালের, নালার, চৌকার বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রমশঃ ক্লান্ত হল। এখন বৃষ্টি একটু ধরে এসেছে। পথ প্রান্তর কাদায় ভেসেছে। কাদায় পা ডুবিয়ে ওরা চলে, থামে, বোন আর ভাইয়েতে

মুখোমুখি হয়। শলাপরামর্শ করে। আবার চলতে শুরু করে। ঘুরতে ঘুরতে ওরা অনেক দূর চলে এসেছে। বেলাও গড়িয়ে এল ঝুমুর ঝুমুর।

সুন্দরী খালের পূবের পথটায় দুই নম্বর নোনাঘেড়িতে হাঁটু ডুবিয়ে চার পাঁচজন মেয়ে শালুক তুলছে। সোনামনি আর চরণ সেখানটাতে এসে ভিড়ে গেল। বিনোদিনী আর পিতাম্বর নাপিতের মেয়ের ভেতর তখন তুমুল ঝগড়া বেধেছে। একটা শালুকের ঝাড় আঁকশি দিয়ে দু'জনায় কাছে এনেছে। শালুকের ভাগের বখরা নিয়ে দু'জনার মধ্যে কথা কাটাকাটি চলেছে। আর তিনজন যে যার মনে যত পারছে শালুক সংগ্রহে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ওরা এই কলহে যে ফোড়ন কাটছে না তা নয়। সোনামনি আর চরণকে আসতে দেখে ওরা কিছুটা বিরক্ত হল। ভাই আর বোনেতে তখন শালুক তুলতে লেগে গেছে! কোনদিকে তাকাবার সময় নেই ওদের; কে কি টিটকারী কেটে গিটকিরী করল সে কথা না জানলেও চলবে। কোঁচড় ভরে শালুক চাই। তবে আজকের মত পেট ভরবে।

জলে ফোটে শাপলা-শালুক। বিলে-বাদায় সেই শাপলা-শালুক নিয়েই কথা কাটাকাটি, ঝগড়া, পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ চলে। সবারই ঘরে শালুক চাই পেট জুড়াতে। তাই অবহেলায় আপনা থেকে ফুটে থাকা শালুকের বন সাত পাহাড়ের গুপ্ত ধনরত্ন; সাপের মাথার মণি সর্দার আর ক্ষেতমজুর হাভাতেদের কাছে।

বিনোদিনী পিতাম্বর নাপিতের বারো বছরের মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধরে জলে ডোবাবার চেষ্টা করছে। আর মুখে অশ্রাব্য গালিগালাজ। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে শাপলা-শালুক তুলছে সোনামনি আর চরণ। রণচণ্ডী বিনোদিনীকে ভালভাবেই জানে সোনামনি। তবুও যখন সে দেখল পিতাম্বর নাপিতের কচি মেয়েটা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে আর তার কোচড়ের সংগ্রহ করা শালুকগুলো সব জলে ভেসে গেছে তখন সে রুখে দাঁড়াল। চরণও শালুক তোলা ছেড়ে দিয়ে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে গেছে। তার কান্না পেল পিতাম্বর নাপিতের মেয়েটার বিনোদিনীর হাতে এই নির্যাতন দেখে। অবাক হল আর সবাই চুপ করে আছে

বলে। সোনামনির অনেক কথা বলার থাকলেও শুধু শান্ত গলায় বলল—চাচিজী এ বুরা বাৎ। কথা শুনে বিনোদিনী ঘুরে দাঁড়ায়। তখন তার দু'চোখে আগুন ঠিকরাচ্ছে। তোতলিয়ে তোতলিয়ে বলল সে—তোর কি গা? সর্দার মাগীর ঢং দেখে মরি। কথাগুলোর সাথে চোখে মুখে একটা কুৎসিত ভাব বিনোদিনী ফুটিয়ে তুলেছে। সোনামনি আর কিছু বলতে পারল না। ঠোঁটটা শুধু কয়েকবার কেঁপে থেমে গেল। চরণ তখন দিদির কাছে ওর শাড়ির একটা প্রান্ত ধরে দাঁড়িয়েছে। ভাবখানা যেন দিদিকে আড়াল করা। আবার ওরা শালুক তোলায় মন দিল।

কোঁচড় ভরে শালুক নিয়ে এক সময় ওরা ঘরের পথ ধরল। বৃষ্টি থেমে গিয়ে কড়া রোদে ঝাঁঝ ধরেছে। সে রোদের আঁচে গা চড় চড় করে। চোখেমুখে জ্বালা ধরায়।

পিতাম্বর নাপিতের কিশোরী মেয়েটা তখন কান্নায় ফুঁপাতে ফুঁপাতে গা হাত পা চুলকাচ্ছে। নোনাজলের চুলকানি। ভেসে যাওয়া শালুকগুলো যতদূর সাধ্য উদ্ধার করার চেষ্টা করছে।

নোনাঘেড়ি ছাড়িয়ে এসে সোনামনি আর চরণ একবার পেছন ফিরে দাঁড়াল। চরণ দিদির চোখের দিকে তাকিয়ে বললো—রোঁতা।

পিতাম্বর নাপিতের মেয়েটা কাঁদছে তখনও।

॥ পাঁচ ॥

সেই ভোরবেলায় আষাঢ়ের আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছিল। এখন শ্রাবণের প্রথম। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। শ্রাবণের আকাশ জুড়ে কালো মেঘের ঘটা। সূর্যবেড়িয়ার কালোমাটি আরও কালো হয়েছে মেঘের ছায়ায়। বিদ্যাধরী আর পাঠানখালির নোনা জল কালো। হেঁতালের ঝোপে ঝাড়ে কালো মেঘ হামাগুড়ি দিয়ে নেমেছে। আকাশ, মাটি, নদী সূর্যবেড়িয়ার তাবৎ চরাচর মেঘে মেঘে পূর্ণগর্ভার মত থমকে দাঁড়িয়েছে। রাত্রি-দিন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ওপারেতে রাঙাবেলিয়া, কচুখালি গোসাবা আকাশের গায়ে দূর সমুদ্রের একখণ্ড দ্বীপের মত অস্পষ্ট, ধূসর। সে ধূসরতা অন্ধকার দিনরাত্রিগুলোর সাথে মিশে গিয়ে বৃষ্টির একটানা শব্দে মুখ থুবড়ে গোঙায়। মাটি ভিজছে, মাটি গলছে। দ্বীপের বুকে জল জমেছে, ক্ষেতে ক্ষেতে জল জমেছে, খালে বিলে নালায় জলের স্রোত বইছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় বৃষ্টিটা নেমে আসে অনেক দূরের আকাশ থেকে। যেন ছোবল লাখান। কিছুক্ষণের জন্য থামে। আবার খেয়াল খুশীতে নামে।

উঠানে এক হাঁটু জল জমেছে। সামনের চৌকাটা জলে টই-টুম্বর। হেঁতালের ঝোপঝাড় জলে ডুবে গেছে। দাওয়ায় বসে বসে চরণ হেঁতালের পাতা দিয়ে নৌকা বানায়। ওর মাথার ওপর ভাঙ্গা চালের ফাঁক দিয়ে জল ঝরছে। ভিজে ভিজেই সে এক মনে একটা বাদামতোলা নৌকা বানাল। একসময় নৌকাটা ভাসিয়ে দিল উঠানের জলে। নৌকাটা হেলে দুলে চলেছে। সে তাকিয়ে আছে। দাওয়ায় বসে বসে দেখে নৌকাটা' দুলছে, কখনও বাঁক ঘুরছে, কখনও কাত হচ্ছে; চলেছে উঠান ছাড়িয়ে ছোট নালাটার দিকে। চরণ দেখল কোথা থেকে

আরেকটা নৌকা এসে ওর নৌকার গায়ে লেগেছে। হয়ত ও পাড়ার বুধোর নৌকা। দুটো নৌকোই পাশাপাশি চলেছে। ওর মনও চলেছে নৌকাদুটোর সাথে এ উঠান ছাড়িয়ে ছোট নালা ছাড়িয়ে। নালায় নালায় নৌকো দুটো হয়ত বিদ্যাধরীতে গিয়ে পড়বে।

শ্রাবণের বৃষ্টির দিনে দাওয়ায় বসে বসে হাড় কাঁপানো হাওয়ায় চরণ কাঁপে, জলে ভেজে. ভুখায় ধোঁকে তবুও উঠানের জলে হেঁতালের বাদামতোলা নৌকা ভাসায়। আর মনে মনে নিজেকে সে নৌকোর মাঝি কল্পনা করে; ঠিক পিতাজীর মত। যতক্ষণ না তার নৌকাটা এ উঠান ছাড়িয়ে, নালা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে জলের বাঁকা স্রোতে অদৃশ্য হয়ে যায়, ততক্ষণ বসে বসে সে দেখে। এই ধীরে ধীরে নৌকাটার অদৃশ্য হযে যাওয়ায় কেমন যেন শিশুমনে একটা রোমাঞ্চ লাগে। ক্ষুধাক্লিষ্ট মনটা দিদির প্রতি অভিমানে, পিতাজীর প্রতি অভিমানে বর্ষাক্লান্ত দিনটার প্রতি অভিমানে নৌকাটার মতন হারিয়ে যেতে চায়। দূরে, অনেক দূরে। কতদূরে, কোনখানে তা সে জানে না।

চরণ উঠানের জলে হেঁতালের নৌকা ভাসায়; দ্বারিক সর্দার বিদ্যাধরীতে তার নৌকাটা ভাসাতে পারে না। শ্রাবণের বর্ষায় সে তার চালার তলে বসে বসে ভেজে আর হাই তোলে। এখন নৌকায় যাত্রী মেলে না এই বৃষ্টি বাদলায় কে আর তেমন নদীপার হয়। মাঝে মাঝে দ্বারিক মাছ ধরতে যায়। তাও দু'-একদিন। জলে নৌকা ভাসে না, ঘরেতে ভাঁড়ার শূন্য; লেংটী ইঁদুরগুলো চিঁচিঁ করে ডাক ছাড়ে। দ্বারিকের এই অসহায় অবস্থার মধ্যেও হাসি পায় ইদুরগুলোর ডাক শুনে। দাওয়ার এক কোণে কালুয়াটা বসে বসে ঝিমায়। মাঝে মাঝে চোখ খুলে পিট পিট করে দ্বারিকের দিকে তাকায়। দ্বারিকদের এই দুমাস ভাত জোটে না। কালুয়াও না খেতে পেয়ে শুধু বসে বসে ঝিমায় আর ধোঁকে। কিন্তু মুনিয়াটা দিব্যি হোগলাপাতার খোপে নাক ডাকাছে। এই শুয়োরের ছানাটা দ্বারিক মাস তিনেক হলো বেলতলীর হাট থেকে কিনে এনেছে। দোস্ত শুকরামের কাছ থেকে টাকাটা ধার করেই কিনেছে। বলেছে আস্তে আস্তে শোধ দেবে। এখন ছানাটা দিব্যি হাপালো হয়ে উঠেছে। চরণটা মাঝে মাঝে চিৎকার ছাড়ে ভাত খাবে। সোনামণি ভাইকে শান্ত করে।

আর কদিন পরেই ঘরে চাল আসবে। তখন ওরা ভাত খাবে। চরণের চিৎকার দ্বারিককে কেমন বিচলিত করে। সে অন্য দিকে তাকিয়ে ওকে এড়াবার চেষ্টা করে। সোনামনি এসে তার পেছনে দাঁড়ায়। মাঠে কাজ আরম্ভ হবার আগে দিনগুলো এমন স্যাঁতসেঁতে, বিষণ্ণ, স্থবির।

আজকাল মাঝে মাঝে সোনামনি এসে দ্বারিকের পেছনে দাঁড়ায়! দ্বারিক বৃষ্টিক্লান্ত দিনে দাওয়ায় বসে দু-হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে ঝিমোয়। মেয়েটা একসাথে বেশী কথা বলে না। শুধু তাকিয়ে থাকে। সেদিন সন্ধ্যা উত্‌রিয়ে ঘাট থেকে ফেরার পর সোনামনি এসে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। চরণটা সারা বিকেল আর সন্ধ্যা ভাত ভাত করে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখাচোখি হতেই সোনামনি বলেছিল—পিতাজী, দূর ভাগ যাই চল। সোনামনির মুখে এই কথা শুনে দ্বারিক সেই সন্ধ্যায় অবাক হয়েছিল, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারে নি। শুধু মেয়েটার মুখ কাছে টেনে এনে চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিল। আজ দ্বারিকের মনে হল আবার তেমন কোন কথাই বলবার জন্য সোনামনি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মেয়েটা জানে না পালিয়ে কোথায়ও নিস্তার নেই। সে দূরেই হোক আর কাছেই হোক। জন্মেছিস তুই ভুখ নিয়ে; তুই পালাবি! ভুখ থাকবে তোর সাথে। এই সাচ কথাটা সমঝে মদৎ করতে হবে, কোশিস করতে হবে, তবে না!···দ্বারিক সেদিনও যেমনটি ভেবেছিল, আজও তেমনটি ভাবল। কিন্তু কেন জানি সে নিজেই নিজেকে আজ যেন একটা কথা বোঝাতে পারে না। সে কথাটাই ধরবার জন্য আবার ভাবনায় ডুব দেয়। বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দ দ্বারিক সর্দারকে ভাবতে সাহায্য করে। তার মন গলে গলে পড়ে—শ্রাবণের আকাশটার মত।

সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের সার কোথায় গেল! কালো জঙ্গলের সেই দুর্ভেদ্যতা। যখন সুন্দরী, অর্জুন আর শাল গোলের গায়ে অন্ধকার সাপের মত লেপ্টে থাকত। আর হেঁতালের ঝোপের অন্ধকারে দুটো লাল ভাটা চোখ শিকার খুঁজত। সেদিন ছিল হলুদ-কালো শনের দড়ির মত ডোরাকাটা সুন্দরীদের রাজত্ব। বড় শেয়ালের

দিন, আর আজ! ক্রোশ যোজন দূরে চোখে মেলে ধর—একটা সুন্দরী গাছও চোখে পড়বে না। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায় আজ সুন্দরী গাছ খোঁজা মিছে। বিদ্যাধরী আর পাঠানখালির ধারে ধারে হেঁতাল আর গেঁওর জঙ্গল যা টিকে গেছে। যাও সরকারী বাবুদের এক্তেলায়। কালো জঙ্গলে যাও, আমলাবেতী, মরিচঝাপি কিংবা আরও দক্ষিণে দেখা যাবে সুন্দরী, অর্জুন, শাল, গোল, দেবদারু আর সাথে ওদের গেঁও হেঁতালের সারি। দিনের বেলায় সূর্যকে নিভিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নোনাজলের সাথে ওদের মিতালি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হোক দোস্ত শুকরামকে যে দশ-কম দুই কুড়ি বছর সূর্যবেড়িয়ার মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে।—হ্যাঁ সর্দার, শের কেমন করে তাড়ালে, কেমন করে শেয়াল-ময়াল নদীর ওপার করে দিয়ে আসলে; সে কুতকুতে চোখে অতীতের জাবর টেনে গলা খাঁকিয়ে প্রথম কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে বসে ঝিম মারবে। তারপর এক সময় বলবে—পচ্চিম থেকে আতি। শুরু করবে পঞ্চাশ বছর আগের কাহিনী কিংবা তারও আগের। সেদিনের কথা দ্বারিক আর দোস্ত ছাড়া এ তল্লাটে আর কার স্মৃতিতে তেমন করে মিশে আছে! নড়ে চড়ে বসে দ্বারিক।

পশ্চিম থেকে—কেউ বা ছোটনাগপুর কেউ বা ময়ূরভঞ্জ থেকে ধীরে ধীরে তারা নেমে এসেছে সমতলভূমিতে। ছড়িয়ে পড়ছে নদী খাল বিল ঘেরা বাঙলাদেশের আনাচে কানাচে। কেউ কেউ গিয়েছিল মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামে, বর্ধমান পেরিয়ে বীরভূমে. কেউ কেউ ছড়িয়ে পড়ল সুন্দরবন অঞ্চলে। দ্বারিকরা এসেছিল ছোটনাগপুর থেকে। সন তারিখ মনে নেই দ্বারিকের। মনে রাখার দরকারও পড়ে না। তবে অস্পষ্ট মনে পড়ে পশ্চিমে তাদের ঘর। পূর্ব পুরুষের ভিটে। সেখানেও তার বাপ ঠাকুরদা কোদাল চালাত। চালাত লাঙল, নিড়েনী আর খুরপী,—জমিদার আর জোতদারদের জমিতে। অথবা পাহাড় ভাঙ্গার কাজে গাঁইতি। আর ছোট দ্বারিক বাঁটুল নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত কাঠবেড়ালি, খাটাশ, সুগা আরও কত কি পাহাড়ি পাখি আর জন্তু শিকারের জন্য। আর ছিল খরগোস। কালো কালো পিঙল চোখ বটে। দু-পা তুলে তাকাত প্রথম। তারপর ছুট।

এল মড়ক সর্দার পল্লীর খাটালে। ভৈস আর গরু ছাগল দু-রাত্রেই সাফ হয়ে গেল। বাল বাচ্চারা এক একটা বিছানায় পড়ে আর সাফ হয়ে যায়। পাহাড়ের বিবি নাকি গোসা করেছে। ঘোর রাতে পাহাড়ের বিবি নেমে আসে। সর্দার পল্লীর সবাই শুনেছে মাঝরাতে শিঙ্গা বাজছে। পাহাড়বিবি আসছে নেমে। বাল-বাচ্চাদের রক্ত খাবে। লাল লাল ডালিমের দানার মত খপিশ চোখ তার। সকালবেলা খোঁজ নিলেই দেখা যাবে অনেকের ঘরেই বাল-বাচ্চারা ভোরের আলোয় আর চোখ মেলে তাকায় নি। পাহাড়ের বেদীতে পূজো হল। হাঁড়িয়া আর মাদলের উৎসব চলল। তবুও বিবি প্রসন্ন নয়।—নাচার।

পর পর কয়েক বছর অনাবৃষ্টি। ফাটাফুটা জমিতে ফসল গেছে খাক হয়ে। ভুট্টার ক্ষেতে দানা আর কোন গাছে ধরে না। গমের দানা না পাকতেই শুকিয়ে গেছে। তবুও ওরা দু-সন কাটাল ভুখা নাঙ্গা থেকে। আসমানের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকল। এল মড়ক। পাহাড়ের বিবি ঠাকুরণের গোসায়।

ওরা গ্রাম ছাড়ল পঙ্গপালের মত দলে দলে। যার যা ছিল কাঁথা কম্বল, বাটি ঘটি, খুরপী, কোদাল, গাঁইতি, বাটুল, বর্শা, শিঙা ভাঙ্গা মাদল আর দুই একটা মুরগী কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এল সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে। পেছনে পড়ে রইল বর্ষা বাদলে ঝাপ্টা খাওয়া ভাঙ্গা কয়েকখানা খড়ের ঘর। মড়কলাগা খাটাল আর বিবির গোসায় খাক হয়ে যাওয়া হাজা মজা পল্লী-প্রান্তর।

সূর্য তখন পাহাড়ের গা ঘেঁষে অস্ত যাচ্ছে। অপরাহ্ণের শেষ বেলা যাই যাই করেও তখন মুখ থুবড়ে পড়েছিল পাহাড়ের গায়ে। লাল আর লাল। একটা বড় সানুকের মত নিটোল সূর্য পাহাড়ের ওপারে তার দেশে ফিরে যাচ্ছে। আর সর্দারের দল চলেছে তাদের সাতপুরুষের মাটি ছেড়ে সমতল ভূমির উদ্দেশে। একবার সমস্ত দলটা অস্তোন্মুখ সূর্যের মুখোমুখি হয়ে ফিরে দাঁড়াল। সাত পুরুষের আসমানে অস্তোন্মুখ সূর্যের দিকে তাকিয়ে তারা শেষবারের মত সূর্য প্রণাম করল। তারপর শক্ত করে ধরল কোদাল, খুরপী, গাঁইতি আর বাটুল। পেছনে পড়ে থাক সাতপুরুষের মেহনতে গড়া মাটি।

ভুখ আর মদৎ। দুনিয়ার যে কোন প্রান্তরে গিয়ে থামুক না ওরা, মদৎ খাটালে ভুখ মরবে। এরকমই একটা মন্ত্রে মনে মনে আশায় আকাঙ্খায়, সংশয়ে সমস্ত সর্দার দলটা পথ চলছিল।

বচপনের সেই সব কথা শীতের কুয়াশার মত অস্পষ্ট ধোঁয়াটে মনে হয় দ্বারিকের। আর ভেবে সে অবাকই হয় সেদিনের সে বিশ্বাস—'মদৎ খাটালে ভুখ মরবে' এ যেন কত ফাঁকা হয়ে গেছে আজ তার কাছে। তা না হলে চরণ ভাত ভাত করে কাঁদবে কেন! আর সোনামনি কেনই বা বলবে পিতাজী চল দূরসে ভাগ যাই। দ্বারিক মুখ তুলে তাকাল সোনামনির দিকে। দেখল চরণকে কোলের কাছে নিয়ে দাওয়ার এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে সে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশটা দেখছে। হয়ত এ মাটি ছেড়ে পালিয়ে যাবার কথাই ভাবছে।

অথচ মদৎ তারা কম করে নি। ভাবলো দ্বারিক অনেক দুঃখে, অনেক ক্ষোভে। একবার মনে হল সোনামনি আর চরণের শূন্য দৃষ্টিটা আকাশের বুক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তার চোখের ওপর রাখে। ওরা শুনুক এ মাটির কথা। তার মদতের কাহিনী। না, শুধু সোনামনি বা চরণ নয়, সুন্দরবনের তামাম বাল-বাচ্চাদের ডেকে জড়ো করবে সে। শোনাবে সে কথা। সাক্ষী দোস্ত শুকরাম! এ তল্লাটের সব কথা-কাহিনীর মেজাজ মর্জি যার জানা আছে।

স্বর্যবেড়িয়া, কচুখালি, রাঙাবেলিয়া আরও কত নোনাসমুদ্রের দ্বীপের বুকে স্বর্য অস্ত যেত ঠিকই, কিন্তু কোনদিন জাগত না। সুন্দরী গাছের মাথায় স্বর্যটা থেমে যেত। সেদিন ছিল শামুক অন্ধকার। দিন রাত্রির ফারাক বোঝা দায়। সুন্দরী, অর্জুন, শাল-গোল, গেঁও হেঁতালের ঝোপেঝাড়ে ছিল গর্ভিনী অন্ধকার। নোনামাটিতে চলাফেরা করত হরিণের দল। হেঁতালের ঝোপে লুকিয়ে ছিল বড় শেয়াল। প্রাচীন সুন্দরীকে জড়িয়ে থাকত অজগর। কেউটের ড্যাকা লেজে দাঁড়িয়ে নাচত খেলত। শাঁখামুঠি সাপের দল অলস লাস্যে চলাফেরা করত এক ডেরা থেকে আরেক ডেরায়। পাতার ফাঁকে ডালে ডালে বাসা বেঁধেছিল বাদুড়, শামখোল, উকাশ, সবুজ টিয়া, কবুতর আর টিট্টিভ; জোলোপাতার আবর্জনায় মুখ গুঁজে থাকত বোড়া। নোনাজলে কামোট, মেছোকুমীর,

খোকা কুমীর, শুশুক, ইয়া বড় কচ্ছপ, নোনা চিংড়ী, পাঙাস, কাইন-মাগুর ভেটকী, পার্শে, ঘোলা, রিঠা আর চকবাটার ঝাঁক, কত রকম বেরকমের ঘোগ। বনবিবি তখন আসর জাঁকিয়ে অধিষ্ঠিত। মা বনবিবি কখনও বড় শিয়ালের পিঠে, কখনও শাংখালের ডানায় কখনও বা অজগরের তেল চিকচিক পিচ্ছিল শরীরে ঘুরে বেড়াতেন। সারা বন দেখতেন শুনতেন। হাওয়ায় গাছের পাতায় পাতায় জাগত বিচিত্র শব্দ। অন্ধকারে সে শব্দে হরিণ হরিণীর দল থমকে দাঁড়াত। এ পথ সে পথ নয়। এ যে বড় শেয়ালের চলার পথ। উল্টোদিকে ঘুরে ছুট দিত সমস্ত দলটা।

সে এক বিচিত্র আরণ্যক পৃথিবী। বিচিত্র অনন্ত তার ধর্ম। তার ভাঙ্গা-গড়া তার সমৃদ্ধি অবক্ষয়। এক অলিখিত নিয়মের নাগর দোলায় প্রতিটি জীবন সেখানে ঘুরছে, ফিরছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে। খতম হয়ে যাবে যদি একটু কসুর হয় তাদের কারও।

গোসাবার কালো জঙ্গল তখন সাফা হয়ে গিয়েছে। সেখানে গড়ে উঠেছে লোকের বসতি, জনপদ। এমন সময়টিতে এল দ্বারিক সর্দারেরা। বাসন্তী, মসজিদবাড়ি, হাসনাবাদ, মোল্লাখালি আর সাতজেলিয়ার আশপাশ থেকে এল নিবারণ নস্কর আর নীলমণি সর্দারের দল। দ্বারিক আর শুকরাম এসেছিল মসজিদবাড়ি থেকে। নিয়ে এল লখিন্দর সর্দার। দলের সর্দার সে বটে। তার সাথে ডিঙ্গালদের বাতচীৎ হয়েছে। সূর্যবেড়িয়ার কালো জঙ্গল সাফা করতে হবে। দাদন আগেই পেয়েছে। তা ছাড়া জমি পাবে তারা। চাষ-বাস করে ওখানেই বসতি গড়বে। তাই এল সর্দারের দল আশপাশ থেকে। মাচা বাঁধল সূর্যবেড়িয়ার কালো মাটিতে। তামাম দিনভর চলল বাদার কাজ। লখীন্দর এসেছিল সোহাগের মেয়ে শুক্রমনিকে নিয়ে। বাদার ওস্তাদ সে। জঙ্গলে সব মেজাজ মর্জি তার জানা আছে। যাকে বলে গুণীন।

কালো জঙ্গলে আলো ফোটাবার তিরিশ সাল আগেকার কথা আস্তে আস্তে সবই মনে পড়ছে দ্বারিক সর্দারের। ঠক্ ঠক্ ঠকাস্। তিরিশ বছর ওপার থেকে কুড়োলের শব্দ যেন ভেসে আসছে। বাতাসে সে শব্দ মিশে আছে। কান পাতলেই শোনা যায়।

যতটুকু করে সূর্যবেড়িয়ার কালো জঙ্গল সাফা হত মরদদের কুড়োলের

ঘায়ে মাথার ওপর ততটুকু নীল আকাশ আবিষ্কার করত তারা। একদিন বিস্ময়ে সবাই চোখ মেলে দেখল সূর্যবেড়িয়ার দ্বীপের ওপর সমস্ত নীল আকাশটাই ভোরের উজ্বল রোদে বিচিত্র হাসি হাসছে। খুশীতে ঝলমল করে উঠল মরদদের চোখ! লখিন্দর ওস্তাদ দুই হাত তুলে দোয়া মাগল, তার সাথে সাথে সব মরদেরা! আর তিরিশ বছর পর তারই নাতি নাতনীরা সেই আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে দ্বারিক সর্দারের। নড়ে চড়ে বসল সে ; দেখল বৃষ্টি অনেকটা থেমে এসেছে। বিকেল উত্তীর্ণ হয়ে সন্ধ্যা নামছে।

॥ ছয় ॥

সন্ধ্যার চড় তখন বৃষ্টি ভেজা আকাশের রঙে মধুময়। আট প্রহরের বৃষ্টি যেন সন্ধ্যার প্রাকালে আকাশকে একটু মুক্তি দিয়েছে ; আর সেই অবকাশে আকাশে রঙ ধরেছে ; আর এই রঙ বেরঙের খেলায় তখন বিদ্যাধরী পাঠানখালির চড়, হেঁতালের ঝোপঝাড়, গেঁও সোঁদালের গাছ-গাছালি, চৌকার শামুক গুগলি, ভেড়ির ফাঁকে ঘোগের দল সব মেতে উঠেছে। আষাঢ়ের প্রথম জলে যেমন আনন্দ, এই বৃষ্টি ধোয়া মুক্ত আকাশের রঙে তেমনি। ভিজে উঠে খানিকটা জিরিয়ে নেওয়া, খানিকটা রঙের অবকাশ।

ঘুরে ঘুরে সব ঘরে উঁকি মারছিল লোকটা। ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে ছাতার ডাঁটটা ঘুরাচ্ছে ; ঘুরে ঘুরে খোঁজ খবর নিচ্ছে ; দু-দণ্ডের কথাবার্তা। রতিকান্ত শ্যামল। অদ্ভুত নামটা। কিন্তু মুখে সর্বদাই হাসির প্যাঁচ লেগেই আছে। আর গলা যেন দরদের জিলিপী। লোকটা বলছে, হাসছে ; সন্ধ্যার অন্ধকারে তার কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া সর্দার মেয়ে-মরদের মনে কেমন হচ্ছে তা ঠাওর করার চেষ্টা করছে। চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের ছোট হয়ে আসে। মুখে অনেকগুলো রেখা দেখা দেয়। প্রত্যেকটা নিখুঁত, কেমন মানানসই যেন হাত দিয়ে মুখের ওপরকার রেখাগুলো মেপে কে বসিয়ে দেয়। লোকটা যাদু জানে।

যাদু না জানলে, হাসতে না জানলে, কাঁদতে না জানলে, মুখের রেখাগুলো ঠিক সময় ফুটিয়ে না তুললে সে কুড়ি বছর ধরে কেমন করে রাঘব ডিঙ্গালের নায়েব পদে বহাল থাকত! লোকটা এ প্রশ্ন নিজেকেই নিজে অনেকবার মনে করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঢোক গিলেছে। পরম তৃপ্তির ঢোক। ছাতাটা ঘুরাতে ঘুরাতে লোকটা সব ঘরে ঘুরছে।

গাংভেড়ির পাশে গইবাক্সের ঠিক ওপরে দাঁড়িয়ে লোকটা সবাইকে জানাল ; নিজে নিজেই কথাগুলো বলে যাতে সর্দার পল্লীর সবাই জানতে পারে। তোরা কেমন আছিস, এই এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তা খোঁজ খবর

নিতে হয় বৈকী ; বিপদে আপদে তোরা আমাদের আমরা তোদের। সর্দারপল্লীর মেয়ে মরদেরা অনেকবার শুনেছে একথা। কিন্তু আশ্চর্য প্রত্যেকবারই লোকটা এক এক রকম সুরে বলেছে কথাটা ; শুনতেও আলাদা লেগেছে। আর সর্দার পল্লীর প্রত্যেকেই তখনকার জন্য বিশ্বাস করেছে কথাটা। তাওতো রতিকান্ত শ্যামল খোঁজ খবর নেয়। দু'দণ্ড সুখ দুঃখের বাতচীৎ হয়। অনেকবার কাজিয়া হয়েছে লোকটার সাথে, কিন্তু রতিকান্ত শ্যামলের কাছে এসে দাঁড়ালে সে মনে রাখে না সে কাজিয়ার কথা, সে গোসার কথা।

—কে-গা, পালাস কেন, জল কেমন বুঝছিস ?

—তোর ভৈসটা বিয়ালে বাচ্চাটা দেখাবি।

—কবে ছেলে হলরে ! এ্যাঁ লজ্জা কিসের ?

—হালচাল আচ্ছা তো ?

—বড় আফশোসের বাৎ। তোর জোয়ান ছেলেটাকে সাপে কাটল।

—জানাবি, একটা ব্যবস্থা করে দেব।

—দু-কাহন খড় তো, তা নিস।

—বুড়িমাঈ, আর কটা নাতি নাতনী ঘরে এলোরে ?

—এবার মাঠে তোরা খাটতে যাবি তো ?

এরকম কত শত প্রশ্ন রতিকান্ত শ্যামল ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে করে। শেষে আসল প্রশ্নটা ছাড়ে ; উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচটা আঙ্গুলের ফাঁকে ছাতির ডাঁটটা ঘোরায়।

সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে দ্বারিক সর্দার দেখল রতিকান্ত শ্যামল ছাতি ঘোরাতে ঘোরাতে তার ঘরের দিকেই আসছে।

রতিকান্ত শ্যামল রাঘব ডিঙ্গালের নায়েব। কমলাটা অষ্টাদশী। রতির বৌ বটে। কিন্তু রাতের বেলায় থাকে রাঘব ডিঙ্গালের বুকের ওপর। ডিঙ্গালটার বুক জুড়ায়। আঠার কচি অন্ধকারে রাঘব ডুব মারে, আবার ভেসে ওঠে। অষ্টাদশী কমলার চিকন কোমরটা, ভরা যৌবনের ফুল দুটো দুলে দুলে ওঠে, রাঘব ডিঙ্গাল ডুব মারে। অন্ধকারে বিদ্যুৎ খেলে। ডিঙ্গাল ক্লান্ত হয়ে হাই তোলে। কমলা তখন মুথা ঘাসের মত নিঃসাড়, চোখ বুজে ডিঙ্গালের বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে।

রতিকান্ত শ্যামল। বিলে বাদায় ঢুঁড়ে, মাঠে মাঠে ঘুরে এ পাড়া সে পাড়া হয়ে ঘরে ফেরে। দুটো ভিজে ভাত ছাতু দিয়ে খায়। মাদুরটায় গড়ায় আর হাই তোলে।

রাঘব ডিঙ্গালের রাত দুই প্রহরে ঘুম ভাঙ্গে। ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢালে। প্রথম প্রহরের দলিত মুথা ঘাসের গুচ্ছ আবার বুকে তুলে নেয়। কমলা প্রতিবাদ করে কিন্তু রাঘব ডিঙ্গালের বাহুপাশে তখন সে ডুবে গেছে।

রতিকান্ত শ্যামল। রাত্রি দু'প্রহরে হঠাৎ জেগে নদীপারের বাতাসের গর্জন শুনে চমকায়। পাশ ফিরে শোয়। কোনদিন কুঁজো হতে এক গেলাস জল গড়িয়ে খায়। সেই শেষ রাতে কমলা ঘরে ফিরবে, চোখ দুটো ফোলা ফোলা, সারা গায়ে ঘামের গন্ধ, কাপড় আলুথালু। ভোর হবার আগেই রতিকান্ত শ্যামল ঘুমের ঘোরে টের পাবে কমলা পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোর হয়। রতিকান্ত শ্যামল বেরিয়ে পড়ে। বগলে ছাতি।

রাতের বেলায় ঘরে তার বৌ থাকে না। মাঝরাতে রতি ভুলে গিয়ে কমলাকে খোঁজ করে মাঝে মাঝে। তখন বুকটা ফাঁকা, মনটা ফাঁকা।

মুখটা ফিরিয়ে ঘরের ভেতর উঠে যায় দ্বারিক। ছাতাটা ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে আসে লোকটা। মুখে সেই হাসি।

—কইগা এরই ভিতর ঘুমিয়ে পড়লে নাকি সব? রতিকান্ত দেখতে পেয়েছে তাকে আসতে দেখে দ্বারিক ঘরের ভেতর চলে গেছে, কিন্তু রতিকান্ত সে প্রসঙ্গে এল না, যেন সে কিছুই দেখতে পায় নি। লোকটাকে নিয়ে মুশকিল এখানেই। লোকটা যেন কিছু দেখেও দেখে না। বুঝেও বোঝে না। অথচ দ্বারিক জানে বেটা সব দেখে, সব বোঝে। রতির চোখকে এড়িয়ে কিছু ঘটবার উপায় নেই। হাজার চোখ শালার।

হাজার চোখের রোশনাইয়ে ও চোখ রাঙায় আবার সেই চোখেই হাসি ফোটায় সময় বিশেষে। দ্বারিক জানে ও সময় করে সর্দার পল্লীতে ঘুরতে এসেছে। রাঘব ডিঙ্গালের ধেনো জমিতে জন খাটবার লোক জোগাড়ের জন্য; কিন্তু ভড়ং করে বলছে এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। লোকটার মুখ দিয়ে এখন মিষ্টি খই ফুটবে। রতিকান্ত শ্যামল ও জানে তার এই

চতুর চালাকী আর কেউ সর্দার পল্লীর না বুঝুক দ্বারিক অন্ততঃ কিছুটা বোঝে। তাই সে লোকটাকে ঘাঁটাতে চায় না। অনেক সময় এড়িয়ে যায়। আবার কোন সময় কাছে ডেকে ভিজাতে চেষ্টা করে। সর্দার পল্লীর মুরুব্বি সে আর শুকরাম সর্দার। একজনকে ভিজালে আর এক জনকে গলান যায়।

দ্বারিক ঘরের ভিতর উঠে গেল; কিন্তু সোনামনির মুখোমুখি হতেই রতিকান্ত মুখে সরস কথা আনার চেষ্টা করে। অঙ্গুলের মাঝে ছাতির ডাঁটটা ঘোরায়। কি-গা, এবারে জনমজুর খাটবা, তা কোন মাঠে? একটু থেমে থেমে রতিকান্ত প্রশ্নটা করে। অন্য কোন ঘোরাল কথার জাব্‌র না কেটে। রতিকান্ত সোনামনিকে চুপ করে থাকতে দেখে ভাবল এবারে সে মজুরির কথা তুলবে। আগেভাগেই জেনে নিতে চাইবে জন প্রতি কত। কিন্তু সেটি হচ্ছে না। ঝোপ বুঝে কোপ। কার গরজটা বেশী সেটা আগে ঠাওর হোক। পরে মজুরির কথায় আসা যাবে।

সোনামনি একটু অলস হাসল; মুখটা ভাবলেশহীন করে এক সময় বল্ল—জী-হ্যাঁ, জরুর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করল না এবারে রোজ কত মিলবে। বলল না কোথায় তারা জন খাটবে—ডিঙ্গালঘেড়ি না জানাঘেড়ি না নদী পেরিয়ে গোসাবা বা রাঙাবেলিয়ায়। কিন্তু এতেই আশ্বস্ত হল রতিকান্ত শ্যামল। সে নিশ্চিত জানে মাঠের কাজে সোনামনিরা লাগলে ডিঙ্গাল-ঘেড়ি ছেড়ে কোথায়ও যাবে না, যদি ইতিমধ্যেই কেউ লেগে গিয়ে না থাকে। কেউ না উসকায়। দ্বারিক এবারে মাঝিগিরি করবে বটে! কথাটা জিজ্ঞাসা করেই ফেলে রতিকান্ত। কৌশলে আসল কথাটা জেনে নিতে চায়। সোনামনি সে কথার জবাব দেয় না।—তা ভাল গা। রতিকান্ত কথার উত্তর না পেয়ে চুপ করে যায় এই ছোট কথাদুটি বলে। সে হাওয়াটা ধরতে পেরেছে। এবারে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। কাল আরেকবার আসবে সে।

সোনামনি তেমন ভাবেই বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে রতিকান্তকে দেখছিল, রতিকান্তের পাশে সেই কাটার দাগটা এখনও দগদগ্ করছে। ওটা পিতাজী করেছে হাতের পাচনি ছুঁড়ে মেরে। রতিকান্ত ছাতি দিয়ে তার কানের পাশটা আড়াল করল।

ছুঁড়িটা কেমন প্যাট প্যাট করে তাকাচ্ছে।—আজ চলি, বুঝলি? রতিকান্ত আস্তে আস্তে গাংভেড়িতে উঠে আসে। ডিঙ্গালঘেড়ির পথ ধরে। সোনামনি ঘাড়টা নাড়ায়। কোন কথা বলে না। শুধু ওর ফিরে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জোয়ারের জল ভাটায় এখন গাইবাক্সটা দিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে! গাংভেড়িতে উঠে এসে রতিকান্ত গাইবাক্সের মাথার কাছে দাঁড়ায়। পকেট থেকে বিড়ি আর চকমকি বের করে বিড়িটা ধরায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জলের শব্দ শোনে। মনে মনে ফন্দি ফিকির আঁটে। এখনই গিয়ে আবার রাঘব ডিঙ্গালের সামনে দাঁড়াতে হবে। তার আগে সব গোছগাছ করে নেওয়া ভাল। মনের কথাগুলো রতি গোছগাছ করছে।

ক্ষেত মজুরের ঘরের মেয়েটা যাবে মাঠের কাজে, বেটাটা বড় হলে আলবৎ যাবে, কিন্তু ওদের পিতাজী যাবে না। দবিয়ায় ভাসবে অথবা মরিরঝাপি, আমলাবেতীর মহাজনদের নৌকায় মাঝি খাটবে। সে ঢের ভাল। সন্ধ্যার অন্ধকারে দ্বারিক ঘরের ভেতর শুয়ে শুয়ে কথাগুলো ভাবল। এসময়টা সে ঘরে থাকলে দোস্ত শুকরামের ওখানে যায়। খোশগল্প হয়। দুই একটা সুখ-দুঃখের কথা। কিন্তু আজ কেন জানি কিছু ভাল লাগছে না ওর। রতিকান্ত শ্যামল আবার সবাইকে মাঠের কাজে নিতে এসেছে। রাতের অন্ধকারে ফাঁকা মাঠে আলো দেখা যায়। সে আলেয়া। পথচারীকে পথ ভুলায়। রতিকান্ত শ্যামল সেরকম আলো। সবাইকে পথ ভুলিয়ে মাঠে নিয়ে যাবে। হাতে তুলে দেবে লাঙল-খুরপী। রোজ ঠিক করে দেবে। সবাই নির্বিবাদে কাজে লেগে যাবে। হ্যাঁ, পিঠ টান করে দাঁড়াতে পারে দ্বারিক; বলতে পারে কোন মেয়ে মরদের যাওয়া হবে না মাঠে। দোস্ত শুকরাম এসে দাঁড়াবে তার পাশে। কিন্তু সব সময় হয়ে ওঠে না। কোন ফাটল দিয়ে ওদের মনে অবিশ্বাস ঢোকে। ওরা মানতে চায় না। একদিন দেখা যায় একে একে সবাই মাঠে গেছে। আবার অনেক সময় নিষেধ করাও হয় না। একটা কিছু করতে হবে। দুটো খেটে খেতে হবে। কাজিয়া করে, মাঠের কাজ বন্ধ করে আর কদিন চলে।

চরণ অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সোনামনি দ্বারিকের পাশে এসে শুয়ে পড়ে। রতিকান্ত শ্যামলকে আসতে দেখে দ্বারিক ঘরে চলে এসেছে। আর সোনামনি ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মাঠের কাজ নিয়ে বাৎচিৎ করেছে। এতে পিতাজীর গোসা হতে পারে। কিন্তু গোসা হলেও সেকথা জানাবে না পিতাজী। মুখ ফুটে কিছু বলবে না। হাবেভাবে কিছুটা বুঝবে সোনামনি। আস্তে আস্তে একটা হাত পিতাজীর বুকের ওপর রাখে সোনামনি। বুকটা জোরে ওঠানামা করছে দ্বারিকের। সোনামনি জানে পিতাজী কিছু ভাবলে বুকটা ওঠানামা করে। কি ভাবছে পিতাজী—মাঠে যাবার কথা; রতিকান্ত শ্যামলের কথা। বছর কয়েক আগে যার কানের পাশে একটা নিশানা তৈরী করে দিয়েছে সে। বেইমানির নিশানা। যতদিন রতি বেঁচে থাকবে ততদিন সবাই জানবে ওটা পিতাজী করেছে। কথাটা ভাবতে ভাল লাগল সোনামনির। পিতাজীর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে ও ভাবতে ভাল লাগে ওর, কিন্তু এমনটি আর কিছুতে নয়। তবে সর্দার পল্লীর মেয়ে মরদেরা যার যেখানে খুশী খাটুক না কেন, রুজি রোজগার করুক না কেন তা নিয়ে কেউ কাজিয়া করে না। পিতাজীও করবে না। সোনামনি মাঠের কাজে যাবে; পিতাজী অসন্তুষ্ট হলেও বাধা দেবে না। মর্জির ওপর কারও বলার কিছু নেই, মেজাজের ওপর কথা খাটে না। একথা পিতাজী হক্‌ জানে। যেমন জানে আরও পাঁচজন। তাই সোনামনির আশঙ্কার সাথে আশ্বাসও আছে। আর মনে মনে সেরকম বিশ্বাসে সে বড় হয়েছে।

পাশ ফিরে শোয় সোনামনি। ঘুমোবার আগে মাঠে যাবার কথাই ভাবে সে।

॥ সাত ॥

বর্ষায় নদী ফাঁপে ফোলে। তার সাথে আছে চাঁদের কারসাজি। চাঁদ ডাক দিয়েছে সমুদ্রকে। সমুদ্র ছড়িয়ে পড়ে নদীতে নদীতে; মাতলা বাসন্তী, পাঠানখালি আর বিদ্যাধরীতে।

সকাল হতেই আকাশ জুড়ে মেঘ ছিল। সমস্ত আকাশটায় একটা গুমগুম আওয়াজ। যেন কিসের ষড়যন্ত্র। সেই সাথে বাড়ছে বিদ্যাধরী, পাঠানখালির জলের চাপ আর গর্জন। পূর্ণিমা তিথি। সকাল থেকেই জলের ক্রমাগত স্ফীতি লক্ষ্য করে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার সকল মানুষ ভয় পেয়েছে। এ নদীর মেজাজ মর্জির সাথে তাদের জীবন মরণ জড়িয়ে আছে। তাই এই নদীকে তারা ডরায়। পূর্ণিমার ভরা জোয়ারে নদী যদি খুব খুশীতে মেতে উঠে আর গাংভেড়ির কোন একটা ফাঁক দিয়ে জোয়ারের জল যদি একটা ধ্বস নামায় তাহলে আর রক্ষে নেই। সমস্ত দ্বীপ সূর্যবেড়িয়া তখন সমুদ্রে পরিণত হবে। যে ফসল আগামীতে ঘরে তোলার কথা তা যাবে ফু-মন্তরে উড়ে। একেই তো একফসলা জমি, তায় নোনা জল খেলে দু'কি তিন সন যাবে অজন্মা। যতদিন না আবার নোনা কাটবে ততদিন আর ফসলের নামটিও নেই। দুর্ভিক্ষ আসবে, মড়ক-অনাহার, পীড়ন-উৎপীড়ন, তায় জলের হাত থেকে যারা রক্ষে পেল, কোনরকমে প্রাণে বাঁচল তারাও পঙ্গপালের মত দলে দলে দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। কোথাও কোন নির্দিষ্ট জায়গায় নয়, যেদিকে যে পারবে। তখন বেরিয়ে পড়াটাই কথা।

ঘরে দ্বারিক আর কালুয়া। সারা সকাল সে সোনামনি আর চরণকে নিয়ে শাপলা শালুক তুলেছে। ডিঙ্গালঘেড়ির সব ঘেড়ি, বেদানা খাল আর সুন্দরীখাল বাদ রাখে নি। কিন্তু পেয়েছে যৎসামান্য। আজকের দিনটাই তাতে চলবে। কাল আবার বেরোতে হবে। হাওলাত এখন কারও কাছেই মেলে না। না মহাজনের গদীতে, না সর্দার পল্লীর কোন ঘরে। মহাজনের মুঠো শক্ত আর সর্দার পল্লীর সবার হালই প্রায় এক। দ্বারিক আশা করেছিল নৌকার মালিকের কাছে কিছু ধার মিলবে,

কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এসেই ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল সে। যা হোক একটা কিছু দিয়ে পেট ভরাতে হবে। সারা সকাল শাপলা শালুক টুঁড়তে সে কেমন ক্লান্তি বোধ করছে, তাই দুপুরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু আকাশ জুড়ে মেঘের ঘটায় মনটা কেমন অশান্ত হয়েছে; সে অনেক ভেবেছে আশঙ্কাটা তার কাছে নিছক বেয়াদবি, যার জমি আছে তার ফসল যাবে, নোনা লাগে তার মাঠে লাগুক, সে ঝাড়া হাত-পা-র লোক, জোয়ারের জল এল বা গেল তাতে তার এমন বেশী কিছু আসে যায় না; ঘরের চালাটা কাটবে, দ্বীপ ভাসলে, ছেলেমেয়ে দুটোকে বুকে নিয়ে চালায় ভাসতে ভাসতে কোথায়ও গিয়ে সে পৌঁছাবে নিশ্চয়ই। এর চেয়েও বড় ভাবনা আছে তার। আজ আবার বেলতলীর হাট। কিন্তু ট্যাঁকে রূপেয়া নেই। সওদা হবে না, না হোক। তার ওপর সাহাজী স্রেফ বলে দিয়েছে নগদা নগদ হাড়িয়া, বাকী কারবার নেই, আর চলবেও না। তাই কিছুতেই ওর আকর্ষণ নেই।

বেলতলীর হাটে যাবার ইচ্ছাটা মন থেকে তাড়িয়ে দ্বারিক ভেটকী ধরার মতলব আঁটছিল এমন সময় সোনামনি আর চরণ হাত ধরাধরি করে ওর সামনে এসে উপস্থিত হল। এই দুপুরে কোনদিন ভাই বোনে ঘরে থাকে না, ঘুরতে বের হয়। আজও তেমনি বেরিয়ে গাংভেড়িতে ঘুরছিল তারা, চাচা শুকরাম দেখতে পেয়ে ডাকে। অন্য দিনকার মত গাংভেড়িতে বসে চাচা একটা লাঠি বানাচ্ছে। ওদের ডেকে বিদ্যাধরী আর পাঠানখালির মেজাজ মর্জির কথা জানায়। বড় খারাপ ঠেকছে তার। একটা কিছু ঘটতে পারে। হুঁস রাখতে হবে। সন্ধ্যা নাগাদ যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে।

সেই কথাই পিতাজীকে জানাতে এসেছে তারা। দেখল পিতাজী বুকের ওপর হাত দুটো রেখে চোখ বুজে শুয়ে আছে। ওরা জানে পিতাজী ঘুমাচ্ছে না, কিছু ভাবছে। চরণ এ সময়ে পিতাজীকে ডাকতে সাহস পায় না। কেমন ভয় হয়। সোনামনি ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে। বলার সময় ওর মুখ কেমন শুকিয়ে ওঠে। জিভ জড়িয়ে যায়। কিন্তু চাচা শুকরাম পূবদিকের ভেড়িতে আছে তা জানাতে ভুল হয় না। পিতাজী

আর চাচাজীতে যুক্তি করলে অনেক অসম্ভব সম্ভব করতে পারে এমন একটা ধারনা সোনামনির মনে বদ্ধমূল।

দ্বারিক উঠে বসে। দোস্ত শুকরামের কাছে যাবে সে। সব শুনে না গিয়ে তার উপায় নেই। সে না গেলেও শুকরামই আসবে। দোস্তে দোস্তে এমনই বোঝাপড়া।

শুকরাম সর্দার অবসর সময়ে যেমন থাকে আজও তেমনি একটা লাঠির জগতে ডুবেছিল। তাই সে দেখতে পায় নি দ্বারিককে। দ্বারিক এসে দোস্তের পিঠে একটা চাপড় মারল। শুকরাম জানে তার পিঠে এ কার চাপড়। বলিষ্ঠ হাতে এই চাপড়ের অর্থ জানে সে। অর্থাৎ উঠে দাঁড়াতে হবে, গাংভেড়িতে দাঁড়িয়ে হাঁক দিতে হবে সব মরদ জোয়ানদের; তাদের সাথে আসবে মেয়েরাও। এরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়লে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার এমন কোন সর্দার মরদ নেই যে সে ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকবে। আগে আগে যেমন ঘটত এখনও তেমনি হবে এ বিশ্বাস দুজনারই আছে।

শুকরাম অর্দ্ধসমাপ্ত লাঠিটা আর কাটারিটা নিয়েই উঠল। এখন ঘরে ঘরে যাবে সে আর দ্বারিক। ডেকে সবাইকে বলতে হবে নদীর মেজাজ মর্জির কথা। যাদের বেলতলীর হাট না গেলেই নয় তারা যাক কিন্তু সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসুক। কারণ তারা পিছে ফেলে যাবে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার ধানের মাঠ, ঘরবাড়ী, বাল-বাচ্চা, দুদুটো খ্যাপানদীর পাশে, নদীর মেজাজ মর্জির ওপর। সন্ধ্যার আগে নদী কানায় কানায় উপচে পড়বে। সেই সময়কার ধাক্কাটাই সামলাতে হবে। না পারলে সব যাবে। জোয়ার এসে ভাসিয়ে দেবে ছোট্ট দ্বীপটাকে। দৈর্ঘ প্রস্থে সাত—চার দ্বীপ সূর্যবেড়িয়াকে।

সন্ধ্যার আগেই বিশ তিরিশজন মরদ মিলে কোদাল আর ধামা নিয়ে লেগে গেছে মাটি কাটতে। যেখানে যেখানে ফাটল দেখছে ঘোগ দেখছে সেখানে আগে থেকেই বড় বড় চাপ এনে ফেলছে ওরা। এ কাজে মেয়েরাও লেগেছে। মরদরা মাটি কোপাচ্ছে, মেয়েরা ধামা করে এনে সে চাপ গাংভেড়িতে ফেলছে।

সেই দুপুর থেকে সারা বিকেল ঘুরছে দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম সর্দার

পল্লার ঘরে ঘরে। সবাইকে জানিয়েছে আশঙ্কার কথা, ভয়ের কথা। ওদের কথায় অনেকেই যায় নি বেলতলীর হাটে, দুই একজন:ছাড়া যাদের না গেলেই নয়। তারাও ফিরে এলো বলে ; কথা দিয়ে গেছে।

এসেছে নিবারণ আর তার বেটা রূপচাঁদ। ওদের বিঘে খানেক জমি আছে। সারা বছরের ফসল উঠবে সে জমি থেকে। এ জোয়ারে সূর্যবেড়িয়া ভাসলে ওদেরও দ্বীপ ছাড়তে হবে। তামাম বছরের সমস্ত আশা-ভরসা ফুঁকে যাবে। প্রথমে নিবারণ ভেবেছিল আসবে না। তাহলে দ্বারিক সর্দারকে বড় বেশী ভাবতে দেওয়া হয়। কদবেল গাছে পেত্নী বাঁধা নিয়ে ওদের কলহ। কিন্তু জোয়ান বেটা রূপচাঁদ আগে থেকেই আকে তাড়া মেরেছে ; কথা বলার ফুরসৎ দেয় নি। বাপ বেটা নিজেই এক বিঘে জমি চষবে। ফসলও হবে ভাল। আষাঢ়ের প্রথম জলটা সেরকমই নিশানা দিল। তাই নিবারণ আর গোসা করতে পারে নি। উঠে আসতে হয়েছে কোদাল নিয়ে। গাংভেড়িতে এসে আর পাঁচজনের মত কাজে লেগে গেছে। তা ছাড়া এসেছে পশ্চিমের ঘরের বুধিয়া, রতন, বীরু আর তাদের ঘরের মেয়েরা। পুবের সুখলাল, হারান, মেচুরাও এসেছে। সোনামনিও এসেছে। একদিকে যেমন পিতাজীর ডাক অন্যদিকে সেরকম রূপচাঁদের আকর্ষণও আছে। মেজাজে রূপচাঁদও আসবে। মায় চাচা শুকরামের মাথা মচকানো বউটাও এসে মাটি বইছে।

সবাই মিলে কাজে লেগে গেছে। অথচ একাজ করতে তাদের জমিদার বা সরকার বাহাদুর কেউই এত্তালা দেয় নি। দুই একটা নেশাখোর বেলদারের ওপর নির্ভর করে গাংভেড়ি ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাই নিজেদেরকেই কাজে লাগতে হয়।

ভাটায় যে চৌকাগুলো কুমীরের পিঠের মত আঁকাবাঁকা দাগ বুকে নিয়ে জেগে থাকতো সেগুলো অনেক আগেই ডুবেছে। হেঁতাল আর বন ঝাউ-এর ঝোপ অন্যদিন জোয়ারে উঁকি মেরে থাকে। সেগুলো আজ আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু গেঁওর ডালপালা এখন জলের বুকে জেগে আছে। নদীর বুকে একটা শব্দ জেগেছে! জোয়ারের স্রোতের শব্দ। সেই শব্দ অনেক সময় কান পেতে শুনলে কেমন যেন নেশা ধরে। সন্ধ্যার জোৎস্না প্লাবিত গাংভেড়িতে দাঁড়িয়ে থেকে মাঝে মাঝে সে শব্দ সর্দার মেয়ে

মরদরা কান পেতে শুনছে। কত দিন এ নদীর পারে ওদের বাস হল। এ নদীর সব কথা ওরা তেমন করে বোঝে। ওদের মর্মের সাথে এ নদীর একটা বোঝাপড়া আছে।

জোয়ারের স্রোতে মাঝে মাঝে দুই একটা ভাঙা মচকানো গাছ-গাছালি ভেসে আসছে। কখনও সেটা ঘূর্ণির সাথে পাক খাচ্ছে, কখনও ঢেউয়ের মাথায় নাচছে। মাঝে মাঝে দুই একটা মেছো কুমীর ঢেউয়ের সাথে ভেসে উঠে বুড়বুড়ি কেটে আবার তলিয়ে যাচ্ছে। কখনও বা দুই একটা রূপালী চকবাটা বা পার্শে লেজ বেঁকিয়ে লাফ মেরে আরার নদীর স্রোতে তলিয়ে যাচ্ছে। নদীর বুকে ঢেউয়ের মাথায় জ্যোৎস্না ধরা পড়েছে। দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম গাংভেড়িতে ঘুরে ঘুরে সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখছে কোথায়ও ঘোগ দেখা দিল কিনা। এই সময় সামান্য একটা ঘোগের ষড়যন্ত্রে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়া রসাতলে যাবে। দুই দোস্তের কাঁধেই কোদাল। গই বাক্সের পাশের বাঁকটায় চীর ধরেছে। দুই দোস্তে লেগে গেল মাটি কোপাতে। পাঁচ দশটা মাটির চাপ দিতে হবে ঐ চীরের মুখে।

কাজ করতে করতে কখন সোনামনি আর রূপচাঁদ কাছাকাছি চলে এসেছে। এই কাছে আসাটা যেন অনিবার্য। এখন রূপচাঁদের কোপান মাটি সোনামনি মাথায় করে গাংভেড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। রূপচাঁদের শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে। চাঁদের আলোয় নিকষ কালো পেশল বুকে ঘামের পালিশ লেগেছে। মাটির চাপ নিয়ে এসে দাঁড়ায় সোনামনি। ঝুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে রূপচাঁদের সামনে বসে পড়ে। দু'দণ্ড কথা হবে। ভাবখানা এমন। কিন্তু রূপচাঁদ তাড়া মারে—হেই যা যা। রূপচাঁদের চোখে মুখে তিরস্কারের ভাব। এখন বসার সময় নয়। মিঠে আলাপের সময় নয়। নদীকে বাঁধতে হবে। আর ঘণ্টাখানেক নদীর সাথে যুঝলে তবে হবে। এখন বসে খোশগল্প করা চলবে না।

ঝুড়িটা তুলে নিয়ে সোনামনি সেখান থেকে পালিয়ে এল। কেঁদে ফেলত সে। কিন্তু আশেপাশে তাকিয়ে দেখল গাংভেড়িতে অনেক মরদ ঘুরছে ফিরছে। এমন কি চরণটা কখন এসে কোমরে হাত দিয়ে মুরুব্বির মত দাঁড়িয়ে আছে। আর মধ্যে মধ্যে দুই একটা

মেছো কুমীর, শুশুক ভেসে উঠতে দেখলে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠছে। সোনামনি ধীরে চরণের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

চরণ এতক্ষণ আপন মনে জোয়ার দেখে একাই মেতে ছিল খুশীতে। এখন দিদিকে কাছে পেয়ে আনন্দে সে খিল খিল করে হেসে উঠল। সেই মুহূর্তে মাঝ নদীতে একটা কুমীর পিঠটা ভাসিয়ে আবার ডুব মারে। চরণ সোনামনির একটা হাত ধরে আকর্ষণ করে। সে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না। আর পাঁচজনের মত তার আট বছরের শক্তি-সামর্থ দিয়ে আজকের জোয়ার রোখার কাজে লেগে পড়তে চায়।

রূপচাঁদের রূঢ় ব্যবহারে সোনামনি আহত হয়েছিল। তাই মাটি বইতে না গিয়ে চরণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। খানিকটা নির্জনে; কিন্তু চরণও তাকে আবার কাজের মধ্যে আকর্ষণ করছে। সে বেশ বিরক্ত হল।

তবুও দুই ভাই বোনে এগিয়ে গেল যেখানে রতনলাল মাটি কাটছে। মাথায় করে মাটির চাপ বইবে বলে। চরণ নিয়েছে একটা ছোট দেখে— ওর হিম্মত অনুযায়ী। কিন্তু এতেই সে খুব খুশী হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। পিতাজীর ডাকে সেও সাড়া দিয়েছে। পিতাজী আর চাচাজী দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে।

মাটির চাপ বইতে বইতে সোনামনির মনে একটা চিন্তার উদয় হল। ঠিক ঘোগের ঠ্যাংয়ের মত বাঁকা সে ভাবনাটা। ঘোগ হল গাংভেড়ির কাঁকড়া। তাই তারা গাংভেড়িতে যে সুড়ঙ্গ বানায় তাকেই দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায় ঘোগ বলে। সে যাক, এদিকে সোনামনি ভাবল মরদরা তো খুব করে মাটি কোপাচ্ছে। ওদের গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। ঠিক যেমন রূপচাঁদের গা দিয়ে ঝরছিল। কিন্তু সব কৌশিশ সত্ত্বেও যদি একটা ফাটল দেখা দেয়, ধ্বস নামে! জোয়ারের জল ঢুকবে। পাঠানখালি আর বিদ্যাধরী ঢুকবে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায়। রূপচাঁদের বিঘাখানেক জমি তখন জলের তলে। রূপচাঁদের ভৈসটা দৌড়াচ্ছে। লেজ উঁচিয়ে দৌড়াচ্ছে। ভৈসটার পিছন পিছন ছুটেছে বিদ্যাধরী আর পাঠানখালি। এক সময় ভৈসটা সমুদ্রের দিকে ভাসতে ভাসতে চলল। এ পর্যন্ত ভেবে হঠাৎ কেন জানি চমকে ওঠে সোনামনি।

সে অনেক সময় এমন কত শত মজাদার কথা ভাবে। কল্পনায় গড়ে নেয় অনেক কিছু। আজও তেমনি একটা কিছু করছিল। কিন্তু নিজের ভাবনায় সে নিজেই চমকে উঠল। চলতে শুরু করল সে। দেখল চরণ পিঠ বেঁকিয়ে একটা মাটির চাই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দূরে রূপচাঁদ গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছছে। তার মুখে চোখে হাসি।

শেষ ধাক্কা দিয়ে জোয়ার চলে গেল। স্রোতটা এখন উল্টো বইতে শুরু করেছে। ভাটার সময়। সমুদ্রের জল আবার সমুদ্রে ফিরে চলল। ধীরে ধীরে জল নামতে শুরু করেছে। আশঙ্কা কেটে গেছে। সবাই এখন ঘরমুখো হবে।

সোনামনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল হেঁতাল আর বনঝাউয়ের ঝোপঝাড়গুলো আবার উঁকি মারতে শুরু করছে। যে সমস্ত নালা দিয়ে জল ঢুকেছিল এখন ভাটার টানে সে জল আবার ফিরে চলেছে বিচিত্র শব্দ জাগিয়ে। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার বাতসে ভাটার টানে জলের শব্দে একটা সুর উঠেছে। মাথার উপর চাঁদ। বাঘের চোখের মত চকচকে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। অনেক সময় বৃষ্টি থেমে আছে। তারাগুলো অনেক দূরের আকাশে মেঘের ফাঁকে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু চাঁদের বুকে মেঘ এখনও জমে নি। এমন দিনে চাঁদ দেখার ক্লান্তিতে একটা বিচিত্র পুলক আছে।

সোনামনির সমস্ত বিষাদ, বিরক্তি কেটে গেছে। সেগুলো এক জোয়ারে এসেছিল, আবার জোয়ারের সাথে সাথেই চলে গেছে। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়া ভাসে নি। রূপচাঁদের ভৈসটা ছুটছে না লেজ উঁচিয়ে। এসব মনের অদ্ভুত ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা। সোনামনি ঘাড় কাত করে চাঁদ দেখছে। হাজার হাজার বছর আগের পুরনো চাঁদ। তবুও অদ্ভুত নতুন। তার মনে এই চাঁদ বিচিত্র সব কল্পনা সৃষ্টি করতে পারে। চাঁদের ভেতর সোনামনি দেখে একটা মুখ। তাজ্জব। চাঁদটার মতই আজব। মুখে সামান্য দাড়ি আছে। আর চোখে :চশমা। যেমন আছে সিংহঘেরির পুরুতঠাকুরের চোখে। একদিন কথাটা বলেই ফেলেছিল সোনামনি পুরুতঠাকুরকে। তখন সে অনেক ছোট। বলে ধমক খেয়েছিল। কিন্তু ওর অবিশ্বাস আসে নি।

পাঁচ বছর আগে যেমনটি দেখত, আজও চাঁদের দিকে তাকিয়ে সে তেমনটি দেখছে। এই দেখায় একটু নড়চড় নেই। চরণও দেখে। তবে ওর মতন নয়। চরণ দেখে একটা বড় গাছ আর পাখি। লেজটা বেশ বড় আর ঝুলানো। এ নিয়ে দুজনের অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। আকাশে চাঁদ দেখা দিলেই ভাইবোনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছে। কিছুক্ষণ পর দুজনে দুজনকেই জিজ্ঞাসা করে পরস্পরের মত জেনেছে। চরণ বলেছে গাছ আর পাখির কথা। সোনামনি বলেছে সেই অদ্ভুত মুখের কথা। দুজনা দুজনকে সাধ্যমত বর্ণনা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউই বোঝে নি। চরণ স্বীকার করতে রাজী নয় চাঁদের ভেতর মুখ আছে। সোনামনিও কোনদিন দেখে নি গাছ আর পাখি। সোনামনি আজও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদের সেই তাজ্জব মুখটা দেখছে। নির্জন গাংভেড়ি। যে যার ঘরে ফিরে গেছে। আরেকজনের সাথে চাঁদের মুখ নিয়ে কথা হয়েছিল। সে রূপচাঁদ। রূপচাঁদ সব শুনে হেসে গড়াগড়ি গেছে। তারপর এক সময় বলেছে চাঁদে নাকি তারই মুখ আছে। সোনামনি এখন থেকে তাই-ই দেখবে। এসব বছর দুই আগের কথা। কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত। সেই রাত্রিটার কথা ভাবল সোনামনি। ভাবতে কেমন জানি একটা আবেগ আসে।

সেই সময় একটা হাত সোনামনির বাঁ হাতটা শক্ত করে ধরল। সোনামনি চমকে পেছন ফিরে চাইতেই দেখল রূপচাঁদ তার দাঁতের পাটি বের করে হাসছে। ওর পেশল বুকে ঘামের পালিশ এখনও শুকোয় নি। সোনামনি হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু রূপচাঁদ আরও শক্ত করে ধরে। তখন সোনামনি নিরুপায় হয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়। রূপচাঁদ হাতটা ছেড়ে দিয়ে সোনামনির সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। সোনামনির হাসি পায় রূপচাঁদের এই ছেলেমানুষিতে। সেই হাসিতে রূপচাঁদের হাসিটা আরও বেড়ে যায়। গাংভেড়িতে তখন ওরা দুজন।

ওরা চুপচাপ গাংভেড়িতে অনেক সময় বসে থাকে। কেউই কথা বলছে না। না সোনামনি, না রূপচাঁদ। সোনামনির মনে হল রূপচাঁদের

পিতাজীর কথা। হারিক সর্দারের সাথে রূপচাঁদের পিতাজীর কাজিয়া। কদবেল গাছে ধুম পেত্নী আটকে রাখা নিয়ে। দুজন দুজনকে শাসিয়ে ছিল। সেই থেকেই কাজিয়ার সূত্রপাত। সোনামনি অনেকদিন মনে মনে স্থির করেছে ব্যাপারটা রূপচাঁদকে বলবে। কিন্তু বলতে পারে নি। কোথায় যেন বেধেছে। আজও বলতে গিয়ে থেমে গেল। অনেক চেষ্টা করেও বলতে পারল না। পারলে হয়ত ভাল হত। কাজিয়াটা মিটে যেত। এটা সোনামনির ধারণা।

আরও কতক্ষণ ওরা দুজনই চুপচাপ বসে থাকত বলা যায় না। হঠাৎ সোনামনি রূপচাঁদের হাত ধরে এক টান দিল। কিছু দূরে গেঁওর ডাল থেকে একটা খেঁকশেয়াল দুটো পায়ের সাহায্যে ঝুলে আছে। নীচে বিদ্যাধরী। শেয়ালটা না পারছে ডাঙায় উঠতে, না পারছে নীচে নামতে। যতক্ষণ না বিদ্যাধরী ভাটায় অনেকদূরে সরে যাচ্ছে ততক্ষণ ওকে এভাবে গেঁওর ডাল ধরে ঝুলে থাকতে হবে। সেদিকে নজর পড়ে গিয়েছিল সোনামনির। আর নজর পড়তেই রূপচাঁদের হাত ধরে টান দিল সে।

দুজনই উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে শেয়ালটার দিকে এগোয়। কাছে যেতেই খেঁকশিয়ালটা ওদের দিকে খুব করুণ দৃষ্টিতে তাকায়। খেঁকশিয়াল মানুষের সাড়া পেলেই পালায়। কিন্তু আজ ওর পালাবার উপায় নেই। এমনকি নড়বারও জো নেই। নড়লেই পা ফস্কে জলে পড়ে যাবে। আর অনেক সময় থেকেই সে আটকা পড়ে এই অসহায় অবস্থায় আছে। হয়ত চৌকায় নেমেছিল কাঁকড়া ধরতে। আর উঠতে পারে নি।

খেঁকশেয়ালটাকে দেখে রূপচাঁদের মাথায় খুন চাপল। সূর্যবেড়িয়ার ঝোপঝাড়ে জঙ্গলে অনেক শেয়াল বাস করে। কিন্তু এই মুহূর্তে রূপচাঁদের মনে হল শেয়ালটা তার খুব চেনা। এটাই দিন দশেক আগে রূপের সেরা সাড়াটা নিয়ে পালিয়েছে। রূপচাঁদ টের পেয়ে অনেকদূর পর্যন্ত তাড়া করেছিল কিন্তু ধরতে পারে নি, অল্পের জন্য বর্শাটা গাঁথে নি। সেদিন বাছাধন জোর বরাত করে পালিয়ে বেঁচেছে। রূপচাঁদ একলাফে হাতের কোদালটা নিয়ে খেঁকশিয়ালটার মাথায় বসাতে গেল। কিন্তু সোনামনি রুখে দাঁড়ায়। রূপচাঁদ নিরস্ত হয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কাহে!

খেঁকশেয়ালটার চোখদুটো তখন আরও ছোট হয়ে এসেছে। নবমীর আলো শেয়ালটার মুখে চোখে একটা বেদনার ছায়া ফেলেছে। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে এভাবে অসহায় অবস্থায় অনেকক্ষণ থেকে ওর চোখের কোণায় জল জমেছিল। রূপচাঁদের উদ্ধত ভংগীতে সে জলের কণা চোখের কোণ থেকে ঝরে পড়ল। শেয়ালটার তরুণ বয়স। এখনও মুখখানা কচি কচি ঠেকে। জ্যোৎস্নায় সে মুখখানা সোনামনির মনে ব্যথা দিচ্ছে। সোনামনির মনে হল শেয়ালটা তার পীতাভ ছোট চোখদুটি দিয়ে ওদের কাছে মিনতি করছে। ভাটায় নদী সরে যাবে। তখন ও ঘরে যাবে। ওকে ঘরে ফিরতে অনুমতি দেওয়া হোক। সেখানে ওর পরিবার থাকে। পরিবার দুটো ছানা নিয়ে ওর অপেক্ষাতেই জেগে আছে।

সোনামনি আর রূপচাঁদ শেয়ালটাকে মুক্তি দিয়ে চলে এল। ওদের উপস্থিতি শেয়ালটাকে আতঙ্কে মিশিয়ে দিয়েছে।

রূপচাঁদ জীবনে এই প্রথম শিকার করতে গিয়ে কারও নিষেধ শুনল। সে শিকারে কোন পিছটান মানে না। সেই কথাটাই বলছে রূপচাঁদ। বলার ভেতর একটা মধুর নেশা পেয়ে বসেছে। সোনামনির বুকটা জোরে ওঠানামা করে। রূপচাদকে সে বাঁধতে পড়েছে এই আনন্দে। আর রূপচাঁদও সেই কথা স্বীকার করল।

ওরা পূবে এসে পাঠানখালির ধারে পাশাপাশি বসল। এদিকটা একেবারে ফাঁকা। কোন বসতি নেই। রাক্ষসবন্দি ঘাটের ঝমুর ধাইয়ের কুঁড়েটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। চৌকার বুকে কুমীরের পিঠের মত চাকাচাকা দাগ জেগেছে। ভিজে মাটিতে আঁকাবাঁকা দাগগুলো কেমন অপরূপ।

কয়েকটা লাল কাঁকড়া বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। এমন মাতাল রাত্রিতে ওরা গর্তে থাকে না। ওরা ঘুরে ফিরে বেড়াবে। সারা শরীর জুড়াবে জ্যোৎস্নায়। হেঁতাল আর বনঝাউয়ের পাশে লঘু ঠ্যাঙে ওরা জ্যোৎস্না পোহাবে মন ভরে। সোনামনি আর রূপচাঁদ লাল কাঁকড়াগুলো তন্ময় হয়ে দেখছিল। জ্যোৎস্নায় লাল কাঁকড়ার গা কেমন সুন্দর দেখায়।

সুন্দর লাগছিল সোনামনিকেও। জ্যোৎস্নায় ওর দীঘল কালো চোখ চক চক করছে। ওর রুক্ষ খয়েরী চুল হাওয়ায় উড়ছে। অনেকদিন রূপচাঁদ

লুকিয়ে লুকিয়ে সোনামনিকে দেখেছে। যখন সোনামনি দুহাত তুলে খোপার কাঁটা শিথিল করেছে কিংবা উপুড় হয়ে শাপলা-শালুক তুলতে ব্যস্ত। এই আড়ালে আবডালে লুকিয়ে দেখতে দেখতে কবে ওর চোখে রঙ ধরেছে। সোনামনির একটা হাত নিয়ে এসে সে নিজের হাতের চেটোতে ঘষল। দুজনার চোখাচোখি হল। রূপচাঁদের চোখে চোখ পড়তেই সোনামনি উঠে দাঁড়িয়ে মারল ছুট। এত আচমকা যে রূপচাঁদ এমনটা ঠাওর করতে পারে নি।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে হেঁতালের ঝোপের আলোছায়ায় একটা বিলাসী পুরুষ কাঁকড়া আরেক স্ত্রী-কাঁকড়াকে ঠ্যাঙ তুলে ইশারা করছে।

রূপচাঁদ তেমনি বসে। সোনামনি এক ছুটে ঘরে এসে পৌঁছল। কালুয়াটা ডাক ছাড়তে গিয়ে ওকে দেখে থেমে গেছে। সারা সন্ধ্যার পরিশ্রম আর ক্লান্তির পর পিতাজী আর চরণ ঘুমিয়ে পড়েছে। পা টিপে টিপে সোনামনি এসে চরণের পাশে শুয়ে পড়ে। অন্ধকারে রূপচাঁদের কথা ভেবে সঙ্কোচে কুঁকড়ে যায়। এই সঙ্কোচ প্রথম যৌবনের।

সেদিন অনেক রাত্রে ঘরে ফিরেছিল রূপচাঁদ; ফেরার পথে শেয়ালটাকে মেরে।

॥ আট ॥

দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার মাঠে মাঠে হাঁটু জল জমেছে। শ্রাবণের জল। ডিঙ্গালঘেরির সর্দার পল্লীর মেয়ে মরদেরা দিন কয়েক পর দল বেঁধে মাঠের কাজে নামল। রোজ ঠিক হয়ে গেছে। মরদরা পাবে টাকাভর আর মেয়েরা বারো আনা করে। রাঘব ডিঙ্গালের জমিতে এল অনেকে। কেউ কেউ জানাঘেরিতে নীলকণ্ঠ জানার জমিতে গেল। শুকরাম সর্দার, সোনামনি, বুধুরা এল রতিকান্তের পেছন পেছন। পরানরা, নস্করেরা গেল জানাঘেরিতে। নিবারণ আর তার বেটা রূপচাঁদ থাকল তাদের এক বিঘে জমি নিয়ে। সর্দার পল্লীতে ওদেরই শুধু এখনও এক বিঘে জমি রয়ে গেছে। আর দুটো বলদ। একটা ভৈস। বলদ দুটো হাল চষে।

হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়ে মরদেরা ধানের কচি হিল হিলে চারাগুলো জমিতে পুঁতছে। রতিকান্ত আলের ওপর দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। মাঝে মাঝে হাঁকডাক ছাড়ছে। এক ফসলা জমি ; ধান যদি মারা যায় সমস্ত সূর্যবেড়িয়াতে নামবে কালো ছায়া। তার থেকে কারও রেহাই নেই। এরকম অন্ধকার অনেকবার সূর্যবেড়িয়াতে নেমেছে। ফসল তখন ফুটাফাটা হয়ে গেছে। ধানের বুকে দুধ দেখা না দিতেই পোকা লেগেছে। এসব হেরফেরের কথা, জমানার হেরফের।

এখন থেকেই ওরা যেন কচি টিনটিনে ধানের চারাগুলোর শিষ দেখতে পাচ্ছে। এই দেখায় আনন্দ আছে, ফুর্তি আছে। হাড়িয়া খেলে যেমন চোখটা লাল হয়, ধানের শীষের কল্পনায় তেমন একটা আমেজ। মাঠে খানিকটা জল জমতে না জমতেই ধানের চারাগুলি যত্নে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। দেখতে হবে প্রতিদিন। নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। মাঠের কাজে দরদ থাকা দরকার, হুঁশ রাখার দরকার। তা সে নিজের বা পরের জমি যাই-ই হোক না কেন।

সোনামনি আর চাচা শুকরামের বউ জবা হাত চালিয়ে চারাগাছ পুঁতছে। ওদের পাশে সুন্দরীবালা দাসী হাত চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে দুই একটা কথা বলছে। এদিকে রতিকান্ত নেই; অন্য কোথাওবা। সুন্দরীবালা খোশগল্প চালাবার চেষ্টা করে। —কিরে পেট নিয়ে মাঠে এলি। এই কটা দিন না এলেই তো হত। সম্বোধনটা জবাকে। সে আর কদিন পর বিয়োবে। এক সময় ফিক করে হেসে সুন্দরী রসিকতা করে—প্রাণভরে মরদটা আসতে দিল। সুন্দরীবালাও ক্ষেত মজুরী করে। তাছাড়া বাবুদের বাড়িতে ঝি খাটে। বিলে বাদায় সোনামনি জবাদের সাথেই শাপলা-শালুক খুঁড়ে বেড়ায়; কিন্তু বিয়োবার সময় কাহিল হয়ে পড়ে। তখন আর সমবছরের মত গতর খাটাতে পারে না। সুন্দরীবালার দশটা ছেলেমেয়ে। বড়গুলো খুটে খায়, গতর খাটিয়ে খায়। ছোটগুলো ঘুরেটুরে।

জবা শুধু ঘাড়টা দোলায়, কথা না বলে ভংগীতে জানায় আরেকটা প্রাণী আসছে, এখন গতর থামালে কি চলে। যেমন বিয়োতে হবে তেমন মদদ দিতে হবে। দুই-ই চাই।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি বন্ধ হয় আবার একটা দমকা বাতাসের সাথে নেমে আসে। ক্ষণে আসা ক্ষণে যাওয়া। শ্রাবণের মাঠের কাজ ভিজে ভিজেই করতে হয়। সোনামনির মুখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ভিজে চুলে টুপটাপ করে জল চোয়াচ্ছে। ভিজে শাড়িটা ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ের সাথে লেপ্টে থাকে। তখন জাড় ধরে। চারাগাছগুলো পুঁতে দিতে দিতে সে ভাবে চরণটা হয়ত এখন দাওয়ায় পা ছাড়িয়ে বসে অথবা হেঁতালের ঝোপের পাশে বাবলাগাছের তলায় একা একা বসে বৃষ্টিতে ভিজছে, দুধসাদা ফাতনাটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মুনিয়াটা গই-বাক্সের ধারে হয়ত কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কালুয়াটা হয়ত ঘরে পিতাজীর পাশে বসে লেজ নাড়ছে। আজ চরণ মাথায় করে তার জন্য ভিজে ভাত নিয়ে আসবে গামছায় বেঁধে। সেরকমই কথা আছে। তখন কাজের অবসরে ভিজে ভাত খেতে খেতে দুটো কথা হবে। চরণও ওদের সাথে বসে দুটো খাবে। আরও অনেকে ভিজে ভাত নিয়ে আসবে। নিবারণ মাঠে এলে রূপচাঁদও হয়ত চরণের

মতই রোজ ভিজে ভাত নিয়ে আসত। রূপচাঁদের কথাটা আপনা থেকেই মনে হয়ে গেল সোনামনির। আজকাল এমনতর হয়। রূপচাঁদ হয়ত ওর জমির আলে বসে বসে চালভাজা আর জীরামরিচ চিবাচ্ছে। আর ধানের হিলহিলে চারাগুলো দেখছে। কেমন সেগুলো হাওয়ায় দুলছে। বৃষ্টির আর বাতাসের ঝাপটায় একটা আরেকটার গায়ে গিয়ে পড়ছে। দেখছে আর খুশী হচ্ছে। এই চারাই বড় হবে। তাতে ফল হবে। সে ফল শক্ত হবে। তাতে দুধ দেখা যাবে। একদিন সোনায় রঙ লাগবে তার গায়। তারপর কমলা হবে। গন্ধ ছড়াবে। বুকের ঘামের পালিশে সে হাসি ঝিলিক খাবে। সোনামনিকে পাশ দিয়ে যেতে দেখলে আঙুল দিয়ে তার জমির ধান দেখাবে। পাকা ধানের মৌতাতে তখন সূর্যবেড়িয়া বিভোর।

এরকম কতশত ভাবে সোনামনি কাজ করতে করতে। একসময় মনে হয় মাইজী বলত সে বড় হলে কাজে লাগবে। তখন বারো আনা বারো আনা—এক রূপেয়া আর আধুলি। তার আর মাইজীর রোজ। আজ সে বড় হয়ে মাঠে লেগেছে। কিন্তু মাইজী নেই। সেই যে অঘ্রাণের রাতে হারিয়ে গেল আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কেউ বলে নদীতে ডুবেছে, কেউ বলে সুন্দরী খালের মীন পেতনীর কাজ। হয়ত ঘাড় মচকিয়ে ডুবিয়ে মেরেছে। পিতাজী কোন কথা বলে না, জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকে। সোনামনি তখন ছোট। তাই পাঁচজনার কথাতেই বিশ্বাস করতে হয়। নিজে থেকে কিছু ভাবতে পারে না। শুধু মাঝে মাঝে অবাক হয়। কেমন করে একটা মেয়েমানুষ চিরদিনের মত হারিয়ে যেতে পারে।

॥ নয় ॥

কথায় দিস না কাঠি। ঝড়বাদলে আটিসাটি। হাড়িয়ায় মন মজাবি। কাজিয়ায় কাজ কি তোর। উড়কি মনে মুড়কি বাৎ ছড়াতে পারিস ভলি।

এখন শ্রাবণের শেষ; বৈরাগী খ্যাপা বৃষ্টিটা একটু থেমেছে। মেজাজী ভাবটা এখন একটু ঢিলে ঢালা। সূর্যবেড়িয়ার বেসরম শ্রাবণ এখন পালাই পালাই। জলের বুকে ধানের গুচ্ছ এখন সতেজভাবে মাথা নাড়ে। মাটির গভীরে ওরা শিকড় চালিয়েছে। কচি-কাঁচা ভাবটা যেন এতদিনে গেল।

ভোরের দোয়েলটা শিস দেয়। বাবলা বনের আড়কাঠে লেজ দুলিয়ে নাচে। দ্বারিক সর্দার দাওয়ায় বসে দোয়েলটার নাচ দেখছে। আসলে সে ওদিকে তাকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু কিছুই দেখছে না। ওর মনটা কেমন ঘোলা-ঘোলা। সোনামনি দুদিন মাঠে কামাই করেছে। দ্বারিকও বর্ষা বাদলের দিনে সারাদিনে মাত্র বার আনা পয়সা কামিয়েছে। ঘরে চাল আসে নি। কাল সন্ধ্যায় চরণটা আবার কাঁদছিল। সোনামনির সেই ঠাণ্ডা চাহনি। যেন পিতাজীর এই সমস্ত কাণ্ড-কারখানাকে তিরস্কার করছে। কাল সন্ধ্যায় দোস্ত শুকরাম এসেছিল দ্বারিকের দাওয়ায়। চরণ আর সোনামনির দিকে তাকিয়ে দ্বারিককে বলেছে বুঢ়া গো, বুঢ়া নসীব। ছোঃ। দোস্ত যে কথা বলেছে মেয়ে সোনামনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সেই কথাই নীরবে জানিয়েছে। জলে উঠেছিল দ্বারিক দোস্তর বেমানান কথা শুনে। ইজ্জতের কথা কেইবা শোনাতে পারে। আর খেয়াল খুশির কথা মর্জির কথা। কয়েকবছর থেকেই দ্বারিক মাঠে যাওয়া বন্ধ করেছে। কিন্তু এ নিয়ে পাঁচজনের সাথে জটলা করে তাদের সে নিষেধ করে নি, এমনকি দোস্তকেও না। তাহলে

শুকরাম সর্দারইবা এরকম কথা বলেছে কেন। ইংগিতটা যেন মাঠে যাবার দিকেই। দ্বারিক মনে মনে বিরক্ত হলেও কোন কথা বলল না। কথায় কাঠি দেবে না। কাজিয়াটা এড়িয়ে গেল। হয়ত দোস্ত সোনামনি আর চরণের মুখ দেখেই বেসামাল হয়েছে। একসময় শুকরাম নসীবের কথা তুলেছিল। ওর বউটার মাঠেই বাচ্চা হয়েছে। শুকরামের ধারণা বাচ্চাটা এবারে শ্রাবণের জল সঙ্গে নিয়ে এসেছে। নসীব এবার ভালই খুলবে।

ভোরের হাওয়ায় বসে দোস্তের নসীবের কথাটা মনে হল দ্বারিকের। কথাটা যেন আস্তে আস্তে সমস্ত জকের বুকে বৃত্ত রেখার মত ছড়াতে লাগল। নসীবের হাজার ঠ্যাং, শুকরাম জানে না; বড় বুদ্ধু। দ্বারিক একটা বিড়ি ধরায়। ভোরের দোয়েলটা গান গায়। চক্কোরী নাচ নাচে লেজ উঁচু করে। দ্বারিক সর্দারও ইজ্জতের লেজ উঁচিয়ে তুড়ি মেরে দরিয়ায় নৌকা ভাসাবে। নসীবের পালে হাওয়া লাগলে আপনা থেকে তখন লাগবে। শাপলা-শালুকের বদলে ঘরে রোজ চাল আসবে। সোনামনি পরবে ডোরাকাটা শিমুল শাড়ি। চরণটা নতুন পিরান পরে লাফাবে। নসীবের জোয়ার তখন।

জুতোর একটা ভারী আওয়াজ শোনা গেল। তার সাথে প্রচণ্ড গলার আওয়াজ। কপালের রেখাগুলো কুঁকড়ে একখানে হল দ্বারিক সর্দারের, ঘাড়টা সোজা হল। আর সে অবাক হয়ে দেখল তার নাম ধরে ডাকছে সাতজেলিয়ার অনন্তলাল।

বছর চারেক আগে সাতজেলিয়ার অনন্তলাল হাতে পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে কাঁচা চামড়ার জুতোর শব্দ জাগিয়ে তাকে ডাকছে—এঁ্যা দ্বারিক ভাইয়া। চার বছর আগের সেই প্রথম দিনটির ডাক। দ্বারিকের কেমন যেন সব ভুল হয়ে গেল। সে দেখছে অথচ বিশ্বাস করতে পারছে না সাতজেলিয়ার অনন্তলাল তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ভাইয়া বলে ডাকছে। মরিচঝাপির কালো জঙ্গলে এই লোকটাই দ্বারিকের বাহুপাশ থেকে কোনরকমে পিছলে গিয়ে বেঁচেছিল। ভাল করে নজর করলে এখনও অনন্তলালের গলায় দ্বারিকের দশটা আঙুলের কালো দাগ দেখতে পাওয়া যাবে।

কদবেলগাছটার একটু ডাইনে একটা ব্রহ্মদৈত্য বাস করে। সুন্দরী খালে আছে মীন পেতনী। লাল লাল খপীশ চোখ তার। ঘোর দুপুর রাতে জলে ভেসে ওঠে ভুস করে। এসব বিশ্বাস করে দ্বারিক সর্দার। এ বিশ্বাসে কোন ফাঁক নেই। ঠিক সেই রকমই এক বিশ্বাসে তার যেন হঠাৎ মনে হল নৌকাটা দ্বারিকের ফুটো হয়ে গেছে। মহাজনকে বললে সারায় না—সেই নৌকার ফুটো দিয়েই যেন উঠে এল সাতজেলিয়ার অনন্তলাল যখন দ্বারিক নসীবের কথা বসে বসে ভাবছে।

দ্বারিক আবার দেখল, ভাল করে দেখল অনন্তলাল সামনে দাঁড়িয়ে। চোখে চার বছর আগের সেই ইসারা। গলায় সেই সুর। যেন সে ভুলেই গেছে মরিচঝাঁপির অন্ধকার রাতটার কথা। সে রাতে সারা বনে বান ডেকেছিল।

মরিচঝাঁপি থেকে ডাক এল। ফরমাস নিয়ে এসেছে অনন্তলাল। দ্বারিক বেশ জানে অনন্তলাল একা ফিরবে না। ঘাড়ের গামছাটা মাটিতে পেতে ইতিমধ্যেই দাওয়ার এককোণে বসেছে অনন্তলাল। পকেট থেকে ডিব্বা বের করেছে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের চেটোতে খৈনী টিপতে টিপতে সে কথাটা আরম্ভ করবে এমন ভাবখানা। দ্বারিক জানে অনন্তলাল কি বলবে। মরিচঝাঁপির অন্ধকারে ডেরা বসে ব্যাপারীদের। হরেক মালের ব্যাপারী। পাকিস্তানের মাল রাতারাতি চলে আসে সীমানা পেরিয়ে হিন্দুস্থানের মরিচঝাঁপির জঙ্গলে। সেখানে ব্যাপারীরা জড়ো হয়। লেনদেন হয় মালপত্রের, টাকা পয়সার। হিন্দুস্থানের জিনিস জলপথে পাকিস্থানে পৌঁছায়। ও সীমানায় ওরা অপেক্ষা করে থাকে; এ সীমানায় হিন্দুস্থানের লোকেরা। দুই দরিয়ার জল-পুলিশ ঘুরে ঘুরে শুধু ক্লান্ত হয়; আর মাঝে মাঝে পকেট ভারী করে খুশী। এ সমস্ত জেনেছে দ্বারিক গত সফরে! এই কারবারের নৌকায় ওস্তাদ মাঝির দরকার হয়। তাছাড়া কালো জঙ্গলে দিনরাত্রি কাটে। সেখানে আছে বাঘ। কথায় বলে সুন্দরবনের বড় শেয়াল। তাছাড়া আছে ময়াল, অজগর আর বুনো শুয়োর। এর জন্য গুণীনের দরকার। যে ঝাড়ফুঁক জানে। গাল দিয়ে বড় শেয়াল তাড়াতে পারে। তুড়ি মেরে কুমীরের পিঠে চড়ে নদী পার হতে পারে। কামোট আসলে আগে থেকেই টের

পায়। এমন লোক দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায় দ্বারিকই বটে। চার বছর আগে হালের মাঝি হয়ে সে তল্লাট জুড়ে নাম কিনেছে। ব্যাপারীরা তাকে ভাল করে চেনে, জানে। তাই আবার এসেছে অনন্তলাল। সঙ্গে আছে দাদনের টাকা করকরে।

খৈনীটা মুখে ফেলে হাতটা ঝেড়ে অনন্তলাল জাঁকিয়ে বসে। এই জাঁকিয়ে বসার অর্থ জানে দ্বারিক। অনন্তলাল লাঠির মাথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তারপর একসময় আরম্ভ করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে। ভংগীটা এমন যেন সে তৈরী আছে; দ্বারিককে শুধু সম্মতি দিতে হবে। তাহলে রূপেয়া মিলবে, ভাত জুটবে। সুখের মুখ দেখবে ওরা সবাই। সোনামনি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। ওর কাছে লোকটাকে চেনা চেনা মনে হয়। কিন্তু ঠিক চিনতে পারে না। বছর চারেক আগে এসেছিল অনন্তলাল। তখন সোনামনি নেহাতই ছোট। দ্বারিক একবার সোনামনির দিকে তাকায়, চরণকে খোঁজে। সে বাড়ি নেই তাই ওকে দেখতে না পেয়ে দূরে শ্রাবণের জলে চিকচিকে সবুজ সতেজ ধানগাছের ওপর দৃষ্টি মেলে। শুক্রমনির কথা মনে হয় একবার। মনটা হু-হু করে ওঠে। আবার মরিচঝাঁপির অন্ধকার দুনিয়ায় হালের মাঝি হবে এ চিন্তায় মনটা কেমন নেতিয়ে আসে। গত সফরের স্মৃতি তার কাছে সুখপ্রদ নয়। অথচ খেয়াপারের নৌকায় ভল ওঠে। মহাজন বলে কাজ চালিয়ে নিতে। জল ছেঁচে ছেঁচে নৌকায় যাত্রী পারাপার করা এক বিড়ম্বনা। মাঠেও সে যাবে না। কিন্তু অনন্তলালের ইশারায় নিশ্চিত কতগুলো রূপেয়া। সে শুধু একবার হাঁ জীর অপেক্ষায় আছে।

—বহুৎ দিন নিবে।—দ্বারিক জিজ্ঞাসা করে। নেহি, একমাস, ব্যাস, ফির ঘরে চলে আসবি। অনন্তলাল অভয় দেয়। পকেটে তার আঙ্গুলগুলো নড়েচড়ে ওঠে। দ্বারিক প্রস্তুত থাকলে সে প্রস্তুত।

দ্বারিক আরেকবার ভাবনায় ডুব দেয়।

তুই জমিনকে ভালবাসিস। জমিনকে লাঙল চালিয়ে সরস করতে হবে। ঢেলাগুলো সমান করতে হবে। আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। মেহনতে জমি তোর আপনার হবে। তুই জীবনকে ভালবাসিস;

বহুত আচ্ছা। এ যেন তোর পানিকে ভালবাসা। পানিকে যেমন চাইবি, যে কোন পাত্রে ঢালবি দেখবি তেমনটি পেয়েছিস। কিন্তু তোর কটা ঘটি বাটি আছে! জমিতে তোর মন মজে না, তুই ছুটিস দরিয়ায়; ভাসাস নৌকা। কিন্তু সারাদিনে এক রূপেয়াও জোটে না তোর। তাই আসে অনন্তলালেরা; সাতজেলিয়ার আমলাবেতীর চোরা কারবারের ফোড়ে ফিঙ্গের দল। ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বসে থাকে তোর সামনে। তুই ভাবতে ভাবতে মরিস। শেষে সম্মতি দিস। অনন্তলাল আবার তামাক পাতা গুঁড়ো করে মহা আনন্দে মুখে ফেলে, তারপর চেটে চেটে একদলার থুতুর সাথে গলায় অনুভব করে জিত তারই হয়।

বিকেলে দ্বারিক অনন্তলালের সাথে জাহাজে উঠল। নৌকাটা সে মহাজনকে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে। আসার সময় সোনামনির হাতে কয়েকটা রূপেয়া দিয়ে এসেছে; বলেছে একমাস পর ফিরবে। সফর শেষ করে। দেরি করবে না। সোনামনি কোন কথা শুধায় নি। হাত পেতে টাকা নিয়েছে। চরণ জিজ্ঞাসা করেছে পাঁচরকম প্রশ্ন। পরিবর্তে দ্বারিক বলেছে আসার সময় ডোরাকাটা লাল শাড়ি, হলুদ সবুজ পাটল ছিটের মিহি পুঁতির মালা, চরণের পিরান সঙ্গে আনবে। সময় করে একবার গিয়েছিল ঝুমুরবিবির কাছে সফরের কথা বলতে। ভেবেছিল ঝুমুর বাধা দেবে। তখন অনর্থ হবে। কিন্তু ঝুমুর তা দেয় নি; হয়ত ভরসা পায় নি। হালচালের কথা সবারই জানা আছে; তবুও হাতে দুটো নগদ রূপেয়া এলে কোন রকমে চলে। দোস্ত শুকরাম এসেছে গোসাবা পর্যন্ত। কলের জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত দোস্ত দাঁড়িয়েছিল। জাহাজে ওঠার সময় দ্বারিক দোস্তের দুটো হাত ধরে চরণ আর সোনামনির ওপর একটু নজর রাখতে বলেছে। শুকরাম সর্দার দুবার ঘাড় নেড়েছে। দ্বারিক না বললেও সে সেটা রাখবে। খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে দ্বারিক জাহাজে উঠেছে।

বিকেলের তির্যক আলো তখন বিদ্যাধরীর জলে ছুঁই ছুঁই হয়ে এক অপরূপ রঙ্গে রঙিন। সাতজেলিয়ার কলের জাহাজ জল কাটছে। প্রপেলার বিক্ষুব্ধ জল তরঙ্গকে পেছনে ফেলে সেটা এগিয়ে চলে।

বাঁকা স্রোতের ঘূর্ণি হুটোপুটি খেতে নদীর বিস্তৃত জল রেখায় মিলিয়ে যায়।

পাটাতনের ওপর অনন্তলালের পাশে দ্বারিক বসেছে। পাটাতনেও ভিড় মন্দ হয় নি। তাছাড়া আর আর যাত্রী আছে নীচে। জীবনে এই চতুর্থবার দ্বারিক কলের জাহাজে চাপলো। সব কিছুতেই কেমন অপরিচিত নতুন গন্ধ। পাটাতনের কিনারায় বসে কতগুলো লোক হাঁড়ির জলে হাত ডুবিয়ে একটা কৃত্রিম স্রোত তৈরী করছে। ওরা জেলে মাছ ধরেছে। হাঁড়িতে ঐ মাছ। হাতের সাহায্যে হাঁড়ির জলে তরঙ্গ সৃষ্টি করে চুনো মাছগুলোকে কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে! দ্বারিক বসে বসে তাই দেখে। লোকগুলোর ভেতর মাছ নিয়ে কথা হচ্ছে। বর্ষাকালের নোনা নদীতে, খালবিলে মাছের মরশুমের কথা। বাজারদরের কথা। ফোড়েদের বদ মতলবের কথা। কিন্তু হাত থামে নি। সমানে চলেছে। ওদের পাশে একটা লোক ঠেস দিয়ে বসে হাঁ করে ঘুমুচ্ছে। জাহাজের ঝাঁকুনিতে একরকম ঘুম আসে। তার সামনে ঝাঁকায় অনেক মাটির হাঁড়ি কলসী কুজো, প্রদীপ আর পিলসুজ। লোকটাকে গোসাবার হাটে দেখেছে দ্বারিক। সারা মুখে কেমন ঘামের ছোপ! বিক্রি-বাট্টা হয়ত ভাল হয় নি। সংগের মাল সংগে হয়ত ফিরে চলেছে। এ কথাটাই ভাবতে ভাবতে জাহাজের ঝাঁকুনি আর চিন্তার পীড়নে লোকটা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই মুখটা হাঁ করে আছে। মাঝে মাঝে বন্ধ হয় আবার অদ্ভুত শব্দ করে খুলে যায়। দ্বারিকেরও ঘুম আসছে। ঘুমলে তার ঠোঁট দুটো হয়ত ওরকম হাঁ হয়ে থাকবে। তখন কেমন ভ্যাবলা ঠেকবে। কেমন ক্লান্ত, বিষণ্ণ, পোড়-খাওয়া। সারাদিন মেহনতের পরও কোন কোনদিন গড়খাইএর টলটলে জলে নিজের মুখটা দেখেছে তখন এরকমই মনে হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীতে কয়েকজন বাবু লোক বসে খোশগল্প করছে। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া বেশী; ওখানে সুন্দরবনের বাবুমশায়রা বসেন। দ্বারিক তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের দেখল। কিন্তু একজন বাবুর সাথে আরেকজন বাবুর চেহারা ওর কাছে আলাদা ঠেকে না। সব বাবুকেই যেন এরকম মনে হয়। ব্যাপারটা তার কাছে ভারী আশ্চর্যবোধ হয়। সূর্যবেড়িয়ার

বাবু, গোসাবার বাবু আর এই কলের জাহাজের প্রথম শ্রেণীর বাবু-গুলো সবাই তার কাছে একই রকম! কোন ফারাক নেই; না চেহারায় না কথাবার্তায়। ওরা যেন খুব উত্তেজিত ভাবে কি নিয়ে কথা বলছে। ওরা যখন আলাপ আলোচনা করে তখন ওদের খুব উত্তেজিত মনে হয় দ্বারিকের। প্রথমশ্রেণীর কামরার সামনে জাহাজের সারেঙ সাহেব জাহাজ চালাচ্ছে। ওর মুখে সিগারেট, স্টিয়ারিং-এ এক হাত রেখে পাশের লোকের সাথে কথা বলছে। দ্বারিক লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। সিগারেটের লাল আলোয় যতটা পারল দেখল। লোকটা কেমন অনায়াসে জাহাজ চালাতে চালাতে গালগল্প করছে পাশের লোকের সাথে; দ্বারিক দেখে দেখে অবাক হল; বিস্মিত হল। একটা লোক ঘুরে ঘুরে টিকিট দিয়ে পয়সা নিচ্ছে; মাঝে মাঝে লোকটার সাথে যাত্রীদের বচসা হচ্ছে। লোকটী দ্বারিকের সামনে এসে দাঁড়ালে অনন্তলাল দুটো টিকিট নেয়। লোকটার সাথে অনন্তলালের হাসি বিনিময় হল। দ্বারিক বুঝল লোকটা অনন্তলালকে চেনে; জানে।

বিকেলের আলো কখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অন্ধকার দিয়ে গেছে। সূর্যবেড়িয়ায় হেঁতালের ঝোপে, দ্বারিকের মুনিয়ার খুপরীতে দোস্ত শুকরামের ভৈসটার চোখে এখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে রাত্রি. নামছে। জাহাজে আলো জ্বলে উঠল। এতক্ষণ পরে দ্বারিকের হুঁশ হল সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে সমস্ত নদীর বুকে। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায় তার ছোট্ট কুঁড়ের অন্ধকার দাওয়ায় বসে সোনামনি হয়ত অন্যান্য দিনের মত আনমনে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ওর পাশে চরণ ঘুমিয়ে পড়েছে। ও নিশ্চয়ই আজ আর ভাত ভাত করে কাঁদে নি। ভরা পেটে ঘুমিয়ে আছে। ভাবতে ভাল লাগল দ্বারিকের এই কথাগুলো। কালুয়াটা .হয়ত এখনও ঘরে ফেরে নি। দোস্ত শুকরামের আজ আর গাংভেড়িতে বসে বসে বাঁশের লাঠি তৈরী হয় নি। তারচেয়ে বসে বসে সে হয়ত ভাবছে সাতজেলিয়ার কলের জাহাজ কতদূর গেল। তার দোস্ত যে সে জাহাজে! ঝুমুরবিবির কথা মনে হল দ্বারিকের। রাক্ষসবন্দী ঘাটের হোগলা ছাওয়া ছোট ঘরটায় শাঁখ হয়ত অনেক আগেই বেজেছে। সন্ধ্যাপ্রদীপও হয়ত দেরখোর ওপর লক্ষী ঠাকুরণের সামনে জ্বলছে।

আর ঝুমুর খাটিয়ায় বসে প্রদীপের আলোয় তার কথাই ভাবছে। তার মুখটা মনে করার চেষ্টা করছে। দ্বারিক জানে ওর ব্যথা অনেক। কিন্তু সব কথা সবাইকে বলার নয়। কিন্তু দ্বারিককে ও সবই বলেছে। কেন বলেছে দ্বারিক আজও বোঝে'নি। যেমন সে বোঝে না এই কলের জাহাজের অন্ধকার পাটাতনে বসে সে ঝুমুরের কথা ভাবছে কেন। বোঝে না অথচ ভাবে। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার অনেকের কথা একে একে মনে হচ্ছে। চেনা জানা মানুষের। একসময় নিবারণের কথা মনে এল তার। কিন্তু থাক, এই বিদেশযাত্রায় অন্ধকার অপরিচিতের জগতে বসে দুষমনের কথা নাই বা ভাবল সে। চিন্তাটা মন থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল দ্বারিক। কাঁঠালের ভুতির ওপর লাল বড় মাছির মত চিন্তাটা কিছুক্ষণ ভনভন শব্দ করে তাকে বিরক্ত করল, পরে একসময় মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ হুঁশিয়ারী ঘণ্টায় আর সকলের সাথে দ্বারিকও সচকিত হয়।

আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে। শেষ শ্রাবণের ভয়ঙ্কর কালো মেঘের জটলায় নদীপারের গাছগাছালি, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র, দরিয়ার সমস্ত জীব, ওপরে কলের জাহাজ, ডিঙ্গি-নৌকা, কোষা-নৌকা সব যেন ভয় পেয়ে থমকে গিয়ে এক আসন্ন ভয়াবহ সম্ভাবনায় স্থির হয়ে গেছে।

সারেঙ সাহেব দুই দুইবার হুঁশিয়ারী ঘণ্টা বাজাল। নীচে মেসিন ঘরে যে লোকটা মেসিন চালাচ্ছে তাকে জাহাজের গতি শ্লথ করবার ইশারা জানাল। অনন্তলাল দ্বারিককে বলল এবারে হয়ত নীচে নামতে হবে। সেই বিকেলে জাহাজে ওঠার পর থেকে অনন্তলালের সাথে দ্বারিকের এই প্রথম কথা। অনন্তলালই বল্ল হুঁশিয়ারী ঘণ্টা সারেঙ সাহেব দিচ্ছে। পারের দিকে জাহাজ নিয়ে যাচ্ছে সে। পারের সাথে ফারাক না রেখে জাহাজ চালাবে। ইতিমধ্যেই অনেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় বাবুরা কেমন ভয় পেয়েছে। তাঁরা সারেঙ সাহেবের সাথে কি নিয়ে যেন পরামর্শ করছে। সারেঙ সাহেব সব কথার জবাব দিচ্ছে না। মাঝে মাঝে এক একটা দমকা হাওয়া ঝাপ্টা মারছে জাহাজটার গায়ে। ঢেউয়ের মাথায় জাহাজটা তখন প্রচণ্ড দুলছে।

জাহাজের আলো ছড়িয়ে পড়েছে নদীর বুকে। অন্ধকার ঢেউ

জাহাজের আলো, পাটাতনে মানুষের ছায়া, দামাল বাতাসে প্রপেলারের বিক্ষুব্ধ শব্দ—এসবই একটা চলমান জগৎকে সৃষ্টি করে ছুটে চলেছে। পেছনে প্রপেলার মথিত জলরাশিতে মিলিয়ে যাচ্ছে জাহাজের গতিপথের তির্যক জলরেখা। অন্ধকার আলো পাশাপাশি ছুটে চলেছে জাহাজটার সাথে। আলো, অন্ধকার, বাতাসের বেগ সব মিলে মিশ্র এক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। মাতাল ঢেউয়ে কামোটেরা লুটোপুটি খাচ্ছে। মেছো কুমীরেরা গহীন জলের তলায় ছুটে চলল জাহাজটার থেকে শত যোজন দূরে—একমাইল, দুইমাইল।

জাহাজের নীচের তলায় একটা ভীতির গুঞ্জন উঠেছে। কয়েকজন মুরব্বি গোছের লোক তখন গল্প ফেঁদেছে তাদের গত জীবনের জাহাজ ডুবির স্মৃতির কথা। তারা সবাই হয়ত সত্য বলছে না, কেউবা শুনেছে কেউবা বানিয়ে বলছে ; কিন্তু সবাই মিলে তারা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

দ্বারিক আর অনন্তলাল নীচে নেমে এসে একটা জায়গা ঠিক করে নিল। সবাই গাদাগাদি করে বসেছে। একজন আর একজনের সাথে লেপ্টে গিয়ে তারা গল্প শুনছে, গল্প করছে, বাতাসের গর্জন কান পেতে শুনছে। মাঝে মাঝে সারেঙ সাহেবের হুঁশিয়ারী ঘণ্টায় সবাই নুতন করে সজাগ হচ্ছে। এখন কেউ আর জায়গা নিয়ে কলহ করছে না, বচসা করছে না, কিছুক্ষণ আগে যা হচ্ছিল। এখন তারা পরস্পরকে কাছে পেতে চাইছে, তাদের সে অসহিষ্ণু ভাবটা এখন অনেক কেটে গেছে।

দূরে নদীর বুকে একটা লাল আর সবুজ আলো ক্রমশঃই স্পষ্ট হচ্ছে। আরেকটা জাহাজ আসছে বিপরীত দিক থেকে। দুই জাহাজের সারেঙ সাহেব সঙ্কেত জানাল কে কাকে ডাইনে রাখবে। নিশানা জানাল সবুজ বাতির আলো দুলিয়ে। দুই জাহাজের মানুষেরা শুনল দুটো জাহাজের জল কাটার শব্দ। একসময় একটা আরেকটার পাশাপাশি হল। দুই জাহাজের সারেঙ সাহেবের সাথে কথাবার্ত্তা হয়। কথাবার্ত্তা হয় অন্যান্য লোকের সাথে। দুটো পাশাপাশি বিপরীতগামী জাহাজ যতটুকু সময় দেয় ততটুকু কথাবার্ত্তা ওরা বলে। নীচের তলার যাত্রীরা সে সব কথা কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু ইঞ্জিন ঘরের কান

কাটানো প্রচণ্ড শব্দে তা শোনা যায় না। দ্বারিক আর অনন্তলাল বসেছে ওপর আর নীচ তলার সিঁড়ির ঠিক মাথার কাছে। তাদের কানে দুয়েকটা কথা পৌঁছোয়।

একসময় বৃষ্টি নামল। দ্বারিক ভিজছে। ভেতরে বাইরে কোথাও সরে গিয়ে নড়ে বসবার উপায় নেই। উপায় থাকলেও হয়ত দ্বারিক অন্য কোথায়ও জায়গা খুঁজত না। বৃষ্টির জলে ভিজতে তার কেমন যেন ভাল লাগছে। বিশেষ করে মুখে চোখে জলের ছাটটা বেশ আরাম দিচ্ছে। অনন্তলাল নড়ে চড়ে বসে ; মনে হল নিরুপায় হয়ে ভিজে যাচ্ছে বলে সে বেশ বিরক্ত হয়েছে।

সার্চলাইটের তীব্র আলো বৃষ্টির ধারায় প্রতিফলিত হয়ে কেমন যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। সেই আলোয় দেখা গেল সামনে একটা ঘাট আসছে। ঘাটের ওপর কয়েকজন লোক ছাতামাথায় দাঁড়িয়ে। জাহাজের গতি আরও মন্দ হল। লোকগুলিকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। যাত্রীদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। একে জায়গা নেই তায় বৃষ্টি। ঘাট ধরাবার দরকার কি, কেউ যখন এ ঘাটে নামবে না! কিন্তু সেকথা সারেঙ সাহেব শোনে না। মালিকের নুন খায় সে। মালিকের দু'পয়সার দিকে সে নজর রাখবে বৈকী। এই নিয়ে বচসা আর কথা কাটাকাটি। ততক্ষণে জাহাজ ঘাটে ভিড়েছে। লোকগুলো ভিজে জবুথুবু হয়ে এক পা কাদা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জাহাজে উঠল। আবার ঘণ্টা বাজে। জাহাজ চলতে শুরু করে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ভাবে দ্বারিক—মরিচঝাঁপির জঙ্গলের মাঝি হবে সে। তাই ঘর ছেড়েছে। বিকেলবেলা উঠেছে কলের জাহাজে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হল যেন কত কাল আগে সে জাহাজে চেপেছে, আর অনেক অনেক দিন হল সে সূর্যবেড়িয়া ছেড়ে চলে এসেছে। জাহাজ চলেছে তো চলেছেই। অনেক সময়ধরে ঠিক একই জায়গায় বসে সে কত কথা ভাবছে, কখনও নীচের তলার খড়ের আঁটির মত পাশাপাশি মানুষগুলোর কথাবার্তা একমনে শুনছে, ভাবভংগী দেখছে আর মনে মনে কৌতুক অনুভব করছে। মাথার ওপর অবিরাম জল ঝর ঝর ঝর। এসবই কতকাল ধরে ঘটছে যেন!

নদীর বুকে জলের শব্দ, জোয়ারের শব্দ, কোথায়ও ঝুপঝাপ পার ভাঙ্গার মৃদু শব্দ—এসব কেউ শুনতে পাক আর না পাক দ্বারিক শুনতে পাচ্ছে। কলঘরের ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জন এসব মৃদু ছোট শব্দকে ঢেকে দিতে পারছে না।

ঢেউ ভাঙ্গছে; এক একটা স্রোতের উজানে তা মিলিয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। জাহাজের আলোয় দ্বারিক তাকিয়ে তাকিয়ে তা দেখল। দেখতে দেখতে তার ঘুম আসছে। একটা বিষাদ ক্লান্তিতে সমস্ত চোখের পাতায় ঘুম আসছে। সেই আধো ঘুমের ভেতর তার মনে হল আরও পথ সামনে। সেপথ দুর্গম, কুটিল, ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ। হাজার ঢেউ ভাঙ্গবে এখনও। বিদ্যাধরী-পাঠনখালি-মাতলা-বাসন্তী-পুরন্দরের ওপর দিয়ে অনেক জল বয়ে যাবে। শ্রাবণ ফিরে ফিরে আসবে। সূর্যবেড়িয়ার আকাশে হরেক রঙ লাগবে। তামাম সুন্দরবনে এখনও অনেক কালোরাত্রির আনাগোনার হিসাব নসীবের করে জমা আছে।—থাক।

এই দরিয়ার পানিতে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে কত ভাবনা ভাবতে ভাবতে দ্বারিক সর্দারের ঘুম এল'। যেহেতু অজস্র চিন্তার পর খানিকটা ঘুমের প্রয়োজন আছে।

॥ দশ ॥

ভিজে মেঘের দুপুর। গাংভেড়ির পাশে বনতুলসী ঝোপটায় এই ঘোর দুপুরে অন্ধকার নেমেছে। অনেকক্ষণ হতে আকাশে একটা প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। মেঘের বুক থেকে সে শব্দ মাটিতে নেমে আসে। কালোমাটি কাঁপে।

এই ছায়ামিষ্টি দুপুরে সোনামনি কোনদিন ঘরে থাকে না। অথচ আজ আছে। এ সময় কেমন একটা হাওয়া ওঠে অথচ বৃষ্টি হয় না। সূর্য মেঘে ডুবে গেছে; দুপুরের রোদ চুপ্‌সে মেঘের ছায়া মাটির বুকে নেমেছে। এই সময় সোনামনি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়; বাতাস দেয়, ওর ভারী মজা লাগে। অথচ বৃষ্টিতে ভেজার ভয় নেই। সোনামনি ঘরে চুপচাপ শুয়েছিল। চরণ অনেকক্ষণ আগেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। ঘরে সোনামনির মন থাকে না। কেমন নোনতা নোনতা লাগে। পিতাজী আজ সাতদিন হল সফরে বেরিয়েছে। আর ক'দিন বাকী—কথাটা ভাবল সোনামনি। এক মাসের আর ক'দিন বাকী আছে মনে মনে গোনার চেষ্টা করে সে; অনেক কষ্টে হিসাবটা মিলায়। আরও অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। পিতাজীর সফরের কথা মনে হতেই সোনামনির মনে হল চাচা শুকরামের কথা। চাচা পিতাজীকে বলেছিল—বুরা গো, বুরা নসীব। কথাটা শুনে পিতাজীর মুখটা কেমন চুপ্‌সে গিয়েছিল; কিন্তু পিতাজী কোন উত্তর দেয় নি। কথা বাড়ায় নি। পিতাজী হয়ত সে জন্যই সফরে গেল। সে দিন এ মাটি ছেড়ে অন্য কোথায়ও চলে যাবার কথা পিতাজীকে না বলাই ঠিক ছিল—মনে হল সোনামনির। আর মনে মনে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হল। তাছাড়া চরণের ভাত-ভাত চীৎকার পিতাজী সহ্য করতে পারে না। পিতাজীকে তখন কেমন বিমর্ষ মনে হয়। দুই-

হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে থাকে পিতাজী। আর এ সমস্ত কিছু হয়ত পিতাজীকে মরিচঝাপির অন্ধকারের দিকে নিয়ে গেছে। ঘর ছাড়ার আগে পিতাজীর মুখটা একবার মনে করার চেষ্টা করে সোনামনি। ঠিক সময়ে পিতাজী না এলে, কবুলের বাৎ টিলে হলে—ভাবল সোনামনি আরও কতকদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে কে জানে। বস্তুতঃ অপেক্ষার এই ভাবনাটুকু একটা মিষ্টি ব্যাপার সোনামনির কাছে। এর সাথে তার ডোরাকাটা লাল শাড়ির আর হলুদ সবুজ পাটল ছিটের মিহি পুঁতির মালার স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। তাকে আর ছেঁড়া কানি পরে ঘুরতে হবে না; লজ্জা পেতে হবে না রূপচাঁদের কাছে। রূপচাঁদ যখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অথবা আড়ালে আবডালে থেকে ওকে দেখে, তখন সোনামনির সরম লাগে। রূপচাঁদ সম্বন্ধে যে কথাগুলো ভাবে সোনামনি তার কিছু মনগড়া কিছু বা সত্যি।

একসময় সোনামনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। চাচা শুকরামের ঘরের কাছে চরণকে খোঁজে কিন্তু না দেখতে পেয়ে গাংভেড়ির পথ ধরে। গাংভেড়ি ধরে যেদিকটায় যায় সোনামনি সেদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। নদী এখানে গাংভেড়ি থেকে অনেক দূরে। গাংভেড়ির পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে হেঁতালের আর গেঁওর জঙ্গল। দুই একটা অজগর আর চন্দ্রবোড়া সেখানে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এদিকটায় লোক বসতি নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে দুই একটা কুঁড়ে ঘর দুমড়ে মুচড়ে কোন রকমে টিকে আছে। বাঁক ঘুরলেই রাক্ষসবন্দি ঘাট। সেখানে থাকে ঝুমুরধাই হোগলায় ছাওয়া ছোট একটা ঘরে। সে একা, সংসারে কেউ নেই। এদিকটায় এলে ঝুমুর ধাইয়ের সাথে সোনামনির মাঝে মাঝে দেখা হয়। দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দুই একটা কথা হয়। তাও ঝুমুর জিজ্ঞাসা করলে সোনামনি উত্তর দেয়। তার বেশী কিছু নয়। সেদিন মাঠে চাচিজীর ছেলে হল কাজ করতে করতেই। বয়স্ক মেয়েরা চাচিজীকে গামছা দিয়ে ঘিরে দাঁড়াল। খবর পেয়ে গিয়েছিল ঝুমুর ধাই। সোনামনি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিল না। কেমন যেন লজ্জা হচ্ছিল; অথচ দূরে থেকে কেমন অস্বস্তি। সেনামনিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঝুমর ধাই বলল—কাঁচাবয়সের

ছুঁড়িরা আবার এখানে কেন। বয়স হলেই সব বুঝবি। বিয়ে করার জ্বালা কত। কথাগুলো বলে পানছোপ দাঁত বের করে ঝুমুর হেসেছে। সোনামনির মুখচোখ লাল হয়ে গিয়েছিল এতগুলো মরদ-মেয়ের সামনে কথাগুলো শুনে। সেই থেকে সোনামনি এদ্দিকে আসলেই ঝুমুর ধাইকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

রক্তিল বিন্যাসে যে অহেতুক ঘটনার ইংগীত থাকে তা সবসময় বোধের বাইরে। কিন্তু তলে তলে সে বুদ্‌বুদ্‌ সবসময়েই সোচ্চার। আপনা থেকেই তার কাজ্‌ চলে। একসময় দেখা যায় তা ঘটছে ঘটাচ্ছে।

মেঘের ভিজে দুপুরে অজগর ময়ালের বিষাক্ত প্রান্তরে চলে আসা, সূর্যবেড়িয়ার সাধারণ পরিচিত পরিবেশ থেকে এই নির্জন প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া ষোড়শী সোনামনির অদ্ভুত খেয়ালেরই নমুনা দিত যদি না রূপচাঁদ ঠিক এই সময়টায় একটুকুরো দূর্বাঘাসের ওপর সোঁদালগাছের তলায় বসে বসে চকবাটা, পার্শে, নোনাচিংড়ির ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে না থাকত, রোজ রোজ ডাঙ নিয়ে চুপচাপ বসে না থাকত।

রূপচাঁদ সোঁদালের ছায়ায় বসে প্রতিদিন চকবাটার, পার্শের খেলা দেখে, ডাঙে খুট লাগলে খ্যাঁচ মারে ; একটা বেলে উঠে আসে। কেমন ঘোলাটে চোখ মাছটির। দূরে গেঁওর সারের আড়ালে সোনামনিকে আসতে দেখে ডাঙটা মাটিতে পুঁতে দেয়, বেশ শক্ত করে যাতে ডাঙসুদ্ধ ভেসে না যায়।

সোনামনি এদিক ওদিক ইতস্তত: ঘুরে একসময় সোঁদালগাছটার তলায় এসে বসে ; রূপচাঁদের ডাঙটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পাটা নড়ে হাঁটু থেকে। গাংভেড়িতে সেই পূর্ণিমা রাত্রিটার কথা মনে হয় ওর।

গাংভেড়িতে একটা গাংশালিক লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা ধরছে। একটা ছোট জীবন তারচেয়ে ছোট দু-একটা পোকামাকড়কে ঠোঁটে ধরে মুখে পুরছে লাফিয়ে লাফিয়ে। গাংশালিকের চতুর চোখ ; তার চেয়েও নিপুণ ওর ঠোঁট। ওর পাশে বন ঝাউয়ের ঝোপ থেকে একটা পায়রা এসে বসল। নীলচে রঙের মধ্যে কালো ডোরা কাটা ওর গা, পা দুটোও লালচে। চোখের চারপাশটা সাদা, ভেতরটা হলুদ বেগুনি কালোর ছোপে রাঙান। পায়রাটা একজায়গায় দাঁড়িয়ে

ঘোরে। আর গলার নরম ছোটছোট পালক মাঝে মাঝে ফুলিয়ে তোলে।

সোনামনি দেখে গাংশালিকটাকে; রূপচাঁদ দেখছে পায়রাটাকে। রূপচাঁদ দেখল সোনামনি গাংশালিকটাকে দেখছে; একসময় সোনামনির মনে হলো রূপচাঁদের মাছধরায় মন নেই; সে পায়রাটাকে তন্ময় হয়ে দেখছে। দুজনার এই দেখায় দুজনাই পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে যায়। তখন চোখাচোখি হয়। আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

আকাশে মেঘেরা অনেক প্রতিমা গড়ে—প্রতিমা ভাঙ্গে। গাংভেড়িতে শালিখটা, পায়রাটা লাফায় ঘোরে। সোঁদালের ছায়ায় রূপচাঁদ আর সোনামনি চুপচাপ বসে থাকে। মনে মনে অনেক কথা বানায়; অনেক কথা ভাঙ্গে। মনে মনে কথা বানানোয় তারা দুজনেই ওস্তাদ জহুরী; কিন্তু বুকের কথা মুখে থেকে যায়; তখন তারা হাবলা বোকা।

একটা শোল উঠেছে রূপচাঁদের বঁড়শিতে। রূপচাঁদ মাছটার কানকো ধরে সোনামনির সামনে তুলে ধরে। রূপচাঁদের মুখটা উজ্বল, চোখজোড়া খুশীতে ফুটি ফুটি। শোলটা ধরার জন্য নয়; সোনামনির চোখের সামনে ওটা তুলে ধরবার জন্য। যেন সে এতক্ষণ চুপচাপ থেকে মনে মনে এরকমই একটা সঙ্কল্প করছিল। শোলটা দেখে সোনামনিরও কেন জানি বিস্ময় জাগে।—বহুৎ বলেই কেন জানি সে থেমে যায়। হয়ত বলতে গিয়েছিল খুব ভাল, খুব মজা।

সোঁদালের কয়েকটা পাতা ওদের মাথার ওপর ঝরে পড়ে; তার সাথে বৃষ্টির জল। সকালে বৃষ্টি হয়েছে, তারই জল আটকে ছিল পাতার বুকে। এখন ঝরাপাতার সাথে ঝরে পড়ল ওদের মাথায়—গায়ে। এ জল বেশ মিষ্টি লাগে, ঝরাপাতার বাসি জল, সেই সাত সকালের জল। বেশ আমেজ ধরে জলের স্পর্শে। ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা।

নদী সরে গেছে ভাটার টানে। নাহার দিয়ে, গাংভেড়ির ফাটল দিয়ে জোয়ারের জল এসেছিল, কিছুক্ষণ খেলেছে নাহারে, চৌকায়। গড়খাইয়ের সাথে সে জল মিশেছিল। জলের সাথে এসেছে মাছের ঝাঁক, এখন নদীর জল আবার নদীতে গিয়ে মিশছে। জলের সাথে মাছের দল আবার ফিরে চলে নদীতে। দুই একটা হয়ত থেকে গেল নাহারে বা

চৌকায়। এ জল বুঝি নদীরও নয়, সমুদ্রের। জোয়ারে সমুদ্র ছড়িয়ে গেছে নদীতে ; আবার ভাটার টানে সে জল নদী ফিরিয়ে দিচ্ছে সমুদ্রকে। সমুদ্রকে ডাকে চাঁদ। সমুদ্র ছড়িয়ে পড়ে নদীতে। নদী সে ডাকে মেতে ওঠে।

ভাটায় জল সরে যাওয়ায় চরে কুমীরের পিঠের মত আঁকাবাঁকা ঘোরান চৌকান দাগ জাগছে। সে দাগ ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে। রূপচাঁদ ডাণ্ড হাতে গাংভেড়িতে উঠে এল। শোল আর বেলেটা লতায় বেঁধে ঝুলিয়ে নেয়। সাথে এল সোনামনি ; ওরা দুজনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদ্যাধরীর চরে কুমীরের পিঠের মত চক্কর দাগগুলো বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। নবমীর, পূর্ণিমার রাত্রিতে এমন দাগ ওরা দেখেছে। সেকথা দুজনারই মনে হল। নদী সরে গেলে দাগ জেগে ওঠে আবার জোয়ার এসে সে দাগ মুছে দেয়।

রূপচাঁদ আর সোনামনি গাংভেড়ি ধরে হাঁটতে শুরু করে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসছে। ওরা ঘরের দিকে চলে। সাঁঝের বেলায় রূপাচাঁদকে ঘরে থাকতে হবে ; গরু দুটোকে-ভৈসটাকে জাবনা দিতে হবে। সোনামনি খোঁজ করবে মুনিয়ার। ওটাকে তাড়িয়ে ঘরে আনবে।

দুপুরের মেঘের স্তূপ বিকেলের আকাশে ছিটিয়ে ছড়িয়ে গেছে ; নৈঋত আকাশে একটা মেদুর মেঘ আস্তে আস্তে হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে, কয়েকটা রঙিন মেঘ নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছে। রূপচাঁদ আর সোনামনির মনে তখন ভাটার বেলায় কুমীরের পিঠের মত হিজিবিজি দাগ জেগেছে। সে দাগের অন্য এক অর্থ আছে যা তারা অনুভব করে কিন্তু ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না। তখন দুজনা দুজনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। সে দৃষ্টি সরল রেখায় বিচ্ছুরিত নয়, অনেক জটিল।

যে কোন মনের ধর্মই হয়ত এই ; অথবা তাদের মন নদী !

॥ এগার ॥

হালের দিকে নৌকাটা ঘুরে গেল।

বিকেল নাগাদ মরিচঝাঁপির কালোজঙ্গলের ধারে নৌকার পাটাতনে পা ছড়িয়ে বসে দ্বারিক সাঁঝের বেলায় আকাশটাকে দেখছিল। বিকেলের লাল হলুদ সূর্য তখন সুন্দরী, অর্জ্জুন, গোল, শাল সেগুনের মাথায় দুদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত আসমান আর দরিয়ায় রঙ ঢালছে। তখন সূর্যটা রাজহাঁসের ডিমের মত।

ওদিকে সুন্দরী আর অর্জ্জুনের দুটি পাতার মাঝখানে আলো চুপসে গিয়ে চুপিসারে অন্ধকার নেমেছে। দ্বারিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অর্জ্জুনের পাতার ফাঁক দিয়ে একটা বাতাবী সবুজ আলো নদীর জলে এসে পড়েছে। যেখানটায় এসে পড়েছে নদীর জলে সেখানে অন্য রঙ ধরেছে। চোখের সামনেই বাতাবী সবুজ আলোটা ফিকে হয়ে আসছে, নদীর জলে সে রঙটাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। দুটি পাতার ফাঁকে আর কোন আলো নেই। দুটি পাতা গায়ে গায়ে লেগে পাখির বাসার মত একটা ফাঁক সৃষ্টি করেছে। তাও ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। আর কোন পাতা বা পাতার ফাঁক দ্বারিকের চোখে ধরা পড়ছে না। সেখানে এখন অনেক-গুলো পাতা মিলে মিশে আশ্চর্য মৃত্যুর মত স্থির হয়ে গেছে। দ্বারিকের চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল।

পাশের নৌকায় লণ্ঠন জ্বলে উঠেছে। দ্বারিকের নৌকায় এখনও জ্বলে নি; দ্বারিক ভুলে গেছে লণ্ঠন জ্বালাতে। যদিও সে দেখল অন্ধকার নামছে তবুও তার হুঁশ ছিল না। সে পাটাতনে পা ছড়িয়ে বসেই আছে।

এমন সময় নৌকার মুখটা ঘুরে গেল।

পাশের নৌকায় ইতিমধ্যেই হৈ চৈ শুরু হয়েছে। চেঁচামেচি উঠল।

দ্বারিক লাফ দিয়ে উঠে লগি মেরে পার থেকে নৌকা দূরে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে। আনতে আনতে হুঙ্কার ছাড়ে—শেরকা নিশানা, সামাল। অন্ধকার নদীর বাতাসে সামাল কথাটা গোঙাতে গোঙাতে ছুটে চলে।

নোনা দরিয়ার মাঝিমাল্লারা বিশ্বাস করে সুন্দরবনের বাঘ নিশানা দিয়ে আসে। আর নৌকায় গুণ করা থাকলে নৌকার মুখ আপনা থেকেই ঘুরে যায়। তখন বোঝা যায় পারে ঝোপেঝাড়ের আড়ালে কোথায়ও বাঘ আছে। পার থেকে নৌকা সরিয়ে দূরে আনতে হয়। যে কোন মুহূর্তে নৌকায় লাফিয়ে শিকার ধরতে পারে।

বেশ কিছুটা দূরে সরিয়ে এনে দুটো নৌকাই পাশাপাশি রাখা হল। সারাদিন জোয়ারে বিপরীত লগি আর হালে মাঝিরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন সন্ধ্যাবেলা দুটো ভাত ফুটিয়ে নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। আবার ওরাই শেষরাতে ভাটার মুখে নৌকা ছাড়বে। এক ভাটায় পৌঁছে যাবে এক দরিয়ার মাল আরেক দরিয়ায়।

দ্বারিকের নৌকায় দুটো লণ্ঠন জ্বালান হল। একটা দিয়ে রান্না করা হবে আরেকটা বাঁশের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হল। দুই নৌকার অন্যান্য মাঝিরা মেদিনীপুরের। দ্বারিকই এদের মধ্যে উপজাতীয় সর্দার। লোকগুলো কেমন যেন একটু তেরছা চোখে দ্বারিককে দেখে। সেটা দ্বারিক বেশ বোঝে। রান্নাবান্না ওরাই করে, দ্বারিককে করতে হয় না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর পাটাতনে বসে বসে দ্বারিক অন্ধকারে চেয়ে থাকে। নদীপারের নোনা হাওয়ায় বুক ভরে যায়। শরীরটা হাল্কা হয়।

বৃষ্টি নামল। হারাণ গাঢ়ু খেঁকশিয়ালের মত চেঁচিয়ে উঠল পালের নৌকা থেকে। আক্রোশটা বৃষ্টি দেখে। এমন ধারায় বৃষ্টি পড়তে থাকলে তার এত সাধের সফর বেহুদা যাবে। হারাণ গাঢ় দুই নৌকার মালিক। তার ভাবনা অনেক। তাই সে উত্তেজিত হয়। আর উত্তেজনার সময় গলা দিয়ে খেঁকশিয়ালের মত আওয়াজ বের হয়। স্বাভাবিক থাকলে মিহি কনকনে সুর। অনন্তলাল হারাণ গাঢ়ুর ডান হাত। হারাণ গাঢ়ুর পর তাই সবাই অনন্তলালের গলা শোনে।

এই দ্বারিক, চল জঙ্গলে যাবি।

দ্বারিক গলা ঝেড়ে সাড়া জানাল। ভোর রাত্রে আবার নৌকা ছাড়তে হবে। এখন খেয়ে দেয়ে ঘুমানোর কথা। পরিবর্তে এই বৃষ্টি ঝড় মাথায় করে কালো জঙ্গলে ঢুকতে হবে। মহাজনের মালের অবস্থা দেখতে হবে; দরকার পড়লে আরেকটা করে ত্রিপল ঢাকা দিতে হবে। দ্বারিক উঠল। টোকাটা মাথায় পরে নিল। পাটাতনের নীচ থেকে বর্শাটা তুলে নেয় ডান হাতে।

ছোট নৌকার রশি খোলা হল। তাতে উঠল দ্বারিক, অনন্তলাল, ভুতোমাঝি আর পরাণ মাঝি। দশমণি নৌকার ছইয়ের তলায় বিছানার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুয়েই হারাণ গাঢ় বলল—সাবধানে যাবি বুঝলি।

হুম্—জবাব দিল অনন্তলাল। তার হাতে দশ ব্যাটারীর টর্চ; আরেক হাতে বর্শা।

রাম, রাম এই বাদলায় কোন উল্লুক বাহির হয়—দশ ব্যাটারীর টর্চটা জ্বেলে নৌকা থেকে নামতে নামতে বলল অনন্তলাল। কথা কটিতে তার মনের বিরক্তি প্রকাশ পেল।

বৃষ্টি ঝরা মরিচঝাঁপির কালোজঙ্গলের নদীর কিনারায় রাম রাম শব্দে দ্বারিকের মন টর্চের জোরালো আলোটাকে অনুসরণ করে বনের দিকে চলে গিয়েছিল সমুদ্র ঝড় মাথায় করে ছয় বছর আগের মরিচ ঝাঁপির কালোজঙ্গলের এক রাত্রিতে।

বর্শাটা গিয়ে বিঁধল সুন্দরী গাছের গায়ে। সেই সময় বিদ্যুৎ চমকাল। খানিক কেঁপে বর্শাটা একটি প্রাচীন সুন্দরীর গায়ে আটকে রইল। সুন্দরীর গা থেকে বর্শার মুখ বেয়ে দরদর করে একটা রসের স্রোত বইল। বিদ্যুতের আলোয় স্রোতের ধারা বড় কুটিল দেখাল।

মরিচঝাঁপির কালো জঙ্গলে নেমে এসেছে নোনাঝড়ের নিশানা। এ ঝড় বঙ্গোপসাগরের দরিয়া থেকে ওঠে। তারপর সুন্দরবনের নোনাগাঙ আর কালোজঙ্গলের ওপর দিয়ে ফুঁলে ফুসে ছুটতে থাকে। এসময় সমস্ত গাছের গা বেয়ে এক ধরণের রসের স্রোত বের হয়। বর্শার মুখ থেকে নির্গত রসের ধারাটা সেই স্রোতের সাথে মিশল।

সুন্দরী গাছের আড়াল থেকে একটা মুখ উঁকি দিল। বিদ্যুৎ চমকাল।

ছুটো হরিণ ছুটে পালাচ্ছে। অন্ধকার; প্রবল বাতাসের ঝাপটায় মরমর শব্দ উঠছে গাছের ডালে।

গাছের আড়ালে আড়ালে একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে। আবার বিদ্যুৎ চমকায়। কোথায় একটা বাজ পড়ল। তার আলোয় সুন্দরী গাছের আড়ালে যে মুখটা উঁকি দিয়েছিল সেটা বিকট হাসল। একটা বর্শা ছুটল। যে লোকটা পালিয়ে যাচ্ছে তার পেছন পেছন। অর্জুন বুক পেতে নিল বর্শাটা। বর্শাটা অনেকক্ষণ ধরে কাঁপল; একসময় স্থির হয়ে থাকল অর্জুনের গায়। যার হাতের বর্শা কোনদিন পথ হারায় নি, আজ অর্জুন তাকে ব্যর্থ করল।

বর্শা গাঁথার শব্দে লোকটা পিছন ফিরে দাঁড়াল। আর পালাল না। গুটি গুটি এগিয়ে আসতে লাগল গাছের আড়ালে আড়ালে।

ওরা ভুলে গিয়েছিল ঝোপে আছে শের; সামনে ময়ুর জোনাকী চোখ নিয়ে চুপিসারে অপেক্ষায় আছে অজগর বা চন্দ্রবোড়া। ওরা ভুলে গিয়েছিল মরিচঝাঁপির কালোজঙ্গলে এখন সমুদ্র ঝড়ের বান ডেকেছে। চারটি চোখ পরস্পরকে খুঁজছে গাছের আড়ালে আবডালে। সমস্ত বনভূমি অমল ভয়ঙ্কর। তার রঙ রক্তের মত কালো; ভীষণ কালো; কুৎসিত কালো।

কালোজঙ্গল কাঁপিয়ে শোনা গেল শেরের গর্জন। শেরটা ভয় পেয়েছে অথবা গাছ চাপা পড়ে মরছে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে। আরেকটা গর্জন উঠল সেটা সাথী শেরের। সেটা কাঁদছে অদ্ভুত ঘড় ঘড় শব্দে সমস্ত বনজঙ্গল কাঁপিয়ে।

গাছের আড়ালে দুজনাই থমকে থাকল সেই গর্জনে হঠাৎই ভয় পেয়ে গিয়ে। বিদ্যুৎ চমকাল। সেই বিদ্যুৎ নিয়ে এল জল। চারটি চোখ তখন আরও ভয় পেয়ে শিউরে উঠে দেখল: তারা পরস্পরের এক হাতের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

দুজনা দুজনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দুটো পেশল হাতের নিষ্পেষণে তখন একটা কলজেতে হাঁপ উঠেছে। কিন্তু বৃষ্টির জলে পিছলে গেল হাতটা। লোকটা ছাড়া পেয়ে

পাক খেয়ে দৌড়াল। মুখ দিয়ে তখন তার ছুটী শব্দ উঠেছে। রাম! রাম!

আজ নৌকা থেকে নামতে গিয়ে অনন্তলাল সেই নামই উচ্চারণ করল।

এখন ওরা বনের ভেতর অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সামনে টর্চ জ্বালিয়ে দ্বারিক, পরে অনন্তলাল, তার পেছনে ভুতোমাঝি আর পরাণমাঝি।

গুণীণ মানুষ দ্বারিক ; তাই সকলের আগে আগে চলে।

॥ বারো ॥

একটা চালচড়া তার কামুক ঠোঁট দিয়ে বুক খুটছে ; বুকের ছোট ছোট পালকগুলো সকালের রৌদ্রে আরও ধবল দেখায়। এটার পাশে আরও দুটো চালচড়া একটা কেঁচো নিয়ে লুটোপুটি লাগিয়েছে। চরণ চলেছে তার পরিচিত জায়গাতে, গড়খাইয়ের ধারে বাবলারনের ছায়ায় হেঁতালের ঝোপটির পাশে। হাতে ডাঙ আর চুকা। চরণ থামল ; ডাঙ উঁচিয়ে চালচড়া তিনটিকে তাড়া করল। চালচড়া তিনটে উড়ে পালায়। কেঁচোটা একটা চালচড়া ঠোঁটে করে নিয়ে উড়েছে। চরণ আবার হাঁটতে শুরু করে।

পিতাজী আসতে আর দিন পাঁচ সাত দেরী আছে ; খবরটা সে জেনে নিয়েছে সোনামনির কাছে। মনটা চরণের খুশী খুশী। বুক ভরে হাওয়া খেতে ইচ্ছে যায়। হাতের চুকাটা জোরে জোরে দোলে। পিতাজী আসছে, এল বলে, আর দিন পাঁচ সাত দেরী, সঙ্গে আসছে…আর চরণ ভাবতে পারে না ; চলতে চলতে থেমে পড়ে, চোখটা বোজে, কেমন খয়েরী লাল কালো রঙ সব ভেসে ওঠে। প্রত্যেক বারই একই ব্যাপার ঘটে ; পিতাজীর আসার কথাটা বিশেষ করে ভাবতে গিয়ে।

গাংভেড়ীর পাশ দিয়ে একটা ছেলে বগলে বই শ্লেট নিয়ে প্রতিদিন ধুলো উড়িয়ে চলে যায় সুনীল মাইতিদের পাঠশালায়। রোজ ভোরবেলায় কি আশ্চর্য্য চরণের সাথে ওর দেখা হয়, কিন্তু কথা হয় না। তার হাতে বই আর শ্লেট ; চরণের হাতে ডাঙ আর চুকা। চরণ দেখল আজও ছেলেটা আসছে, মাথায় তারই সমান। তিন নম্বর ঘাটের দিকে সে যাবে তার পাঠশালায়। একদিন চরণ দেখেছিল একটা খড়ের চালাঘরে কয়েকটা ছেলে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে বিচিত্র সুরে কি সব আওড়াচ্ছে ; দেখে তার ভারী মজা লেগেছিল। সেইদিন এই ছেলেটাকে সে ওদের ভেতর

বসে থাকতে দেখেছে। পিতাজীকে হরেক প্রশ্ন করেছে সে পাঠশালার সামনে দিয়ে যেতে যেতে। চরণের প্রশ্ন শুনে দ্বারিক মুখ দিয়ে হঃ হঃ শব্দ করেছে।—হেসেছে, কোন উত্তর দেয় নি।

বাবলার ছায়ায় হেঁতালের ঝোপটার পাশে ডাণ্ড আর চুকা নামিয়ে রেখে পা ছড়িয়ে বসল চরণ; এরকম রোজ বসে। ভরা বর্ষার পর গড়খাইয়ের জল আরও গহীন আরও কালো হয়েছে। ভোরবেলার মিঠে রোদে টোপ লাগে ভাল তাই চরণ আসে ভোরবেলা। যেদিন মাঠে দিদিকে ভাতের পুঁটলি পৌঁছে দিতে হয় সেদিন একটু দেরী হয়ে যায়। মাছগুলো সেদিন টোপ খেতে চায় না। গহীন জলের তলায় নড়ে চড়ে খেলা করে বেড়ায়। চরণ বসে বসে টোপের পর টোপ বঁড়শিতে গেঁথে ফেলছে সেদিকে মাছগুলোর ভ্রূক্ষেপই থাকে না।

পিতাজী আসতে আর দিন পাঁচ সাত বাকী কথাটা আবার ভাবে চরণ, বঁড়শির মুখে একটা ছোট কেঁচোর টুকরো পরাতে পরাতে। যখন কোন কিছু ভাবে চরণ তখন ওর চোখ দুটো ফনীমনসার কাঁটার মত খাড়া হয়ে ওঠে, চোখের মনি দুটো চকচক করে।

কেঁচোটা বঁড়শির মুখে পরিয়ে টোপ শুদ্ধ বঁড়শিটা ছুড়ে দেয় গড়খাইয়ের গহীন কালো জলে। একটা বৃত্তরেখা জলের বুকে ধীরে ধীরে জাগে। শরের দুধসাদা ফাতনাটা সেই বৃত্তরেখার মাঝখানে ঝির ঝির করে কাঁপতে কাঁপতে এক সময় স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

অন্য দিন হলে একটা তেলকুচ কই, একটা সোনালী পার্শে নিদেন একটা ঘোলা অথবা মাঝারি ট্যাংরা ভাবত চরণ এই রকম একটা ক্রমে। আজ আর তেমন ভাবল না; সেরকম কোন ঘোলা বা ট্যাংরার আকাঙ্খা নয়, প্রার্থনা নয় একেবারে সোজাসুজি একটা কই অথবা সোনালী পার্শের ইচ্ছে হল তার। আজ একটু স্বতন্ত্র রকমের ভাবার কারণ আছে। প্রথমত পিতাজী আসার আনন্দে যে মেজাজ এতক্ষণ ধরে তার মনে গড়ে উঠেছে তাতে একটা ঘোলা বা ট্যাংরা সেখানে উঁকি দিতে পারে না; দ্বিতীয়ত সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে প্রথম খুঁটে একটা তেলকুচ কই বা নীল সোনালী পার্শে উঠবে। দিন পাঁচসাত বাদে পিতাজী আসবেই আসবে। এরকম একটা কিছু ভাবার মজা সে মনে মনে খুব অনুভব

করে ; আবার ভয় হয় যদি প্রথম খুট ফসকে যায় অথবা একটা ট্যাংরা ওঠে। তখন ছোট বুকটা আশায় আনন্দে সংশয়ে কাঁপে।

চরণের আশঙ্কা হল ফড়িংটার কথা ভেবে। এক রত্তি দুশমনটা এসে ফাতনাটা নড়িয়ে দিয়ে যাবে। অথবা গহীন জলের বুকে অকারণে ঘুরে ঘুরে মাছগুলোকে জানিয়ে দেবে চরণের কথা। লেজ উঁচিয়ে নেচে নেচে বেড়াবে শাপলা শালুকে, কচুরিপানার নীল ফুলে অথবা নীল পদ্মের ঝাড়ে।

চরণের এই মাছ ধরার নির্জন জগতে এই এক রত্তি ফড়িংটা একমাত্র দুশমন। তাই ফড়িঙটার কথা ভাবতে হয়। দুধসাদা ফাতনাটার ওপর দুটো চোখ এক করে দিয়ে সে ফড়িঙটার ভাবনাই করছিল।

কি আশ্চর্য, চোখের কি মন আছে অথবা মনের আছে চোখ !

যা ঘটে নি, ঘটত না, কোনদিন ঘটবে.না তাই ঘটল।

ফাতনাটা চোখের সামনে থেকে সরে গেল। আর চরণ দেখল ফড়িঙটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। গড়খাইয়ের জলে কচুরী পানার নীল ফুলের ওপর। পাখা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে।

টোপ সমেত বঁড়শিটা জল থেকে তুলে নিল সে। কচুরিপানার নীল ফুলের ঝাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে ভাল করে দেখল ফড়িঙটাকে। ফড়িঙটা নড়ল না, চিৎ হয়ে যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়ে রইল। নীল ফুলের ওপর বিচিত্র বর্ণের পাখা মেলে দিয়ে। বিস্মিত হল চরণ ফড়িঙটার এই নিস্তেজ ভঙ্গী দেখে। দুশমনটার এটা অন্য কোন কায়দা নয়ত, একবার ভাবল, আর যেই ভাবা অমনি মুখ দিয়ে ফুঁ দিল সে। কিন্তু কি রকম কাণ্ড ! ফড়িঙটা ঘাবড়াল না, তেমনি নির্বিকার হয়ে শুয়ে রইল চরণকে আরও বিস্মিত করে দিয়ে।

দুশমনটা ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক। ভাবল চরণ। আজ আর লেজ উঁচিয়ে আসবে না ; ভালই হবে।

শামুকখোল পাখিটা বাবলার বনের ভেতর হতে হেঁতালের ঝোপকে পাশে রেখে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। চরণ দেখল আর মনে মনে খুশি হল। এই ছায়ার ঘেরা মাছধরার নির্জন জগতে শামুকখোলটার

সাথে তার যত দোস্তি। শামুকখোলটা তাকে মাছ ধরায় বিরক্ত করতে আসে না; তাই চরণ তাকে দোস্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছে। ফড়িঙটার লেজ উঁচানো ভাবে শামুকখোলটাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে তারই মত। তাই অনেকদিন তার ছাই কমলা লম্বা ঠোঁট দিয়ে ফড়িঙটাকে ধরবার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু পারে নি। মনে মনে ক্ষোভে, হতাশায় আর বিদ্বেষে আবার ফড়িঙটাকে ধরার চেষ্টায় নতুন করে উঠে পড়ে লেগেছে।

খুশির ভাবটা চরণের কেটে গেল; কেমন একটা সন্দেহ হল তার। মনে হল দোস্তের ছাই কমলা ঠোঁটটা কেমন নগ্ন আর ভিজে ভিজে। আর অত চুপিসারে দোস্ত এগিয়ে আসছে কেন!

চরণ ফড়িঙটার ওপর ঝুঁকে পড়ল, মুখ দিয়ে একটা শব্দ তুলল। না, কোন কিছুই হবার নয়। দুশমনটা ঘুমিয়ে আছে তো আছেই। এক নির্লিপ্ত প্রশান্তিতে। কোথাও কোন ভ্রূক্ষেপ না রেখে।

শামুকখোলটার চোখজোড়া সজারুর কাঁটার মত ফুটে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি ফড়িঙটার ওপর আছড়ে পড়ছে যেন।

তাড়াতাড়ি কচুরিপানার নীল ফুলের ঝাড় থেকে হাত বাড়িয়ে চরণ ফড়িঙটা তুলে নিল। শামুকখোলটা উড়ে পালায়। কিন্তু ফড়িঙটা উড়ে পালাল না অন্য দিনকার মত। তেমনি নিঃসাড় নিশ্চল হয়ে তার শিশু হাতের ছোট মুঠোয় পড়ে রইল বিচিত্র পাখা দুটো মেলে। আর খানিকটা বৃষ্টির জল ঝরে পড়ল ওর গা থেকে চরণের হাতের মুঠোয়। ফড়িঙটাকে মনে হল খুব শীতল—হিম শীতল।

যে ফড়িঙটা লেজ উঁচিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেচে বেড়াত, আজকের এই ভোরবেলায় সে বর্ষার জলে ভেজা নীলফুলের স্তবকের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাখনার চঞ্চলতায় চরণের মাছ ধরার জগতকে ডিঙিয়ে সে এসেছে। তাই আর ওঠে নি। শেষরাত্রির বর্ষণ তাকে শাস্তি দিয়েছিল; চঞ্চল পাখনায় আর উৎসাহী চোখে।

সুন্দরবনের নোনা সমুদ্রের দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার সর্দার শিশু আট বছরের চরণ জানে না মৃত্যু কি। তাই সে ভেবেছিল ফড়িঙটা ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তারই হাতের ছোট মুঠোয় ফড়িঙটা যখন নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে রইল

তখন আজ এই প্রথম ফড়িঙটার জন্য চরণের মনে একটা অপরূপ বেদনার ঢেউ উঠল।

জীবনের ভেতর মৃত্যুকে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল চরণ। মৃত্যুর শীতল অভিজ্ঞতায় দুচোখ ভিজে উঠল তার।

চরণ কাঁদছে।

॥ তেরো ॥

নদীর বুক ছুঁয়ে দুটো জলপিপি উড়ে গেল বনের দিকে। মরিচঝাঁপির ঘন সবুজে দুপুর গড়াচ্ছে। দুপুরের হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা বনটার মাথায়। দ্বারিকদের নৌকো দুটো গ্যারাপী করে আছে একটা খালের মুখে। সফর প্রায় শেষ হয়ে এল। এ কটা দিন কেটেছে ভালয় ভালয়। এখন কিছু মাল সওদা করে ওরা ফিরবে। পাকিস্তানের ব্যাপারীরা এল চলে। দ্বারিক ছইয়ের তলায় বসে বসে গুন্ গুন্ করে একটা গানের সুর গলায় আনার চেষ্টা করছে।

ওপার ঘেঁষে একটা ছোট যাত্রী নৌকা চলেছে। মনে হচ্ছে বিয়ে করে কোন জোতদারের পো ঘরে ফিরছে। এক দ্বীপের মেয়ে আরেক দিকে ঘর করতে আসছে। নৌকোয় বিয়ের দান সামগ্রীতে বোঝাই। তাই পাড় ঘেঁষে আস্তে আস্তে চলেছে। দাঁড়িরা মন্থর চালে দাঁড় ফেলছে। কিছু দূরে ঠিক এই নৌকাটার পেছনে আরেকটা নৌকায় চারজন মাঝি বৈঠা মারছে। বৈঠার ঘায়ে এক একটা ছোট ঘূর্ণি পাক খেতে খেতে জোয়ারের সাথে ছুটে চলেছে। পিছনের নৌকাটা সামনের নৌকার কাছাকাছি চলে এল।

পাড় ঘেঁষে দুটো নৌকাই চলেছে এখন পাশাপাশি। দুনৌকার হালের মাঝি আসমান দরিয়ার সুখ দুঃখের বাতচীত করছে। যাত্রী নৌকার মাঝিকে হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা দিল অন্য নৌকার মাঝি। যাত্রী নৌকার মাঝি খুব খুশী। হুঁকোতে জবর টান দিল সে। শব্দ উঠল গুর গুর গুরুর। কড়া তামাকের মৌতাতে গল্প আরও জমে উঠল। দুটো নৌকা অনেক সময় ধরে পাশাপাশি চলল।

সামনে নদীর বাঁক। নদীর ঢেউ এখানে একটু উঁচা টান। ঢেউয়ের আঘাতে পাড় ভাঙ্গছে, ধ্বস নামছে। যাত্রী নৌকাটাকে একটু এগোতে দিল অন্য নৌকাটা। বাঁকের মুখটা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

খাল পারের নৌকার ছইয়ের তলা থেকে দ্বারিক বসে বসে দেখছিল নৌকা দুটোকে। আর কিছু করার নেই বলে, আর কিছু দেখার নেই বলে সে নৌকো দুটোকেই অলস চোখে দেখছে। দ্বারিকের কেমন যেন একটা সন্দেহ হল। সে নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াল। দুশোমণি নৌকোর পেছনে ছোট একটা নৌকা কাছি দিয়ে বাঁধা আছে। পাটাতন থেকে নেমে সেদিকে অগ্রসর হল দ্বারিক।

বাঁকের মুখে আসতেই পেছনের নৌকাটা সোজাসুজি যাত্রী নৌকোর ওপর উঠে গেল। দূর থেকে কেউ দেখলে ভাববে প্রবল স্রোতে তাল সামলাতে না পেরে দুর্ঘটনা ঘটছে। কিন্তু দ্বারিকের চোখে কিছু এড়াল না। সন্দেহটা তার অমূলক নয় বুঝল সে। যাত্রী নৌকাটা পাড়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। কয়েকজন লোক ডাঙ্গায়, কয়েকজন জলে ছিটকে পড়ল।

পেছনের নৌকার মাঝিরা লাফ দিয়ে পড়ল ডাঙ্গায়। যাত্রী নৌকার হালের মাঝি সমেত দুজন মাঝি আর নতুন বর পড়েছে গিয়ে জলে। ওরা সাঁতরে পারের দিকে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রবল স্রোতে ক্রমশই পার থেকে দূরে ভেসে চলেছে। আর কিছুক্ষণ পর কামোটে কাটবে ওদের। অথবা নোনা জল খেতে খেতে পেট ফুলে মরবে। মেয়েটা পড়েছে পাড়ের ওপর। যাত্রী নৌকোর দুটো লোক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে দুটো ভারী বৈঠার বাড়ি ওদের মাথায় পড়ল। মেয়েটা তখন জ্ঞান হারিয়েছে।

দ্বারিক লাফ দিয়ে ছোট নৌকাটার ওপর পড়ল। কাছিটা খুলে বৈঠা মারতে যাবে এমন সময় পাশের নৌকা থেকে মহাজন হারান গাঢ়ুর গলা শুনল সে। চেঁচিয়ে বলছে সে। খেঁকশিয়ালের মত গলা দিয়ে সে দ্বারিককে বলল ফিরে আয়। দ্বারিক তখন কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। নিঃশব্দে কাছিটা বাঁধল নৌকার। বাঁধতে বাঁধতে অনেক ভাবল। ক্ষত বিক্ষত হল ওর মন, কিন্তু অসহায় হয়ে আবার উঠে এল দুশোমনি নৌকার পাটাতনে।

অন্যান্য মাঝিরা তখন জটলা জমিয়েছে জোর।

—বহুৎ বাহাদুরি। দ্বারিককে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ করল অনন্তলাল।

ছুক করে মুখ থেকে খৈনির খানিক গরম পিক ফেলল সে। আর একসময় টেনে টেনে বলল এরকম হাঙ্গামা-হুজ্জতি দরিয়ায় লেগেই আছে, সব জিনিসে নজর দিলে চলে। কথাগুলো নির্বিকার ভাবে শ্লোকের মত বলল সে, যেন ওদের দেশের তুলসী দাসের রামায়ণ থেকে কয়েকটা পঙক্তি আবৃত্তি করছে এমন ভংগী।

অন্য সময় হলে এ কথার সমুচিত জবাব দিত দ্বারিক। কিন্তু এখন কাজিয়ার সময় নয়। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থাণুর মত দেখল যাত্রী নৌকার সব মালপত্র ডাঙা থেকে জড়ো করছে নিজেদের নৌকায় মাঝিরা। মেয়েটার গা থেকে একে একে গয়নাগুলো খুব তাড়াতাড়ি খুলে নিচ্ছে তারা। কিন্তু দ্বারিকের করবার কিছু উপায় নেই। মহাজনের ইচ্ছে নেই ওসবে। অনন্তলাল তো সোজাসুজি ব্যঙ্গই করল।

দরিয়ায় জন্ম নয় দ্বারিকের। সে ডাঙ্গার মানুষ। পূর্বপুরুষেরা তার কোন সময় শিকার করত তারপর একসময় লাঙল ধরেছিল। তবুও জীবিকা ও জীবনের ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে সে কখনও ক্ষেতমজুর কখনও বা মাঝি। দরিয়ায় জন্ম যাদের, মাঝির ঘরে জন্মায় যারা তারা জানে দরিয়ায় একজন আরেকজনের কত সহায়; একথা কোন পুঁথিতে লেখা নেই; একথা আছে তাদের মনে কসমের মত রক্তের সাথে মিশে! মাঝির ঘরে না জন্মেও দ্বারিক কথাটা জেনে ফেলেছে দরিয়ায় ঘুরতে ঘুরতে। আজ অসহায় হয়ে একটা অর্জুনের মত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দ্বারিক দেখল তাদের এই দু'নৌকার যেসব মাঝিরা রাতে ঘুমের সময় তাদের জীবনের গত সফরের কত কাহিনী উপকাহিনী, ঘটনা দুর্ঘটনার গল্প জমিয়ে তুলে নিজেদেরকে মাঝির বেটা বলে বীর পুঙ্গব বলে বুক চাপড়িয়েছে, তারাই আজ তার পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গোলা কবুতরের মত বকম বকম করছে। দুশ্চিন্তার কোন লক্ষণই দ্বারিক ওদের ভেতর দেখতে পেল না। যেন কিছুই ঘটে নি।

ভাদ্রমাসের নোনাগাঙয়ের মাতাল বাঁকটায় দুটো স্বপ্নের জীবন দুমড়ে মুচড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। আসন্ন বিকেলের হলুদ সূর্যটা তখন অনেক পশ্চিমে! কিন্তু কোথায়ও কোন বিক্ষোভের, আফসোসের বা শোকের তরঙ্গ উঠল না।

একজন অসহায় সর্দারের মনে শুধু একটা ভাবের সৃষ্টি হল।

জীবনে আরেকবার সে এরকম অসহায় বোধ করেছিল নিজেকে। অনেকদিন আগের একটা ঘটনা উঁকি দিল দ্বারিকের মনে।

তখন সবে সুন্দরবনের দরিয়ায় কলের জাহাজ চলতে শুরু করেছে। হ্যামিলটন কোম্পানীর অনেক মালপত্র আসত সে জাহাজে। দ্বারিকরা একবার জনাদশেক মিলে গোসাবার ফেরী ঘাটে হ্যামিলটন কোম্পানীর মালপত্র নামাতে গিয়েছিল। ঘটনাটা সে সময়কার।

বিকেল। তামাম দিনভর তারা মাল নামাচ্ছে জাহাজ থেকে। বিকেলের ছায়ায় তাই শ্রান্ত হয়ে ওরা খানিক বিশ্রাম করছিল। কেউ কেউ হুঁকো টানছে। তার সাথে খোশগল্প চলছে। সবাই খুশী। কোম্পানীর কেরাণীবাবু খানিক পরেই সবাইকে ডেকে ওদের সারাদিনকার রোজ পাই পয়সা অবধি মিটিয়ে দেবে। গঞ্জের থেকে কিছু সওদা করে ওরা সূর্যবেড়িয়ায় ঘরে ফিরবে। ঘরে ওদের বৌ ছেলেমেয়ে আছে।

নাথু সর্দারের জোয়ান বেটা মঙ্গল তখন জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক দিচ্ছে। আরও কিছু কাজ বাকী। সে ফেরী ঘাটের কুলির সর্দার। ছোট থেকেই ফেরী ঘাটে মানুষ। হ্যামিলটন কোম্পানীর দৌলতে দুপয়সার দেখা পেয়েছে।

দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায় ওর বুড়ো বাপ নাথু সর্দারের ভিটে। কিন্তু মঙ্গল থাকে কোম্পানীর চালা ঘরে। তবে এবার ওকে সাদি দিয়ে বেটাকে ঘরে আনবে নাথু। বেটাও রাজী হয়েছে। মেয়ে পছন্দ হয়েছে রাঙাবেলিয়ার।

পশ্চিমের আকাশে মেঘ জমছিল। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে লাল কিংশুকের ছোপ। অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষ রঙয়ের বাহার তখন আসমানটার বুকে। ফেরী ঘাটের ঘোলা জলে সে রঙ এক খেলায় মেতেছে। অপলকে সেদিকে তাকিয়ে ছিল মঙ্গল। মুগ্ধ চোখে জলের বুকে রঙের খেলা দেখতে দেখতে সে হয়ত সারাদিনের কাজের ফাঁকে রাঙাবেলিয়ার মেয়েটার কথাই ভাবছিল। তার ঘর বাঁধার কথা।

একটা হল্লা উঠল। দ্বারিকরা তখন খোশগল্প ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমের আকাশে হঠাৎ সূর্যটা ডুব দিয়েছে। লাল রঙ নিভে গেছে।

মিশ কালো বিদঘুটে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে সমস্ত আকাশে। সাথে সাথে বিদ্যাধরীর জলে লাগল পাক। ঝুটো—ঝুটো। চারিদিকে হল্লা উঠল। শাঁই শাঁই করে প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে এল ঘূর্ণিঝড় বিদ্যাধরীর জলকে উথাল পাথাল করে। নিমেষে লালরঙয়ের বাহারে মুগ্ধ রাঙ্গাবেলিয়ার মেয়েটির স্বপ্নে বিভোর মঙ্গলকে ঝাপটা মেরে ফেলল বিদ্যাধরীর জলে। চারিদিকে হৈ চৈ উঠল। নাথু সর্দার পাগলের মত চেঁচাচ্ছে।

গাঁংভেড়িতে ভিড় করেছে মরদের দল আর তার সাথে ঘাটের মাঝি মাল্লারা। দ্বারিক দাঁড়িয়েছিল একটা গেঁওগাছের তলায়। মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করে দুহাত তুলে ঝাঁপ দিতে গেল বিদ্যাধরীর জলে। ওস্তাদ সাঁতারু সে। জলে কেমনভাবে মেছোকুমীর আর কামোট বাঁচিয়ে নোনাজলে সাঁতার কাটতে হয় জানে সে। কিন্তু তাকে জাপটে ধরেছে দোস্ত শুকরাম। —বুদ্ধু, ঝুটো মালুম নেহি, দক্ষিণকা ঝুটো। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে এই হাওয়া পাক খেতে খেতে সমস্ত সুন্দরবন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে আর সামনে যা পায় উড়িয়ে নিয়ে নদীর জলে ফেলে। এর সাথে যুঝবে এমন মরদ ডাঙ্গায় অথবা দরিয়ায় কেউ নেই। আর বুদ্ধু দ্বারিক কিনা ঝাঁপ দিয়ে সেই ঝুটোর মুখ থেকে মঙ্গলকে ফিরিয়ে আনতে চায়!

তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে রইল দ্বারিক আর শুকরাম পুতুল নাচের কাঠের পুতুলের মত। দেখল তাদের চোখের সামনে মঙ্গল পাক খেতে খেতে তলিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলের মতও জোয়ান মরদ কিছু সুবিধে করতে পারছে না সেই ঘূর্ণির মুখে। ঝুটোর শিকার হল মঙ্গল সর্দার।

সাঁঝের বেলায় ঝড় থেমে এল। সে সাথে বাতাস। প্রচণ্ড এক পরিহাসকর স্তব্ধতা। গাছের পাতাটাও বুঝি নড়ে না! বেলা শেষে যে লোকটা ঝুটোর মুখে তলিয়ে গেল এখন তার কোন নিশানাই জলে বা বাতাসে কোথাও নেই। যে গেল সে হঠাৎ গেল।

সেদিনও দ্বারিক আজকের মত অসহায়বোধ করেছিল। ও মনে মনে এমনই ব্যথার ভাবনা ভেবেছিল।

মরিচঝাঁপির কালো জঙ্গলে বিকেলের ম্লান রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে।

কিন্তু দুপুরের গাঢ় রোদে যারা সত্য ছিল সন্ধ্যার বা রাত্রির অন্ধকারে তাদের কোন অস্তিত্বই আর ধরা পড়বে না।

অনেকরাতে আকাশে দুটো নক্ষত্র উঠল। সেই নক্ষত্রের আলোয় দ্বারিক দেখল দুটো মুখ, একটা ছোট ঘর। শুক্রমনির পাশাপাশি ঝুমুর বিবির মুখ, আর দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার সর্দার পল্লীর একটা ছোট ঘরে সোনামনি আর চরণ। এখন ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত পিতাজীর কথাই ভাবতে ভাবতে।

এই বিদেশবিভুঁয়ে কালোজঙ্গলের পাশে নৌকার পাটাতনের ওপর শুয়ে অনেকদিন পর শুক্রমনির কথা ভাবতে গিয়ে দূর আকাশের ঐ নক্ষত্র দুটোকে অঘ্রাণের কুয়াশায় হিমশীতল শুক্রমনির দুটো চোখ বলে মনে হল দ্বারিকের।

একটা হাওয়া দিল। একটা ঘুটঘুটে মেঘ নক্ষত্র দুটোকে ঢেকে দিল। মরিচঝাঁপির কালো জঙ্গলের মাথায় এখন অনেক মেঘ জমেছে। দুটো বড় বড় জলের ঠাণ্ডা ফোঁটা দ্বারিকের মুখে আর বুকে পড়ল। মনে হল নক্ষত্র দুটো দূর আকাশ থেকে জল হয়ে ঝরে পড়ল দ্বারিকের গায়ে।

॥ চোদ্দ ॥

মনটা ফাঁকা হয়ে গেলে পরাণটা হুহু করে; কোন কোন সময় মনটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে যায় তখন বড় বিস্বাদ ঠেকে সব কিছু। যত রাজ্যের ভুতুড়ে বিষাদ এসে জড় হয়; তার থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই; কেন না মনটা জানে না কেন সেটা অহেতুক তিতো হয়ে গেল। তবে তেমন কোন ভাবনা থাকলে মনটা আবার জোড়া লাগে; সব কিছু ফিরে পায়, এমন কি সেটা বাসি ভাবনা হলেও। হাঁড়িতে কালি না পড়লে ভাত না ফুটলে পেটটা মোচড় লাগায়; বড় জবর সে মোচড়। তখন বাসি ভাবনার মত দুটা পচা বাসি ভাত জুটলে পেটটা আবার জোড়া লাগে। তেতো পেট তেতো মনের মত। দুইয়ের ফারাক কিছু নেই। একটা ভরলে আরেকটা খুশী থাকে। না ভরলেই যত অনর্থ।

সোনামনির মনটা কেমন গুমোট বেঁধেছে সেই সকাল থেকে; সকাল গিয়ে দুপুর এল; দুপুরও যেতে বসেছে, তবুও সে গুমোট একটুও তরল হল না। মাঠে যাবার তাড়া সকালে ছিল না, দুপুরেও নেই। এখন রোজ রোজ মাঠে মাঠে কাজ মেলে না। তাই ঘরের হাঁড়ি বাঁশের আংটায় ঝুলছে বেশ কদিন থেকে। হাঁড়িটা বেশ তকতকে হয়ে উঠেছে।

পিতাজী ঘরে নেই; রূপেয়া কামাতে মরিচঝাঁপি গেছে। মাঠের রোজগারে আর পিতাজী যে কয়েকটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল তাতে এ কদিন চলল। আবার বিলেবাদায় ঘুরে শাপলা শালুক খুঁজতে হয়। পিতাজীর অপেক্ষায় দিন গুণতে হয়।

সবচেয়ে বিরস লাগে চরণের মুখের দিকে তাকালে। চরণটা থাকতে থাকতে হঠাৎ কেঁদে ফেলে, ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে ভাত খেতে চায়। জোটে না। আবার একসময় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। পেটের মোচড়টায় অসহায় বোধ করে। শরীরটা নেতিয়ে যায়। আর যত রাজ্যের ক্লান্তির ঘুম এসে জড় হয়। ঘুমের ভেতর পেটটা খিল কাটে।

ঘুমের ভেতর চরণটা কি যেন বলে বিড়বিড় করে। সোনা—সোনামনি। মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, সোনামনিকে জড়িয়ে ধরে। সোনামনি তখন চরণকে জাগিয়ে দেয়। এসময় জাগিয়ে দিতে হয়। সারাদিন বিলে বাদায়, গাংভেড়িতে আপন মনে ঘোরে ছেলেটা। কত কি ভাবে আপন মনে। ঘুমাবার সময় সেই কথাগুলোই বলে চরণ। একসময় সোনামনি কান পেতে শোনে চরণের কথা। ছোঁড়াটার মুখ দিয়ে কোন পীর-পরিতে কথা বলে না তো! যাতে তাদের নসীব ফিরে যাবে। ভাবে সোনামনি।

দুপুরের খাঁ খাঁ রোদে কদবেলগাছটার খটখটে ডালে বসে একটা ড্যাবরা কাউয়া ডেকে চলেছে; কয়েকটা চালচড়া উঠোনের কলাগাছটার নীচে কিচিরমিচির শব্দে দুপুর জাগিয়ে রেখেছে। কালুয়াটা আধ-বোজা চোখে না ঘুমিয়ে না জেগে ঝিমোচ্ছে। রোদের আঁচে ওর জিভটায় ঘাম জমেছে। জিভটা মুখ থেকে অনেকখানি বেরিয়ে পড়েছে। সারা দুপুর কালুয়া সূর্যবেড়িয়ায় ঘুরেছে, এপাড়া সেপাড়া এ বাড়ি সে বাড়ি কোথায়ও তাড়া খেয়েছে, কোথায়ও মুখের দুটো কথা। কিন্তু কোথায়ও ভাতের ফেনটাও জোটে নি। ডেকে কেউ দেয় নি। তাই আবার সর্দার পল্লীতে দ্বারিক সর্দারের ঘরখানায় ফিরে এসে তার এই নিজস্ব ছায়াটুকুতে চার পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে বসে ধুঁকছে। আর আধবোজা চোখে সব দেখছে। এইভাবে তাকিয়ে থাকার ভংগীটা কালুয়ার নিজস্ব ঢঙ বলা চলে।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ হেঁতালের ঝোপে লেপ্টে আছে। কিন্তু বাবলা-বনের হলুদ ফুলের ছায়াটুকু তখনও মিঠে। বিকেলের প্রশান্তিতে গাঢ় হচ্ছে। রোজদিনকার মত শামুকখোলটা গুটিগুটি উড়ে আসে হলুদ ছায়ায়। ঠোঁটটা শূন্যে তুলে দিয়ে গড়খাইয়ের শ্যাওলায় শামুক গুগলির প্রতীক্ষায় ঘুপটি মেরে আছে। বিকেল আসছে মনে করে গহীন কালো জলের মাছগুলো একে একে উপরে উঠে আসছে। কিন্তু চরণ ভুলে গেছে এ দুপুরে মাছ ধরার কথা, ভুলে গেছে পিতাজী আসার দিন এগিয়ে এল। সবকিছু ভুলে গিয়ে ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে। ভূখটা যেন ভেটকী মাছের মত পেটে ঝাপ্টা মারে। তখন মোচড় দেয় সারা দেহটা।

চরণ বিষণ্ণ আড়মোড়া ভেঙ্গে ওঠে। দাওয়ার বাইরে এসে গাংভেড়িতে কদবেল গাছটার নীচে দাঁড়ায়। গইবাক্সের ভেতর দিয়ে কুলকুল শব্দ জাগিয়ে জোয়ারের জল বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ কান পেতে সে শব্দ শোনে চরণ। এ শব্দ বেশীক্ষণ শুনলে ঘুম আসে। ড্যাবরা কাওয়াটা এখনও হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ডাকছে। কিসের আনন্দে ড্যাবরা কাউয়ারা ঘোর দুপুরে গলা ছেড়ে ডাকে ভাবে চরণ। তারপর উত্তরমুখো হয়। উত্তরে চাচাজী শুকরামের ঘর। মনে মনে একটা আশা পোষণ করে চরণ। সকালে এরকমই একটা আশা নিয়ে এসেছিল চরণ। এখন ঘোর দুপুরে আরেকবার হাঁটল ঐ পথে।

সকালে এসে একবার উঁকি মেরে গেছে চরণ, এখন আরেকবার এল। দাওয়ায় বসে চাচাজী সেই সকালের মত নির্বিকারভাবে একটি বাঁশের লাঠি ছিলে মিহি করে চাঁছছে। একটা জ্যান্ত লাঠি তৈরী করবে বলে। চরণ দেখল, জ্ঞান হতেই দেখে আসছে চাচাজী অবসর সময় একটি লাঠির জগতে ডুবে থাকে। একটা জ্যান্ত লাঠির স্বপ্ন দেখে। সব লাঠি ঘরে রাখে না শুকরাম। কোন কোন লাঠি বিলিয়ে দেয়; কোন লাঠি ঘরে রাখে; আবার কোন লাঠি বানিয়েই একটা খুঁত দেখলে ভেঙে ফেলে দেয়। চাচাজী পিতাজীর জবর দোস্ত, যাকে বলে পয়লা নম্বরের; কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন লাঠি চাচাজী পিতাজীকে দেয় নি। কথাটা ভাবতে চরণের শিশুমন কেমন যেন আঁকুপাঁকু করে ওঠে; কিন্তু কোন কিছুর কূলকিনারা করে উঠতে পারে না। ব্যাপারটা এমন ঘটে কেন!

চরণকে সামনে দেখে চাচা শুকরাম মুখ তুলে হাসল। এতে চরণ কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে চাচাজীর সামনা সামনি। তাড়তাড়ি জিজ্ঞাসা করে নীলমনির কথা। নীলমনি চাচার মেয়ে। চরণের সমবয়সী। শুকরাম ইসারায় ঘর দেখিয়ে দেয়। চরণ বেশীক্ষণ শুকরামের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কেমন যেন লজ্জা লাগে। তাড়াতাড়ি পা ফেলে ঘরে ঢুকে যায়। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে চরণ ভাবে চাচাজী ধরে ফেলে নিত। ঘরে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খায় চরণ। এক সময় বেরিয়ে আসে নীলমনির সাথে কথা না বলেই। নীলমনি ঘুমাচ্ছে। আসতে

আসতে চরণ ভাবে নীলমনিদের হাঁড়িতে ভাত ফুটলে চাচাজী ডেকে জরুর দুটো খাইয়ে দিত। কথাটা ভেবে মনে মনে একটা নিঃশ্বাস চাপে চরণ। আবার গাংভেড়িতে এসে দাঁড়ায়।

গাংভেড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চরণ দেখল বিকেল আসছে। আবার বিকেল ছাপিয়ে সন্ধ্যা নামবে। সন্ধ্যার সুকেশী অন্ধকারে ভাঙ্গা ছাতির তলায় নিভু নিভু প্রদীপ হাতে মুশকিল আসানের দেখা পাবে চরণ। দাওয়ায় বসে সে তার কাছে কালির টিপ পরবে। সারা বর্ষাকালটা তার দেখা প্রায়ই মেলে নি। এখন আবার মিলছে।

চরণ যখন গাংভেড়িতে দাঁড়িয়ে মুশকিল আসানের কথা ভাবছে তখন গোসাবার ঘাটে সাতজেলিয়ার কলের জাহাজ থেকে নামল দ্বারিক। দুই গালে দাড়ি; আর কাঁধে বর্শার ডগায় ঝোলান পুঁটলি। শনিবারে গোসাবার হাট বসেছে। হাটের ঘাটে অনেক ছোট বড় মাঝারি নৌকা ভাঁটার এঁটেল কাদায় পড়ে আছে। বিদ্যাধরী আর পাঠানখালির এপার ওপার থেকে অনেকে এসেছে সারা সপ্তাহের মত সওদা করতে! কেনাবেচা করতে। সপ্তাহে দুদিন মাত্র হাট। তাই ভিড় খুব জবর হয়। দ্বারিক হাটের মাঝে ভিড়ের মধ্যে এসে পড়ল। চেনামুখ খোঁজার চেষ্টা করল। সর্দার পল্লীর কেউ শনিবার হাটে আসে না তবুও দ্বারিক একটা মুখ খুঁজল। দেখল আনাজের বাজারে দাঁড়িয়ে রতিকান্ত শ্যামল হ্যামিলন ষ্টেটের একজন কর্মচারীর সাথে কথা বলছে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভিড় ঠেলে ভাটিখানার দরজায় এসে দাঁড়ায় দ্বারিক।

কয়েকটা আটচালা ইতঃস্তত ছড়ান। ইতিমধ্যেই সেগুলিতে বেশ ভিড় জমেছে। মেদিনীপুরের মানুষই বেশী। তাছাড়া আছে পদ্মাপারের বাঙাল আর সর্দার, বাউরী, মুরারী। ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে গামছার চালভাজা আর আলু পেঁয়াজের সাথে হাঁড়া থেকে হাঁড়িয়া ঢেলে গিলছে ওরা। মাঝখানকার আটচালায় ভাটিখানার কর্তা শচীন পিড়ি মশাই একখানা ভাঙ্গা কাঠের চেয়ারে বসে গুরুর গুরুর শব্দে হুঁকো টানছে। তার তিনজন কর্মচারী খাটে। তিন পুরুষের ব্যবসা তার। চোদ্দ বছর বয়সে বাপ ঠাকুরদার কাছে এ ব্যবসায় হাতে

খড়ি পিড়ি 'মশায়ের। তখন সে মেদিনীপুরে। এখন তার পঞ্চাশ। ভুরুক ভুরুক করে তামাক টানেন তিনি আর মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়েন। তার পাশে চারটে কুত্তা ঝিমোচ্ছে। এগুলো সারাদিন ঝিমোয়। হাড়িয়ার হাঁড়া চেটে, ছিটানো ছড়ানো খড়া খেয়ে ওদেরও নেশা লাগে। আর ভাটিখানায় দিনরাত পড়ে থাকে।

আটচালার ভিড়ে কেউ বা গান ধরেছে; কেউ বা কোমর দুলিয়ে নাচে। গোসাবার খ্রীষ্টান বাগদী ছোঁড়াটা বাঁশী বাজায়। মাথুর জানা টেনে টেনে গান ধরে। ভাটিখানার মধ্যমণি সে। নেশা জমলে সমস্ত রসের স্রোত তাকে কেন্দ্র করে বয়ে চলে। লোকটা এ দ্বীপ সে দ্বীপ যাত্রা করে ঘুরে বেড়ায়। গলা বড় দরাজ। আধ ঘণ্টা ধরে সে টান দিয়ে চলেছে তো চলেছেই। নেশার ঝোঁক বটে। দ্বারিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। মাথুর জানা ঝাঁকড়া চুলের গোছা দুলিয়ে বড় বড় চোখ দুটো বের করে গাইছে :

সোঁদাল ফুলের গন্ধ ভারী
খোঁপায় পরে মোর পিয়ারী,
মোর পিয়ারী,
খোঁপায় পরে মোর পিয়ারী ।।

সোঁদাল কথাটার ওপর পাঁচ মিনিট ধরে টান দিয়ে চলেছে তারপর আসছে ফুলে। খোঁপায় পরে মোর পিয়ারী পঙক্তিটা বারে বারে ঘুরে ফিরে গাইছে। আর বড় বেশী ঝোঁক দিচ্ছে পিয়ারী শব্দটা ওপর। কথাটা বলার সময় মাথাটা বড় বেশী নাড়ায়। দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে দ্বারিকের কেমন যেন হাসি পায়।

ইতস্তত করছিল দ্বারিক হাড়িয়ার একটা হাঁড়া নিয়ে বসতে। অথচ ভাটিখানা থেকে বেরিয়ে চলে আসে এমন শক্তি তার নেই। বস্তুত কে যেন ঠেলে তাকে ভাটিখানার দরজায় পেঁছে দিয়েছে। কিন্তু ভাটিখানার মানুষগুলো দেখে আজ এই প্রথম কেমন জানি তার হুঁশ হল। তাই সে বেরিয়ে আসবে কিনা ভাবছে।

মরিচঝাঁপির কালো জঙ্গলে মাঝিগিরি করে যে রূপেয়া কামিয়ে ছিল দ্বারিক তা এতদিন খাওয়া দাওয়া আর হাড়িয়াতেই গেছে। আছে

অবশিষ্ট পাঁচ সাত টাকা। আসার সময় ছেলেমেয়ে দুটোকে কথা দিয়ে এসেছিল পিরাণ আর শাড়ির। তা ছাড়া বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ি আর ঘুনসির মালা। সে সব কেনারও পয়সা নেই। তাছাড়া বাকী কটা মাসের হাড়িয়ার পয়সাই যদি না থাকল তবে অমন সফরের ফয়দা কি। এরকম অনেক আকাশ পাতাল ভাবে দ্বারিক।

ভাবতে ভাবতেই সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিল ট্যাঁক থেকে রূপেয়া বের করে। রাঙাবেলিয়ার মুন্না সর্দার বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল—আরে দ্বারিক ভাইয়া। তারপর হাঁড়ার কাছ থেকে উঠে গিয়ে দ্বারিককে জড়িয়ে ধরে পাশে নিয়ে বসাল। খেয়া পাড়িতে মাঝিগিরি করে দ্বারিকের আশে পাশের দু'একজন মানুষের সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছে; মুন্না সর্দার তাদেরই একজন। সে ধানকলে কাজ করে।

মাথুর জানার গলাটা খুব জমে উঠেছে। কিছু লোক হাতের চেটোয় তাল ঠুকছে। কেউ বা দাঁড়িয়ে কোমর নাচিয়ে কেউ বা ঠ্যাঙ ছড়িয়ে। খ্রীষ্টান ছোঁড়াটা বাঁশীতে সুর তুলল এতক্ষণে। চারিদিকে একটা প্রাণের হল্লা বইছে। কুকুরগুলো মাঝে মাঝে মুখ তুলে চেঁচাচ্ছে কুঁই-ই-ই-ই। নেশায় জড়ান সে চীৎকার। শচীন পিড়ির গলা মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে। হাড়িয়া আর তামাকের গন্ধে বাতাস মৌ-মৌ করছে।

দ্বারিক তখনও মুন্না সর্দারের পাশে বসে। ভাটিখানার দোকান থেকে হাঁড়া আর সরা কিনে আনে নি। মুন্না সর্দার মাটির ভাঁড়ে হাড়িয়া ঢেলে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছে আর দ্বারিককে নানারকম প্রশ্ন করছে। দ্বারিক মাঝে মাঝে হাঁ-হাঁ উত্তর জোগাচ্ছে। সে তখন ভাবছিল চরণ আর সোনামনির পিরান আর শাড়ীর কথা। আগামী কয়েক মাসের জন্য কিছু রূপেয়ার বন্দোবস্তের কথা। সফরে বেরোবার মুখে সে এ রকম ভেবেই গিয়েছিল। শাপলা-শালুকে আর কতদিন পেট ভরে। মুন্না সর্দার দ্বারিককে কনুই দিয়ে একটা ঠেলা মারল। দ্বারিক উঠে দাঁড়িয়ে দোকানের দিকে চলল। হাঁড়া ভরে হাড়িয়া আনতে।

খেয়াল খুশীর মেলা বসেছে তখন। কেউটের ড্যাকারা যেন কেমন দাঁড়াশ বনে গেছে। হাড়িয়া আর রক্তে তখন ভেতরে ভেতরে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে; কে কাকে বশে আনবে তারই চেষ্টা। দ্বারিকের মাথাটা ঝিম ঝিম করে। মুন্না সর্দার হাসি টেনে টেনে বলছে—পি-লো—পি-লো—খুশীসে পি-লো। জাত সাপের মত মাজা দুলিয়ে বাসন্তী বাউরী ভাটিখানায় চক্কর মেরে রেড়াচ্ছে। এখানে ওখানে থামছে। একে ওকে ছোবল দিচ্ছে। বুকের ফুল দুটো শাড়ির তলা থেকে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে ওর নেশাগ্রস্ত যৌবনের কথা তামাম পুরুষ পুঙ্গবদের জানাচ্ছে। একটা মস্করার রোল উঠেছে; একটা হাসি ইয়ার্কির, ঠাট্টা-কটুক্তির ঢেউ আছাড় খেয়ে পাক দিচ্ছে ভাটিখানার এদিক থেকে ওদিক। শূন্য হাঁড়ায় চাঁটি মারতে মারতে তখন মাথুর গান গেয়েই চলেছে—খোঁপায় পরে মোর পিয়ারী। সোঁদাল ফুলের গন্ধ ভারী। তার সাথে তাল ঠুকছে সমস্ত ভাটিখানা। বাসন্তী বাউরী এক সময় গান ধরল :

মুখি পানি চাউ
ফিরিয়া তাকাউ
নয়ন ভরিয়া দেখি।

আহাঃ, হুহুঃ রোল উঠল সমস্ত ভাটিখানায়। সমস্ত জোয়ান তখন বাসন্তী বাউরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলাচ্ছে।

ভাঁড়ের হাড়িয়ায় শেষ চুমুক দিল দ্বারিক সর্দার; টলতে টলতে উঠল হাঁড়াটা নিয়ে। পেছন থেকে ওর লেংটী ধরে টান দিল মুন্না সর্দার। খিল খিল করে হেসে দ্বারিকের হাতে বর্শাটা আর পুঁটলিটা গুঁজে দিল। দোকানে হাঁড়াটা জমা করে পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে এল দ্বারিক ভাটিখানা থেকে। সন্ধ্যা নামছে।

গঞ্জের হাটে এসে দাড়াল সে। ভাটায় নদী অনেক সরে গেছে একদল লোক সওদা করে একটা নৌকায় এসে জমেছে। দ্বারিক ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল। কচুখালির নৌকা; এ নৌকায় অনেকে এসেছে হাটবারে। আবার কেনাবেচা করে সবাই ফিরে যাচ্ছে। ভাটায়

নৌকাটা আটকে গেছে। সবাই মিলে ঠেলেও একটু সরাতে পারছে না। বিদ্যাধরীতে নিয়ে গিয়ে নৌকা ভাসাতে হবে। দ্বারিক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাত দিয়ে দুই একজন সরিয়ে নৌকার ধারে তার চওড়া কাঁধটা লাগাল। নৌকা নড়ে উঠল। তারপর ঠেলায় ঠেলায় জলে গিয়ে পড়ল। গোসাবার হাটের ঘাটে খুব কম নৌকাই আছে যে দ্বারিকের চওড়া কাঁধের স্পর্শ পায় নি। দ্বারিকের কাঁধটা জোয়ালের ভৈসের ঘাড়ের মত ঘাট পড়ে শক্ত হয়ে গেছে। মাংসগুলো থেঁতলে কাঠ হয়ে গেছে। আর বলতে হল না। ওরাই দ্বারিককে উঠিয়ে নিল। তিন নম্বর ঘাটে নামিয়ে দেবে।

নৌকা ছাড়ার আগে কালুয়া কোথা থেকে নৌকার কাছে ছুটে এল। পার থেকে কালুয়া দ্বারিককে দেখেছিল। দুপুরবেলায় সূর্য-বেড়িয়ার একটা নৌকায় গোসাবা এসেছিল সে। কালুয়ার সমস্ত গা ভাটার এঁটেল কাদায় মাখান। নৌকার অন্যান্য লোক হৈ হৈ করে উঠে। নৌকায় লোকেরই জায়গা হচ্ছে না তায় আবার একটা কাদা মাখা কুকুর। দ্বারিক কালুয়ার সামনের পা দুটো ধরে আচ্ছা করে জলে চুবাল। কুঁই কুঁই করে কাঁদছে কালুয়া। দুবার গা ঝাড়া দিয়ে নৌকায় উঠল। দ্বারিকের পাশে বসে ওর গায়ে মুখ ঘষে। চরণ আর সোনামনির মত কালুয়াও দ্বারিকের ফিরে আসার দিন গুণছিল।

নৌকার পাটাতনে তখন আলাপ-সালাপ জমেছে। হাটের জিনিস-পত্রের দামের কথা, চাষ আবাদের কথা, বৃষ্টি-বাদলের কথা। এ-কথায় ও-কথায় অনেক কথাই আসছে। একটা বাবু মত লোক প্রশ্ন করছে; বোধ হয় সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম এসেছে। তাই নানারকম প্রশ্ন। কচু-খালির তালুকদারদের শালা হয় বটে। একটা মুরুব্বি গোছের লোক তখন বলছে; সুন্দরবনের বাঘ বড় বিলাসী বাবু, পাছায় বাতাস না লাগলে থেমে পড়ে। কথা শুনে বাবুমশাই মুচকি মুচকি হাসছে। অর্থাৎ লোকটা বলতে চাইছে যেদিকে বাতাস বয় সেদিকে বাঘ চলে। এরকম হরেক খোশগল্প।

গোসাবার ঘাট অনেক দূরে ফেলে নৌকাটা এখন মাঝ বিদ্যাধরীতে আড়াআড়ি ভাবে চলেছে। দ্বারিক দু-হাঁটুর ওপর হাত দুটো ভাঁজ করে

মাথাটা গুঁজে গুম মেরে বসে। নেশায় কারও মুখে কথা ফোটায়, কেউ কেউ চুপ মেরে যায়। কালুয়া দ্বারিকের পাশে বসে চোখ বুজে ঝিমাচ্ছে। একটা লোক বলল; তুলা ভাই তিন নম্বর ঘাটে নৌকা লাগিও, একজনা আছে।

তিন নম্বর ঘাটে নৌকা থামল। দ্বারিক আর কালুয়া নৌকা থেকে নেমে গাংভেড়িতে উঠে এল। দ্বারিক দেখল সুর্যবেড়িয়ার আকাশে একটি মাত্র তারা উঠেছে।

তিন নম্বর ঘাটের কাছে অনেকগুলো গহ্বর এঁকেবেঁকে জ্যামিতির রেখার মত বিদ্যাধরীতে এসে মিশেছে। জোয়ারে সেগুলোতে জল খেলে। ভাটায় শূন্য হয়ে যায়। তখন গহ্বরগুলো আরও গভীর ও ভয়ঙ্কর দেখায়। বিদ্যাধরীতে জোয়ার এল। গহ্বরগুলোতে অল্প অল্প জল ঢুকছে। জলের মৃদু শব্দ শুনতে পেল দ্বারিক, অন্ধকার গহ্বর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে। যেন খুব চুপি চুপি শব্দটা কোন কথা দ্বারিককে জানাতে চায়।

দ্বারিকের মনে একটা ভাবনা সজারুর মত শব্দ তুলে আসছে যাচ্ছে। মনের কোথায় যেন একটা খোঁচা লেগেছে। সেখান থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। সে রক্তে সারা মন ভিজে গেল। রক্ত হচ্ছে উঁচুদরের মদ। মনের রক্ত যখন ঝরে তখন হাড়িয়ার চেয়ে নেশা লাগে বেশী।

মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছে দ্বারিক আর কালুয়া। মাথার উপর দ্বারিকের সাথে সাথে চলেছে সন্ধ্যা তারাটি। তিনে এসে থামল সর্দার পল্লীর বাঁকে গইবাক্সের সামনের গাংভেড়িতে। দ্বারিক সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে। একটা কিছুর ধাক্কায়। বাইরের থেকে নয়। ভেতর থেকে।

মাথার উপর নেমে এসেছে অনন্ত রাত্রি; রাত্রির আকাশে তারার ক্ষীণ আলো। সর্দার পল্লীতে নেমেছে ঘুমের দেবতা, দ্বারিকের মন ছেয়েছে নৈতিক বিষণ্ণতায়।

নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়াল তার ভিটের দাওয়ায়। কালুয়া সেই মুহূর্তে ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। এই চেঁচিয়ে ওঠাটা যেন কালুয়ার ষড়যন্ত্র, চুপি চুপি দ্বারিককে সে ভিটায় ঢুকতে দেবে না।

স্বপ্নের ভেতর রূপচাঁদের সামনে হলুদ ডোরাকাটা শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে ছিল সোনামনি। ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকান। মিষ্টি মিষ্টি হাসছিল সে, —রূপচাঁদও···। কালুয়ার চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল সোনামনির। বাইরে উঠে এসে দেখল অন্ধকারে পিতাজী দাঁড়িয়ে আছে হাতের বর্শাটায় ভর দিয়ে। কালুয়াটা সমানে চেঁচাচ্ছে আকাশের দিকে মুখ তুলে। দ্বারিক টলছিল। পিতাজীর হাত ধরে দাওয়ায় এনে বসাল সোনামনি। এক মাস পর পিতাজী ঘরে ফিরেছে নেশা করে। ভীষণ কান্না পেল সোনামনির। তারও ইচ্ছে হল কালুয়ার মত গলা ছেড়ে কাঁদে। আসলে কালুয়া চেঁচাচ্ছে না, গলা ছেড়ে কাঁদছে। কান্নাটা চেপে সোনামনি পুঁটলিটা খুলল। দেখল তাতে গোটা পাঁচেক রূপেয়া আর কিছু চুটি অর্থাৎ বিড়ি। সোনামনির মনে হল ঘুমের ভেতর দেখা রূপচাঁদের হাসি হাসি ঠোঁটটা খুব ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, সে বিকট হাসছে। সোনামনির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, পিতাজীর মুখটা ভিজে আকাশের মত থমথমে আর ফ্যাকাশে।

শাড়ী নেই, পিরান নেই, বেলোয়ারী কাচের চুড়ি নেই। একমাসের কামানো টাকার সিকিটাও নেই। পুঁটলি ফাঁকা। পুঁটলিতে বেঁধে এনেছে পিতাজী কিছু চুটি। সারা দেহে আর মনে মরিচঝাঁপির অন্ধকারের কামোট ঢেউএর হুটোপুটির ক্লান্তি আর চোখে গোসাবার ভাটিখানার নেশা।

শাপলা-শালুকে জিরিয়ে গেছে পেট। চাল আনে নি। কয়েক দিনের চালের টাকাও সঙ্গে আনে নি। পিতাজীর একটা হাত ধরে ঝাঁকি মারে সোনামনি। কিন্তু দ্বারিক গুম মেরেই বসে থাকে। মুখ খোলে না। কালুয়াটা ঘড় ঘড় শব্দ করে। সোনামনির সাথে কালুয়াও যোগ দিয়েছে।

সেদিন গড়খাইয়ে চরণ মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল প্রথম খুটে পার্শে বা কই উঠলে দিন পাঁচ সাত বাদে পিতাজী আসবেই আসবে। কিন্তু সেদিন আর মাছধরাই হয় নি তার। ফড়িঙটার মৃত্যু কেমন তাকে উন্মনা করে দিয়েছিল। মাছধরার পরিবর্তে বাড়ী ফিরে সেদিন সে ভাবতে বসেছিল। যা আগে কোন দিন ভাবে নি সে রকম সব অদ্ভুত

অদ্ভুত অবাক কল্পনা। আজ ঘুমের ভেতর একটা পার্শে উঁকি দিচ্ছে। নীল চোখ মেলে পার্শেটা টোপের কাছে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু খুট দিচ্ছে না। ডাঙ ছেড়ে চরণ ঝাঁপ দিল গহীন কালো জলে। কালো জল তোলপাড় হল। পার্শেটার পেছন পেছন ডুবসাঁতার কেটে চরণ মাছটাকে ধরবার অনেক চেষ্টা করল। পার্শেটার নীল চোখের আকর্ষণে চরণ অনেকক্ষণ ডুবসাঁতার কাটল, কিন্তু মাছটাকে ধরা গেল না। বেহদা হল তার এই পরিশ্রম। চরণ বুড়বুড়ি কেটে জলের উপর ভেসে উঠল। আর ঠিক সেই সময় ওর ঘুম ভেঙেছে।

দেখল পাশে সোনামনি নেই। পা টিপে টিপে সে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। দেখে অন্ধকার দাওয়ায় পিতাজী, সোনামনি আর কালুয়ায় চুপচাপ বসে। চরণের বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। এক সময় খোলা পুঁটলিটার দিকে নজর যায়। কয়েকটা চুটি আর টাকায় খুচরোয় মিলিয়ে কিছু রূপেয়া।

পিরান নেই, শাড়ী নেই, বেলেয়ারী কাচের চুড়ি নেই।

সন্ধ্যায় চরণ চারটি ভাতের জন্য কেঁদেছে; তখন সোনামনি বলেছে পিতাজী ফিরে এলে ভাত আর পিরান দুই-ই জুটবে। পিতাজী ফিরে এল। কিন্তু সংগে কিছু আসে নি। চরণ ধীরে ধীরে সোনামনির গা ঘেঁসে গিয়ে বসল। আজ পিতাজীকে দেখে কেমন ভয় ভয় করছে তার। এমন কোন দিন হয় নি। কেমন দূর দূর মনে হচ্ছে পিতাজীকে। যেন পিতাজী বহু বছর পর হঠাৎ ফিরে এল। অথচ চরণ যেন পিতাজীকে চিনতে পারছে না। সেই না চেনার ভয় ও বেদনায় চরণ কুঁকড়ে আসল। অন্ধকারে পিতাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তার সেই রকম অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনার কথা মনে এল। যেমন সে ফড়িঙটার মৃত্যুর পর সারা বিকেল গাংভেড়িতে ঘুরে ঘুরে করেছিল।

এক সময়ে চরণ সোনামনির হাতে একটা চিমটি কাটে। কি যেন ফিস ফিস সোনামনির কানে বলতে চায় চরণ। তখন দুজনাই তাড়াতাড়ি করে কেমন ভয় পেয়ে গিয়ে পিতাজীকে দেখছে। দ্বারিক পাষাণের মত চোখ বুজে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে। যেমন গুমোট দুপুরে গাছের পাতা তেমন ওর ঠোঁট থেকে চোখ, মুখের প্রতিটি রেখা স্থির হয়ে আছে নড়ছে না।

॥ পনের ॥

নেশা কেটেছিল পরদিন সকালে। দ্বারিক তার আপন মনটা আবার ফিরে পেয়েছিল। নৈতিক বিষন্নতা আরও গাঢ় হয়ে ঢেউ তুলেছিল মনে। ছুটে গিয়েছিল ভোর না হতেই মহাজনের ঘরে। দরিয়ায় আবার নৌকা ভাসাবে দ্বারিক। দিন গেলে এক রূপেয়ার রোজগারের বন্দোবস্ত হবে। তবুও দুটো চাল ঘরে আসবে। ছেলে মেয়ে দুটো খেয়ে বাঁচবে। কিন্তু যেমন গেল তেমন ফিরে আসতে হয়েছে। কসুর মাফ করে নি কেউই। মরিচঝাঁপির অন্ধকার নদীও না, সূর্যবেড়িয়ার নৌকার মহাজনও না।

খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে সেই কথাটাই ভাবছে দ্বারিক সর্দার। মরিচ-ঝাঁপির রোজগারের টাকা ফুঁকে গেছে। নৌকাটাও হাতছাড়া হয়ে গেল; নৌকা নিয়েছে অন্য এক মাঝি। মাঠেও সে আর ফিরতে পারবে না, রতিকান্ত শ্যামলের কাছে গিয়ে বলতে পারবে না জনমজুর হয়ে মাঠের কাজে লাগতে সে আর গররাজি নয়। কথাটা মনে হতেই পিঠটান করে বসল দ্বারিক। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল; এমন কথা মনে ঠাঁই পেয়েছে বলে। তাই চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়াবার জন্য একটা বিড়ি ধরাল।

চরণ ও সোনামনি কেউই ঘরে নেই। শুধু কালুয়াটা কলাগাছতলায় শুয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে; মুনিয়াটা হয়ত এখন কোন চৌকায় কাদায় ডুবে আছে। সন্ধ্যা লাগলে সোনামনি ওটাকে তাড়িয়ে ঘরে আনবে। সন্ধ্যা হতেও আর বেশী বাকী নেই। আর ছটাক বেলা আছে অন্ধকার হতে।

গাংভেড়িতে রতিকান্ত শ্যামলের পরিচিত ছাতাটা দেখা যাচ্ছে। দ্বারিকদের ঘরের দিকেই ওটা নেমে আসছে। রতিকান্ত সেই দুপুরে ছাতা নিয়ে বাজার ঘুরতে বের হয়েছিল। এখন বিকেল গিয়ে সন্ধ্যা আসছে। তবুও মাথার উপর ছাতাটা ফুটান। বন্ধ করার খেয়াল নেই। মাঝে মাঝে ছাতার ডাঁটটা ডানহাতের আঙুলের ফাঁকে ঘুরছে।

এটা রতির একরকম অভ্যাস। একগাল হেসে কোমরটা বেঁকিয়ে সে দাঁড়াল দ্বারিকের সামনে। তখন সে ছাতাটা বন্ধ করে তার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময় প্রশ্ন করল—কিরে মরিচঝাঁপি থেকে কবে ফিরলি? তা কেমন চলছে? রতিকান্ত শ্যামলের স্বরে বেশ শ্লেষ ছিল। সে জানে দ্বারিক রোজগারের পয়সা হিসেব করে খরচ করে না। ওর হিসেবটা একদিকে ফুঁকে যায়। তাই যত বারই দ্বারিক ওদের নাকের ডগা দিয়ে বুক ফুলিয়ে মরিচঝাঁপি গেছে ততবার রতি লক্ষ্য করেছে ফিরে এসে দ্বারিক আরও ভেঙ্গে পড়েছে। অভাব যেন আরও শতগুণে বেড়ে গেছে। তাই যতবারই দ্বারিক কোন সফর শেষ করে ফিরে এসেছে ততবারই রতিকান্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। আকার ইংগিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছে ওসব সফরে গিয়ে কোন আখের নেই দ্বারিকদের। জোতদার বা জমিদারের জমিতে ক্ষেত-মজুরের কাজে লাগা তার চেয়ে অনেক ভাল।

এই কোমর বেঁকিয়ে ছাতির ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়ান, রতির চোখের মৃদু হাসি, সবশেষে এই ধরনের প্রশ্ন দ্বারিকের মনে জ্বালা ধরায়। রতি-কান্ত শ্যামলের উপস্থিতি দ্বারিকের কাছে বিরক্তিকর তারপর এই গায়ে পড়া পিরিত। দ্বারিক গলাটা ঝেড়ে বেশ টেনে টেনে বলে বহুৎ আচ্ছা। বলার সময় দ্বারিকের চোখে মুখে একটা দীপ্তি ফোটে। বেশ প্রত্যয়ের সাথে কথাগুলো বলে সে। আর দ্বারিক জানে রতিকান্ত শ্যামল যতবড়ই শেয়ানা হোক, সে কোন কথায় জোর দিয়ে বললে রতির মুখে আর কোন তেমন কথা ফোটে না। বেশ, বেশ ভাল, বাল-বাচ্ছা নিয়ে ভাল থাকলেই ভাল, চলি আজকের মত, রতিকান্ত শ্যামল কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে রওনা দেয়। আবার শকারাম সর্দারের ওখানে একবার ঢুঁ দিতে হবে। গাংভেড়িতে উঠে আসে রতিকান্ত।

রতিকান্ত শ্যামল। রাঘব ডিঙ্গালের নায়েব। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এপাড়া সেপাড়া এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে অক্লান্ত। শকারামসর্দারের সাথে মুলাকাত করে ঘরে ফিরছে এখন। ঘরে তার অষ্টাদশী বউ কমলা। পূর্ণগর্ভা সে, শিগগীরই ছেলে হবে। রতিকান্ত শ্যামল তাই শকরাম সর্দারের বউএর কোলে দেড়মাসের বাচ্ছাটাকে অমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এমন করে কোন বাল-বাচ্ছাকে সে এর আগে দেখে নি। না বাচ্চা—না তার মাকে।

হোঁচট খায় রতিকান্ত শ্যামল। সামলে নিয়ে আবার চলতে শুরু করে। আসলে চিন্তাটা ওর মনে সেই মুহূর্তে হোঁচট খেয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে ভাবনা সুন্দরীখালে একটা হলহলে সাপের মত এঁকেবেঁকে বাঁকা স্রোত জাগিয়ে মিলিয়ে গেল। তখন রতি তার ঘরের দরজায় পৌঁছে গেছে।

উঠানের নির্জন অন্ধকারে রতিকান্ত দেখল সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে কমলা তুলসী তলায় প্রণাম করছে। কোন সাড়া না জাগিয়ে রতি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল প্রণাম শেষে কমলা প্রদীপ হাতে করে ঘরে ঢুকছে। প্রদীপের কাঁপা আলোয় কমলার মুখটা লাবণ্যে ঢল ঢল। কেমন যেন মায়া মাখান। যা হৃদয় স্পর্শ করে। রতিকান্তও সেই মুহূর্তে মুগ্ধ হয়ে কমলার পাশে এসে দাঁড়াল। কমলার একটি হাত রতি নিজের হাতে তুলে নেয়। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। হাতে ছোট একটা চাপ দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কমলা ঘরে ঢুকে যায়। রতিকান্ত দাঁড়িয়ে থাকে। কমলার এই পালিয়ে বেড়ান ভাব কেমন যেন তার মনে একটা ধোঁকা জাগিয়ে দেয়। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগের ভাবনাটা ফিরে পেল। সুন্দরীখালে হলহলে সাপের মত যেটা বাঁকা স্রোত তোলে। রতির মুখটা কেমন বিষন্ন, করুণ, বেদনা বিধুর মনে হল।

যে পথ দিয়ে রতিকান্ত শ্যামল চলে গেল সেই পথ দিয়ে ঢুকল পাঠান খালির কুমীর-কচ্ছপ ঘাটের বাসিন্দা মুশকিল-আসান বুড়ো রসুল। গায়ে কালো এক আলখাল্লা চাপান তাতে রঙ বেরঙের তালি। পা পর্যন্ত সে আলখাল্লা ঝুলে পড়েছে। মাথার উপর ভাঙ্গা তোবড়ান ছাতি। ছাতির কাপড়টাও আলখাল্লার মত হরেক তালি জোড়া। কাপড় ভেদ করে দুই একটা লোহার শিক আকাশের দিকে উঁকি মারছে। ভাঙ্গা ছাতির তলায় আসান প্রদীপ হাতে রসুল বুড়ো কুঁজো হয়ে কখনও ঠায়ে কখনও দুলে পথ চলে। হাওয়ার হাত থেকে প্রদীপের শিখাটাকে বাঁচায় ভাঙ্গা ছাতির আড়াল করে। তবুও প্রবল বাতাসে মাঝে মাঝে প্রদীপটা নিভে আসতে চায়; কিন্তু রসুল বুড়ো তার দীর্ঘ অভ্যাসের রপ্ত কায়দায় প্রদীপকে নিভতে দেয়. না জাগিয়ে রাখে। ছাতির আড়ালে; হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের আড়ালে। সারা মুখে ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঢনেকটা

তামাটে আর পাক খাওয়া। সামনের দিকে দেহটা ঝুঁকে পড়েছে। সূর্যবেড়িয়ার—ডিঙ্গাল—সিংহজানাঘেরির বাসিন্দারা নিজেদের ভেতর বলা-বলি করে, ওটুকু ওর কায়দা, এই অসম্ভবরকমের ঝুঁকেপড়া আর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চলা। আজকে ওর বয়স এমন কিছু হয় নি। লোকের কাছে বয়সের সুযোগ নিয়ে ঘনিষ্ঠ শ্রদ্ধা বাগানর চেষ্টা। কেউ বলে আসলে রসুল বুড়ো মুসলমানই নয়। কেউ বলে মুস্কিল-আসান না ছাই। সব ধূর্তামো। কিন্তু সঠিক খবরটা কেউ বলতে পারে না। যারা বলে তারাও যে কথাগুলো খুব বিশ্বাস করে বলে তেমন নয়। তবে হাটে বাজারে খোশ গল্পের আসরে বসে যখন আলোচনা হয় তখন ওরা কথাগুলো বলে আরও পাঁচটি আলোচনার সময় যে রকম বলে থাকে। লোকটাকে ঘিরে একটা উড়ো কিংবদন্তী সারা দ্বীপে ছড়িয়ে আছে। সেটা এক এক সময় এক এক রঙ ধরে। কিন্তু চাষাভুষো সর্দার গৃহীরা সবাই দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কপালে আসান টিপ পরে। যার যা খুশী ওর ঝোলায় ফেলে দেয়; সুন্দর মিষ্টি হেসে রসুল বুড়ো টিপ পরিয়ে দেয়। সেই হাসির ভিতরই যেন সমস্ত মুস্কিলের আসানের প্রতিশ্রুতি থাকে। এই হাসিটুকুই তখন সবার কাছে ভাল লাগে।

অনেকদিন পর বেরিয়েছে রসুল বুড়ো। আবার অনেক দিন পর হাতে ছিল ভাঙ্গা ছাতি আর তেলের প্রদীপ। কাঁধে ঝোলান ওর ঝোলাটা, গায়ে চাপান হরেক রঙ-বেরঙের তালিমারা আলখাল্লা পা পর্যন্ত ঝুলান। আবার শ্রাবণের ঘোর বর্ষায় ও একদিনও বেরোতে পারে নি। পাঠানখালির কুমীর কচ্ছপ ঘাটের ওর ছোট্ট চালাটায় বসে বসে সারা বেলা, সারা সন্ধ্যা ঝিঁঝির ডাক ব্যাঙের ডাক, জোয়ার ভাটার শব্দ শুনেছে। আর ভূত-প্রেত, জিন-দত্যি-দানবের গল্পে সন্ধ্যাবেলাটা ভরে দিয়েছে তার দশ বছরের বেটা রহমতএর শিশুমন। বাপ বেটায় বসে বসে বর্ষাকালটা উপভোগ করেছে সন্ধ্যার গল্পে। দশবছরের রহমত মাঝে মাঝে চোখ তুলে বলেছে তারপর, পরীটার সাথে তুমি দানোটার সাদি দিয়ে দিলে? গলা কাঁপিয়ে হেসেছে রসুল বুড়ো। সেই হাসি টেনে টেনে এক সময় বলেছে হ্যাঁ, বেটা, হ্যাঁ, সব মন্ত্র-তন্ত্রের গুণে ফকিররাজ তোর এই বাপজান সব করতে পারে, ঘোড়াকে গণ্ডার বানাতে, চিড়িয়াকে চুয়া

বানাতে। রহমতএর ঠোঁট দুটো আরও হাঁ হয়ে গেছে সন্ধ্যার অন্ধকারে, বাপজানের ভেল্কীর গল্প শুনতে শুনতে। সেই সাথে সুর মিলিয়েছে ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক।

ভাদ্রের মাঝামাঝি বর্ষাটা একটু থেমেছে। তাই বেরিয়েছে রসুল বুড়ো। তামাম দ্বীপের আসানের দায়িত্ব তার। তাই না নতুন পলতে পাকিয়ে আসান দ্বীপ জেলেছে।

গাংভেড়ি থেকে নেমে কদবেল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সে ডাক ছাড়ে মু—স্কি—ল আ—সা—ন। গলাটা বেশ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। সে শব্দ বাতাসে অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায়। এই আসানের আওয়াজ সর্দার পল্লীর সবার পরিচিত। কিন্তু সর্দার শিশুরা ওর কিম্ভূত আলখাল্লা, তামাটে দাড়ি, কুঁচকান চোখ, সব মিলিয়ে ভয় পায়। পালিয়ে গিয়ে বড়দের আড়ালে দাঁড়ায়। কিন্তু মেয়ে মরদেরা হাতে দুই একটা তামার পয়সা নিয়ে কুঁড়ে থেকে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। রসুলের হাতে টিপ পরবে বলে। ফসলে পোকা লাগবে না, অজন্মা হবে না, বান ডাকবে না ঘেরি উপছিয়ে। মজুরী ভাল জুটবে, মড়ক লাগবে না, এইসব কত রকমের বিশ্বাসে। ঠোঁট' আর চোখে সেই মিষ্টি হাসি টেনে রসুল বুড়ো আসানের টিপ সবার কপালে পরিয়ে দেবে, প্রদীপটা কপালে ঠেকিয়ে খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করবে সবার নিরাপদ জীবনের জন্য, সমস্ত মুস্কিলের আসানের জন্য। তখন বিড় বিড় কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করবে। তারপর গলা ওঠা ভাঙ্গা ছাতির তলায় ঝুঁকে পড়ে আবার অন্য এক দাওয়ায় গিয়ে পৌঁছাবে। এই একজনার কাছ থেকে আরেকজনের কাছে পৌঁছানই ওর কাজ।

সর্দার পল্লীর অন্য সব শিশুরা রসুল বুড়োকে ডরালেও চরণের তেমন কোন ভয়ডর নেই। বরং উল্টোটাই। রসুলের সাথে ওর কেমন যেন একটা দোস্তি গড়ে উঠেছে, কেমন ভাবে তা সে নিজেও জানে না। তবে অস্পষ্ট মনে পড়ে। প্রথম প্রথম চরণ মুস্কিল আসানের ডাক শুনলেই ঘরে পালিয়েছে। সোনামনির আঁচলের ঢাকনায় মুখ ঢুকিয়ে চোখ পিট পিট করে দেখেছে রসুল বুড়োকে। অদ্ভুত হেসে লোকটা দিদির কপালে টিপ পরিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে দ্বারিকও টিপ পরেছে। প্রদীপের

কাঁপা আলোয় রসুলের হাসি চরণের মনে একটা আনন্দ বিস্ময় জাগিয়েছে। একদিন সোনামনি ওকে হাত ধরে টেনে রসুল বুড়োর মুখোমুখি খাড়া করিয়ে দিল। ছোঁড়াটার সব মুস্কিল যাতে আসান হয়ে যায়। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল চরণের। গলা শুকিয়ে এসেছিল ; ভাল করে তাকাতে পারছিল না। পাছে আরও ভয় পেয়ে যায় ; কিন্তু ঐ শেষ ভয়। ভয় ভেঙ্গে গেল। এখন সে নিজে নিজেই রসুলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কপালে ফোঁটা নেয়। এখন ভয় থেকে দোস্তি জমে উঠেছে। রীতিমত দোস্তি যাকে বলে।

সন্ধ্যা হতেই ঘরে ফিরে এসেছে চরণ। অনেক সময় অপেক্ষার পর মুস্কিল আসানের প্রদীপটা অনেক দূরের গাংভেড়িতে ঠাওর করতে পেরে ভারী আনন্দ হল। অনেক দিন পর চরণ আবার গাংভেড়িতে প্রদীপটা দেখতে পেল যা সে রোজ রোজ দেখতে চেয়েছে কিন্তু পায় নি। দাওয়া ছেড়ে গাংভেড়ির দিকে এগিয়ে গেল চরণ রসুল বুড়োকে এগিয়ে আনতে। ওর সাথে চলতে চরণের কেমন যেন একটা গর্ববোধ হয়। বুক ফুলিয়ে রসুল বুড়োর সাথে হাঁটে চরণ। তাই কদবেল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে যখন রসুল হাঁকল মু-স্কি-ল আ-সা-ন তখন চরণ আর দাওয়ায় বসে থাকতে পারল না। সোজা গিয়ে রসুল ফকিরের সামনে দাঁড়াল। সেই মিষ্টি হেসে মাথায় একটা হাত বুলিয়ে দিয়ে রসুল-ফকির সর্দার পল্লীর প্রথম ফোঁটা পরাল চরণের কপালে। চরণ তখন খুব খুশী। রসুল বুড়োর পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করে চরণ।

মুস্কিল আসানের সাড়া পেয়ে দুই একজন মেয়ে মরদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফোঁটা নেবে তারা। রসুল বুড়ো ঘরে ঘরে থামল। চরণ পাশে পাশেই যাচ্ছে। শেষে রসুল বুড়োকে নিয়ে চরণ এসে থামল ওদের নিজেদের দাওয়ার সামনে। কালুয়াও কোথা থেকে এসে রসুল বুড়ার সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগে। আগে আগে কালুয়া রসুল বুড়োকে দেখলে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসত। যতক্ষণ রসুল সর্দার পল্লী থেকে বের না হত ততক্ষণ তেড়ে তেড়ে তার পিছু যেত। কেউ খেদাবার চেষ্টা করলেও পারত না। সেই দেখে শুকরাম সর্দার বলত যাবে কুত্তাটা একদিন বিল্লি হয়ে। কিন্তু কালুয়াকে বিল্লি আর হতে

হয় নি। দিব্যি কুত্তাই আছে। মাঝখান থেকে মুস্কিল আসানের সাথে চরণের মত ওরও ভাব হয়ে গেছে। আজকাল কালুয়া রসুল বুড়োর পিছু পিছু যায় কিন্তু চেঁচায় না। গাংভেড়ির অন্ধকার রাত্রে রসুল ফকিরকে অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে কালুয়া।

সোনামনি মুস্কিল আসানের ফোঁটা পরছে কপালে। ফোঁটা নিতে নিতে কি সব মনে মনে যে মানত করছে যেন। সোনামনি আজই বিকেলে ভেবেছে পিতাজী ফিরে আসার আগে. মুস্কিল আসানের কাছে যদি ফোঁটা পরা যেত তাহলে শাড়ি পিরাণ চাই কি বেলেয়ারী কাচের চুড়ি সবই আসত। এখন সে আর সে সব ভাবতে উৎসাহ বোধ করল না। অন্য কোন ভাবনায় ডুব দিল সে, যা ভাবতে মনটা কেমন যেন একটা মিষ্টি অনুভূতিতে ভরপুর হয়ে ওঠে। বুকটা অযথা ঢিপ ঢিপ করে?

অন্যান্য দিনের মত দ্বারিক আজ আর ফোঁটা নিল না। শুধু অন্ধকারে সে দৃষ্টি মেলে ধরল রসুল ফকিরের দিকে। আসান দীপের আলোয় সে মুখে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করল দ্বারিক। এক সময় সোনামনির মুখের দিকে তাকাল সে, একরাশ মেঘের মত থমথমে সে মুখ। কালো, খুব কালো। দ্বারিক নড়ে চড়ে বসে। সাত জেলিয়ায় সিংজীর ভাটিখানার কথা মনে হল তার। গোসাবায় পিড়ির ভাটিখানার কথা মনে হল তার, সব রূপেয়া যদি ফুঁকে না আসত সে···সবখানি ভাবতে পারল না সে। আবার নৈতিক বিষন্নতা ওর মনে ঢেউ তুলল। কিন্তু না, বেহুঁস হয়ে থাকা যায়, বিমর্ষ হয়ে থাকা, গুমটি নিয়ে থাকা ওর পোষায় না। ওর মন কতগুলো জিনিস চায়, ওর জীবনে কিছু ভালো মন্দের সুখ সুবিধার প্রবণতা আছে। অথচ সে একথাও জানে, ওর কিছু ভাল লাগা বা মন্দ লাগায় ওর আপন জনে কষ্ট পায়। চরণটার, সোনামনিটার হাসি উবে যায়, কিন্তু তার করবার কিছু থাকে না। বস্তুতঃ সে নিজের কাছেই নিরূপায়। সাত জেলিয়ার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। মদদের সাথে খানিকটা হাড়িয়ার দরকার ছিল বৈকি। কিন্তু গোসাবায় জাহাজ ঘাটে নেমেই পিড়ীর ভাটিখানায় দৌড়াবার কি দরকার ছিল? প্রশ্নটা তার মনে হল, এর আগেও অনেকবার মনে হয়েছে। এমন কি হাটের ভিড় ঠেলে শচীন পিড়ীর দরজায় যেতে যেতেও একই কথা ভেবেছে সে। কিন্তু সে নিজেকে রাখতে

পারে নি। অনিবার্য ভাবেই সব কিছু ঘটেছে, সে তখন নিমিত্ত মাত্র। জীবনে অনেক ঘটনার ওপরই মানুষের হাত নেই। তা সে যত বড়ই ওস্তাদ হোক না কেন। কথাগুলো ভাবল দ্বারিক, আর একবার অন্ধকারে মেয়েটার মুখটা ঠাওর করার চেষ্টা করল। তখন রসুল বুড়ো কিছুদূর এগিয়ে ডাক ছেড়েছে—মু-স্কি—ল—আ-সা—ন।

দ্বারিক উঠল; দোস্ত শুকরামের ঘরে যাবে সে। সেখানে গিয়ে রাত ভর ভেটকী ধরার মতলব পেশ করবে সে দোস্তের কাছে। কদিন থেকেই মতলবটা ওর মাথায় ঘুর ঘুর করছে। দুই দোস্ত মিলে সলা-পরামর্শ করবে এখন। একটা শুভদিন ঠিক করে নেবে দুজনে আলোচনা করে।

॥ ঘোল ॥

দিন সাতেক ধরে দুই দোস্ত রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল চাঁদটার হালচাল লক্ষ্য রাখল। চাঁদটা ক্রমশঃ ফুলে ফেঁপে উঠছে। একদিন সারা আকাশ জুড়ে ওরা চাঁদটাকে হাসতে দেখল। হাজার জোনাকির মত দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায় আলো ছড়াচ্ছে। এই সাতদিন ধরে ওরা দেখল দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার আকাশে হাজার নক্ষত্রকে মরে যেতে; আর দুই একটা বিশেষ নক্ষত্রকে ফুটে উঠতে।

পূর্ণিমার রাত্রি; তামাম সুন্দরবনের নোনা সমুদ্রে আজ জোয়ারের বেলা। এই জোয়ার এসেছে পুরন্দরের মুখ পেরিয়ে মাতলা-বাসন্তীতে এসেছে গোসাবার, রাঙা বেলিয়ার কচুখালির নদীগুলিতে, বিদ্যাধরী আর পাঠানখালিতে। পূর্ণিমার রাত্রিতে নদীগুলো যখন উপছে পড়ছে, ঘোগগুলো যখন ফাঁকে ফোকরে গা ঢাকা দিয়েছে তেমন ভরা জোয়ারের রাত্রিতেই ভেটকী ধরার সুখ আছে। সমুদ্র থেকে কত মাছ আসল নদীতে নদীতে পার্শে নোনা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, কই মাগুর, ঘোলা' পাঙাশ, চকবাটা আর ভেটকী। মাছগুলিকে ফিরে যেতে দেওয়া চলে না। ফেরার কথাও ওদের সবার নসীবে লেখা নেই। দ্বারিক আর দোস্ত শুকরামের বঁড়শিতে দুই একটা ধরা পড়লে সমুদ্রের কোন ক্ষতি নেই; মাছগুলির জীবনও সার্থক হবে। দুই দোস্তে অন্তত তাই মনে করে। বিশেষ করে এমন দিনে দুই একটা ভেটকী তাদের ধরতেই হবে।

বেলতলীর হাট থেকে পাক্কা দুই হাঁড়া হাড়িয়া খেয়ে ফিরেছে দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম। বেশ রাত করে এসেছে ডাঙ আর টোপ নিয়ে। গাংভেড়িতে নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে মুখোমুখি বসেছে ওরা দুজন। হাড়িয়ার নেশায় দুজনার মেজাজই এখন বেশ শরিফ। চোখগুলো আধবোজা আর ঢুলু ঢুলু। চাঁদের আলো আর গাংভেড়ির মিঠে হাওয়া ঘুম এনে দিচ্ছে চোখে। আধো ঘুমের ভেতরই ওরা জানবে কখন

ভেটকীটা এসে ওদের টোপে খুট দিয়ে যায়। ঠিক জানবে। ঘুমোতে ঘুমোতেই। যেমন প্রতিবারই জেনে এসেছে।

সমুদ্র থেকে একঝাঁক ভেটকী বেরিয়েছে জোয়ারের সাথে সাথে। একজল থেকে আর এক জলে সফর দেবে ওরা। সমুদ্র পোকার বদলে গাঙের পোকা খাবে। অনেক নদী খাল, হাজার স্রোত, হরেক স্বাদের জল পার হয়ে ওরা সুন্দরবনের নোনাগাঙে ঢুকবে। ঝাঁকের ভেতর একসাথে যারা বেরিয়েছিল তাদের ভেতর এখন অনেকেই একজন আরেক-জনকে হারিয়ে ফেলেছে। কেউ গেল ইছামতীতে, কেউ এল বিদ্যাধরীতে কেউ রয়ে গেল মাতলা, বাসন্তীতে। আসতে ওদের হবেই। সফরের পথে ওদের দেখা হবে কামোটের সাথে; তাড়া খেয়ে বাঁক ঘুরবে ওরা। আবার সবাই এসে পাশাপাশি চলতে শুরু করবে। আবার কখন কখনও একদল ভেটকীর সাথে একদল চকবাটার দেখা হয়ে যাবে। কিংবা বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোন এক ভেটকী বন্ধুর সাথে। সবাই মিলে খুশীতে মেতে উঠবে। এসব কত কি ঘটবে ওদের সফরের পথে ওদের ভেতর নিশ্চয়ই দুই একজন দুঃসাহসী ভেটকী দ্বারিক আর দোস্ত শুকরামের টোপ চেখে দেখবে না এমন হতেই পারে না।

দোস্ত শুকরাম আর দ্বারিক মুখোমুখি বসে এরকম অনেক আলোচনায় মশগুল। চিংড়ীর টোপ এনেছে ওরা। মোটা স্থতার মোটা ডাঙ। ইয়া বড় বঁড়শি। বঁড়শির মুখে চিংড়ীর টোপ গাথা। চিংড়ীটা অল্প অল্প গন্ধ ছড়াবে জলে, সেই গন্ধেই ভেটকী আকৃষ্ট হবে। ঝাঁক থেকে দুই একটা বেরিয়ে আসবে। এখনও ওরা গাংভেড়িতে ডাঙ পুতে দেয় নি। পুতে দেবার নানারকম কল্পনা চলছে। যেরকম প্রত্যেকবারই ভেটকী ধরার সময় হয়ে থাকে। শক্ত করে ডাঙ পুতে দিয়ে জায়গামত টোপ ছুঁড়ে দুই দোস্ত শুয়ে পড়বে গাংভেড়িতে। সারারাত্রি ধরে নির্জন গাংভেড়িতে পড়ে থাকবে দুই দোস্তে। মাথার উপর থাকবে আকাশ আর ভেটকীর আঁশের মত আস্ত চাঁদ। মাঝে মাঝে ওরা ডাঙের স্থতো পরখ করে দেখবে কোন শিকার আটকাল কি না। ধরা না পড়লে আবার যে যার মত এসে শুয়ে পড়বে।

মরিচঝাঁপির সফর শেষে দুই দোস্তে নিরিবিলিতে বসে বেশীক্ষণ আড্ডা

জমাতে পারে নি। তাছাড়া হাড়িয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে খোশগল্প করার আলাদা একটা মেজাজ আছে। দুজনার কখনও কখনও মুখ ছোটে। কখনও বা একজন বুঁদ হয়ে গেলে আরেকজনা বকে যায়। মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থার কথা হয়। ভাবের লেন দেন হয়। আবার কখন ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনায় পাশাপাশি শুয়ে থেকে চুপচাপ থাকে। কেউ মুখ খোলে না। যখন একজন খোলে তখন আরেকজন বিস্মিত হয়ে যায়। দেখা যায় দুই দোস্তে একই কথা ভাবছে। আশ্চর্য ওদের ভাবনার মিল।

সূর্যবেড়িয়ার সারা মাঠ প্রান্তরে সবুজ পান্নার হাট বসেছে। আশ্বিনের আকাশে নীলাভ উজ্জ্বলতা। ধান গাছের সবুজ সমুদ্রে পূর্ণিমার রূপালী আলোর জোয়ার আজ বান ডেকেছে। গাংভেড়ি থেকে বাতাস দেয়। সে হাওয়ায় সবুজ সমুদ্রের বুকে ডেউ খেলিয়ে যায়। ধানগাছগুলো মাথা নাড়ে। দ্বারিক তাকিয়ে থাকে সে দিকে এক মোহগ্রস্থ দৃষ্টি নিয়ে।

হাড়িয়ার নেশাটা ওদের ভেতর ভেতর ক্লান্ত করছে। তাই দুই দোস্তে গাংভেড়ির পাশাপাশি শুয়ে থাকল। ঘুম আসতে এখন কিছু দেরী। ভেটকী ধরবার সময় গাংভেড়িতে ওদের চোখে যে ঘুম আসে সেটা খুবই হালকা, তেমন গাঢ় নয়। যাতে এক ঘুমেই সকলের মুখ দেখা যায়। তাহলেই সর্বনাশ হবে। মাঝে মাঝে ওদের উঠতে হয়। এটা ওদের অনেক দিনকার অভ্যাস বলা চলে।

দুটো কনুই এক করে দিয়ে গায়ের উপর একটা পাতলা কাপড় বিছিয়ে দ্বারিক সর্দার শুয়েছে। গাংভেড়িতে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সে হাওয়া চোখে মুখে কানে একটা আমেজ আনে। দ্বারিকের দুই চোখের উপর দূরের নীল আকাশে একটা লাল তারা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় কিছুটা মলিন। কিন্তু দ্বারিক এই তারাটিকে চিনতে কোন দিন ভুল করে না। জীবনে অনেকবার সে দেখেছে লাল তারাটা আপন উজ্জ্বলতায় ঠিক ওর দুই চোখের উপর জ্বল জ্বল করবে। এর ব্যতিক্রম নেই। যখন যে অবস্থায় দ্বারিক আকাশের দিকে তাকিয়েছে তখন আকাশ পরিষ্কার থাকলে তারাটিকে আবিষ্কার করতে বেগ পেতে হয় নি। সেটা যেন আপনা আপনিই ধরা দিয়েছে দ্বারিক সর্দারের কাছে। তারাটির পানে

চেয়ে ওর আশ্চর্য লাল দ্যুতিতে মুগ্ধ হয়ে জীবনে অনেক অবস্থায় দ্বারিক কেঁদেছে, হেসেছে, আনন্দে-উৎফুল্লে, বিষাদে নেচে-হেসে ভেঙে পড়েছে। পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর অনেক স্মৃতিই মনে করিয়ে দেয় তারাটা। স্মৃতির হাল্কা মেঘে ভাসলে সবই কেমন মাতোয়ারা মনে হয়। তারাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্বারিক সর্দারেরও একটা মুখ মনে এল। শুধু একটি মাত্রই মুখ। মগজে বা মনে যত ঘুণই ধরুক না কেন, নোনা হাওয়া মনকে যতই কুরে কুরে খাক না কেন সে ষোড়শী মুখ দ্বারিকের মনে চিরদিন সজীব। শাখামুঠি সাপের মত সে মুখ অদ্ভুত লীলায়িত। ডাগর চোখ তার। যে চোখ দ্বারিকের যৌবনে দোলা দিয়েছিল। রঙ ধরিয়েছিল। সে রঙে দ্বারিক তার সমস্ত যৌবনটা রাঙিয়েছে। তাই আজও সে পঞ্চাশ পার হয়ে এসেও তিরিশের মত শক্ত সামর্থ। বিশেষ তারাটি সেই যৌবনের কথাই মনে করিয়ে দেয় তাকে। পুলকে সারা দেহে মনে শিহরণ জাগে। আজকের মত সেদিনও শুকরাম পাশেই ছিল। তাই সে পয়লা দোস্ত।

সেই রোদ ঝলসান ঝিমধরা আরণ্যক দুপুর। বিদ্যাধরীর আর পাঠানখালির জল-কল্লোল স্নায়ুতে স্নায়ুতে উত্তেজনা জাগায়। ঝুপসির ঝোপে পাকা কাঁকরোলের মিঠে গন্ধ বাতাসে ছড়ায়। গেঁওর ডালে বসে একটা পুরুষ শাংখাল ঠোঁট ঘষে। মেয়ে শাংখালটা তার গায়ে গায়ে লেগে। একটা মধু চুসকী সেই থেকে ডেকে চলেছে টুহুঃ,—টু, টুহুঃ—। কালো জঙ্গল সাফ করতে এসেছে দ্বারিক দিন কয়েক হল। একটা গোল গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করছিল সে। এইমাত্র খেয়ে এসেছে। ছাঁটাব কাজ আরম্ভ হবার আগে তাই একটু জিরিয়ে নেওয়া। দোস্ত শুকরাম আশেপাশে কোথায়ও নেই। দ্বারিক অন্ততঃ দেখতে পাচ্ছে না। একবার গলাটা উঁচু করে দেখল সে। তারপর ডাক ছাড়ল। বাঘা বসে বসে একটা আরশোলাকে খাবায় খাবায় শেষ করে আনছে। দ্বারিক সেদিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বাঘাটা ছোট থেকেই শিকারী। একটি আরশোলার সাথে বাঘা থাবা বুলিয়ে যেন পরিহাস ছলে খেলা করছে।

শুকরাম কোথা থেকে ছুটে এল। দ্বারিক কিছু বুঝে উঠবার আগেই ওকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে দোস্ত শুকরাম।

—'কাঁহা' দ্বারিক প্রশ্ন করে। কোন উত্তর দেয় না শুকরাম। শুধু হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে। পেছন পেছন লেজ নাড়তে নাড়তে চলে বাঘা। একটা ঝোপের কাছে এসে থামে শুকরাম। আশেপাশের ঝোপ কে যেন পরিষ্কার করেছে। আকস্মিকতায় আর আনন্দে দ্বারিকের চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে। সবল কাঁধ দুটো নাচে। চোখে হাসি দেখা যায়। বুঝতে পারে এ দোস্ত শুকরামের বাহাদুরি।

—সাড়িকা আণ্ডা। কথা দুটো বলে মুচকি মুচকি হাসে শুকরাম।

সাড়ি অর্থাৎ বনমুরগিতে ডিম পেড়েছে ঝোপের মধ্যে নরম মাটিতে। শুকরাম সর্দার এদিকে একটু ঘুরতে এসেছিল। দেখে ঝোপের মধ্যে একটা সাড়ি বসে। শুকরামের কেমন সন্দেহ হল। সাড়িটাকে তাড়া দিল। বনমুরগিতে তাড়া খেয়ে উড়ে গিয়ে বসল অর্জুনের ডালে। শুকরাম ঝোপ পরিষ্কার করে দেখে বনমুরগির ডিম। অমনি সে ছুটে গিয়েছে দ্বারিকের কাছে। সাড়িটা এখন অর্জুনের ডালে বসে কোঁকর কোঁ—শব্দে গলা ফাটাচ্ছে। তার সাথে পুরুষ সাড়িটা এসে মিলেছে। তার লাল জবার মত ঝুঁটিটা ফুলে ফুলে উঠছে।

কালোজঙ্গলের অনেক বনমুরগী মিলে হয়ত ওখানে ডিম পাড়ে। তা না হলে এত আণ্ডা আসবে কোথা থেকে। ভাবে দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম। বাঘাটাও বুঝতে পেরেছে কি যেন ঘটেছে। গর গর শব্দ তোলে সে; আর দ্বারিকের পায়ে নাক ঘষে। দ্বারিক আর শুকরাম একটা একটা করে আণ্ডা যত্নে তুলে নিল কোঁচড়ে। দুই দোস্তে কিছুক্ষণ কি যেন শলাপরামর্শ করে শুক্রমনির মাচার দিকে চলতে শুরু করে তারা। ওস্তাদ লখিন্দরের মেয়ে শুক্রমনি।

মাচায় একটু গড়াচ্ছিল শুক্রমনি। দ্বারিক আর শুকরামকে আসতে দেখে মাচা থেকে নেমে আসে। এই জোড়া মাণিককে তার ভাল লাগে। তাদের কথায় বার্তায়, পরিহাসে আর ছেলেমানুষিতে। দ্বারিক আর শুকরাম দুজনেই তাদের কাপড়ের আঁচল মেলে ধরে শুক্রমনির সামনে। শুক্রমনি একটা সুন্দরী গাছে ঠেস দিয়ে

দাঁড়িয়ে। কালো কুচকুচ চুলের গাছি আঁট করে বাঁধা। খোঁপায় গুঁজেছে লাল শালুক। গলায় রূপোর হাঁসুলি। চোখ দুটো হাসিতে ফুটি ফুটি করছে। খুব খুবসুরৎ দেখাচ্ছিল শুক্রমনিকে। একসাথে এতগুলো আণ্ডা দেখে খুশীতে খিল খিল করে হাসল সে। চোখ থেকে সেই হাসি এখন ওর সারা দেহে ঢেউ তুলেছে। গালে হাত দিয়ে ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করে সে—সাড়িকা আণ্ডা! —কাঁহা মিলি?

—উধার, শুক্রমনিকে হাত দিয়ে উত্তরের একটা ঝোপ দেখিয়ে দেয় শুকরাম।

—তুম? শুক্রমনি জিজ্ঞাসা করে শুকরামকে, সে আণ্ডাগুলো পেয়েছে কিনা। শুকরামের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। সে হাত নেড়ে বলে,—নেহি, দোস্ত। শুক্রমনি দ্বারিকের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সারা শরীরে হাসির ঢেউ তোলে।

—চাঁদ কা শিকার শের; তুমারা সাড়িকা আণ্ডা? বলেই হাসিতে ফেটে পড়ে।

দ্বারিকের চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে। সে বুঝতে পারে শুক্রমনি রামচাঁদের কথা বলছে। রামচাঁদ বাদায় এসেই একটা শেরের বাচ্চা ঘায়েল করেছে। ওস্তাদ লখিন্দরের পেয়ারের পাত্র সে। শুক্রমনির তাই সোহাগ করে চাঁদ বলা হয়। লজ্জায় আর প্রচণ্ড গোসায় দ্বারিক একবার শুক্রমনি আরেকবার দোস্ত শুকরামের দিকে তাকায়। শুকরাম সর্দারকে তখন হাবলা-হাবলা লাগছে, সে বেকুব বনে গেছে। এরকম একটা কিছু শুক্রমনি রসিকতা করবে তা সে ভাবতে পারে নি। সে ভেবেছিল দোস্তের কাম বল্লে বাহাদুরি দোস্তই পাবে। সেটা দোস্তের পক্ষে ভালই হবে। শুকরাম সর্দারও শুক্রমনির এধরণের রসিকতায় মনে মনে খুব চটেছে। কিন্তু তার আরও ভয় দোস্ত তাকে ভুল বুঝবে কিনা।

দ্বারিক আরেকটু হলেই তার কোঁচড়ের আণ্ডাগুলো মাটিতে ফেলে পালাত! সে শুক্রমনির হাসির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, কিন্তু তার আগেই শুক্রমনি দ্বারিকের একটা হাত ধরেছে। আসলে

এই রসিকতায় সে দ্বারিক বা শুকরামকে অপদস্থ করতে চায় নি। আগুাগুলো দেখে শুক্রমনি খুশীই হয়েছিল।

দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম শুক্রমনির মাচার কাছে মুখোমুখি বসল। আগুাগুলো একটা মাটির চুকাতে গুণে গুণে রাখল শুক্রমনি। রাতের বেলায় আগুার ঝোল পাক করে খাওয়াবে শুক্রমনি সব মরদদের, আর বলবে দ্বারিক আর তার দোস্তের কথা। শুক্রমনি বুঝেছে তার এই ধরণের রসিকতা করা ঠিক হয় নি। একজন মরদের সামনে আরেকজন মরদের প্রশংসা-করা যে বুদ্ধিমানের কাজ নয় সেটা সে ষোল বছর বয়সেই বুঝেছে। দ্বারিক আর শুকরাম সর্দার খুব চটেছে। কিন্তু সে তাদের চটাতে চায় নি। তাই সে দুটো মিঠে বাত শোনাল দ্বারিক আর তার দোস্তকে যাতে তারা খুশী হয়। শুকরাম সর্দার তখন ভুলে গেছে শুক্রমনির রসিকতার কথা। হাত পা নেড়ে সে কথা আরম্ভ করল। দ্বারিক দু-একটা কথা বলছিল ঠিকই। কিন্তু খুব ওজন করে। তখনও শুক্রমনির রসিকতাটা তার মনে ঘোরাফেরা করছে—চাঁদ কা শিকার শের, তুমারা সাড়িকা আগুা··· ।

দোস্ত শুকরামের কাছে সে শুনেছে রামচাঁদ আর শুক্রমনির সাদির কথাবার্তার কথা। লখিন্দর সর্দারের দ্বীপ হাসনাবাদেই রামচাঁদের ঘর। রামচাঁদ মুরারি এই জোয়ান বয়সেই দুই কুড়ি টাকা জমিয়েছে। বুঢ়্‌ঢা লখিন্দরের সে কথা জানা আছে। দো-কুড়ি রুপেয়া আর কটা মরদের ট্যাঁক থেকে বের হয়। দো-কুড়ি রুপেয়ার বদলে সে পাবে শুক্রমনিকে। অর্থাৎ সাদি হবে। লখিন্দর তাতে খুব রাজী। চাইকি একটু করে সূর্যবেড়িয়ার জমি দখল পেলে রামচাঁদ একটা ঘরও উঠাবে। দুটো ভৈসা কিনবে। এসব পাকাপাকি বাত দ্বারিক জানে, শুনেছে দোস্ত শুকরামের কাছে। অথচ দ্বারিকের মনে ওস্তাদের ষোড়শী মেয়ে শুক্রমনিও রঙ ধরিয়েছে। এটা আজ সে আর অস্বীকার করে না। প্রথম প্রথম দ্বারিক দোস্ত শুকরামের কাছে এমন কি নিজের কাছেও এ সত্যটা অস্বীকার করত। কিন্তু বচপনের সাথী শুকরাম তার হাব-ভাবে বুঝতে পেরেছিল সবই, যা দ্বারিক নিজেই ঠিক বুঝতে পারে নি। কিন্তু শুক্রমনি তার মনে রঙ ধরালেও দ্বারিক গায়ে পড়ে তার সঙ্গে

ভাব জমাতে যায় নি। এ তার মেজাজে আসে না ; আজও যখন শুকরাম তাকে মতলবটা শুনাল প্রথমে সে রাজী হয় নি ; পরে শুকরামের কথা ঠেলতে না পেরে এসেছে। এসে এই ধরণের রসিকতা শুনতে হল তাকে।

সেই মুহূর্তে দ্বারিকের মন গুটাতে গুটাতে একটা চিন্তায় এসে ঠেকেছে। আর আরণ্যক পৃথিবীর এই ঝিমধরা দুপুর, মধু চুসকীর ডাক, বিদ্যাধরী আর পাঠানখালির জল-কল্লোলকে সাক্ষী রেখে সে যেন এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করছে মনে মনে, যখন পৃথিবীর সব রঙ তার কাছে এক লাগছে, আসমান আর দরিয়ায় ফারাক কিছু নেই। রামচাঁদ শিকার করেছে শের, তার শিকার হবে শুক্রমনি। একটা বিকট হাসিতে ফেটে পড়ল দ্বারিক সর্দার ; প্রতিজ্ঞাটা যেন হাসি হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে ; নিজের মাচার দিকে পা বাড়াল। ছাঁটার কাজ এখনই আরম্ভ হবে। কুড়োলটা আনতে চলল। দ্বারিককে অন্য রকম ঠেকল দোস্ত শুকরাম আর শুক্রমনির কাছে। যেন সে অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

দো শুকরামও দ্বারিকের পেছন পেছন ওঠে। হাত তুলে দোস্তকে ডাকে সে। কিন্তু দ্বারিক কোন উত্তর দেয় না। শুধু চোখ বড় বড় করে তাকাল। শুকরাম সর্দার বুঝল এখন দ্বারিক ডুবে আছে নিজের মনে ; তাই আর কথা বাড়ায় না।

তারপর সূর্যবেড়িয়ার কালো জঙ্গলে কত দুপুর, কত রাত্রি এল গেল, ভোরে সাড়াসাড়ির ডাক শোনা গেল। একশ কুড়োল চলল তামাম দিন ভর। এই দিনগুলির মাঝে দ্বারিক তার প্রতিজ্ঞা মত শুক্রমনির অনেক কাছে এগিয়েছে। তারপর সেই সন্ধ্যা! যেদিন ওস্তাদ লখিন্দর তাদের চার হাত এক করল। সাদি হয়ে গেল দ্বারিক সর্দার আর শুক্রমনির। হাড়িয়ার উৎসব হল সারারাত্রি ধরে। সাঁঝের বেলায় সুন্দরী, গোল, গেঁও, অর্জুনের শুকনো পাতার স্তূপে আগুন ধরান হল। কয়েকটা মরদ গান ধরেছিল গলা ফাটিয়ে। দোস্ত শুকরাম নেচেছিল কোমর দুলিয়ে। মচকা ফুলের মত লাল আগুনের আলোয় তাজ্জব দেখাচ্ছিল তাকে। মরদের দল তার সাথে গলা ফাটিয়ে

গানের হল্লা জোড়ে আর মাদলে চাঁটি মারে তালে-বেতালে, হাড়িয়ার নেশায় মশগুল হয়ে। তালে ভালে বিচিত্র ভংগীতে নাচে শুকরাম দোস্তের সাদির পরবে। মরদেরা হাসিতে হাসিতে ফেটে পড়ে—হাঃ, হাঃ হিঃ হিঃ, হিঃ হিঃ।

ইতিমধ্যেই রামচাঁদ নিখোঁজ হয়েছিল। মরদেরা বলেছে শেরে নিয়েছে। ওস্তাদ বলেছিল বনবিবিতে নিয়েছে। রামচাঁদ মুরারী গুণাহ করেছিল। তবে গুণাহটা কি সেটা কেউ সঠিক জানে না। শুধু ওস্তাদ লখিন্দরই জানে।

সেই পরবের রাতে দ্বারিক সর্দার সেজেগুজে শুক্রমনির পাশে বসে থাকতে থাকতে অর্জুনের সারের ঘনপল্লবের ফাঁকে প্রথম সেই লাল তারাটি দেখতে পেয়েছিল।· দেখা নয়, জীবনে একটা বিশেষ তারার আবিষ্কার। একটা নিশানা যেন। যার সাথে ষোড়শী শুক্রমনির লীলায়িত মুখটির স্মৃতি শিরীষের আঠার মত লেগে আছে।

আজকের এই মধুরাতের নির্জন গাংভেড়ি, পূর্ণিমার প্লাবন, দূর আকাশে লাল তারাটি এই সব কথাই মনে করিয়ে দেয় দ্বারিক সর্দারকে। পরে কত পরিবর্তন এসেছে ওদের দুজনার জীবনে। কত ঝড়-বাদল গেল, কত দুর্যোগ, অনাচার-অবিচার, অসহযোগ এল গেল ওদের ওপর দিয়ে কিন্তু কেউই ওরা ভেঙ্গে পড়ে নি। ছিল রাঘব ডিঙ্গাল, ছিল রতিকান্ত শ্যামল, ছিল গোসাবার দারোগাবাবু, তার সাথে এসেছে বন্যা—মড়ক, কিন্তু সব অবস্থাতেই দ্বারিকের জীবনে শুক্রমনি যেন সেই ষোড়শী তেজস্বী মেয়ে। কোন অবস্থাতেই ওরা পিছু হটে নি। আর ওদের পাশে ছিল দোস্ত শুকরাম। আজও যেমন গাংভেড়িতে দ্বারিকের পাশে শুয়ে আছে।

দ্বারিক দোস্তের মুখের দিকে তাকায়। ঘুমের ভেতর শুকরাম সর্দার কি যেন বিড় বিড় করে বকছে। দোস্তের মুখে চোখে খুব ঘাম জমেছে। কপালের কাছে এক গোছা চুল সেই ঘামে লেপ্টে আছে। জ্যোৎস্নায় দোস্তের ঘামে ভেজা মুখ দেখলে কেমন যেন মায়া হয়। জেগে থাকতে শুকরাম সর্দার খুব কম কথা বলে। নেশা করলে বা আধ ঘুমের ভেতর ওর মুখে কথা ফোটে। সে সব তার মনের কথা। সুখ দুঃখের

ভরা প্রকাশ। দ্বারিক জানে দোস্তের জীবনে দুঃখ অনেক। দোস্ত সেগুলো প্রকাশ করে না। বুকে চেপে দিন কাটায়। তাই ঘুমের ভেতর কথা বলে। দ্বারিক কান পেতে শুকরামের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, সবই অস্পষ্ট, কিছুই শোনা গেল না। দ্বারিক কনুই দিয়ে একটা ঠেলা মারে দোস্তকে।

ঠেলা খেয়ে শুকরাম উঠে বসে—কেনে রে? জড়িয়ে জড়িয়ে প্রশ্নটা হাওয়ায় ছোঁড়ে। দ্বারিক হেসে ফেলে। দুই দোস্ত মিলে ডাঙের ধারে বসে কিছুক্ষণ। ডাঙের সুতো পরীক্ষা করে দেখে। না, এখনও ঝাঁকটা এসে পৌঁছায় নি। এলে টোপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নির্ঘাত খুট দিত। হাঁটুতে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ বসে থাকে ওরা। একসময় গাংভেড়িতে উঠে এসে দুই দোস্তে আবার শুয়ে পড়ে।

ভেটকীর ঝাঁকটা আসতে এখনও দেরী আছে দুই দোস্ত ভাবে একথা। ভেবে আশ্বস্ত হয়। যে ঘুমটা হাল্কাভাবে আলতো হয়ে ওদের চোখের পাতায় আটকে ছিল সেটা এখন গাঢ়ভাবে নেমে আসছে। দুই দোস্তে গাংভেড়িতে এখন কিছুটা ঘুমাবে। শুকরাম সর্দারের নাকের ডাকটা শুরু হবে এখুনি। দ্বারিকের তেমন কিছু হয় না।

শেষরাত্রির কাছাকাছি আকাশে যখন সব নক্ষত্র ডুবে গেছে তখন দ্বারিক স্বপ্ন দেখল। সমুদ্র থেকে একঝাঁক ভেটকী অনেক উথাল-পাথাল পার হয়ে এসে পুরন্দরের মুখ পেরিয়ে, বাসন্তী ছাড়িয়ে বিদ্যাধরীতে পড়েছে। বিদ্যাধরী থেকে পাঠানখালির বাঁকে ঢুকল। এখন ঝাঁকটা সূর্যবেড়িয়ার কাছাকাছি। ঘুমের ভেতরই দ্বারিকের চোখ দুটি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে; ঝাঁকের প্রত্যেকটি মাছকে সে স্বপ্নের ভেতর চিনতে চাইল। ঝাঁকের দুটো মাছ চিংড়ীর গন্ধে পথ ভুল করে ওদের টোপের সামনে এখন ঘোরাফেরা করছে। ওদের নীল চোখ দীর্ঘ সফরে কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। আঁশগুলো নোনায় পাঁশুটে। অনেকক্ষণ ধরে লেজ বাঁকিয়ে ঘোরাফেরা করল মাছ দুটো। একটাকে দ্বারিকের কেমন চেনা মনে হল। গতবারে ওর টোপে খুট মেরে পালিয়েছে। এক বছর সুখে ঘরকন্না করা হল ওর। এখন আবার সফরে পথ ভুল করে দ্বারিকের চোখের সামনেই ঘোরাফেরা করছে। স্বপ্নের ভিতর দ্বারিক

হাসল বিজ্ঞের মত, নিয়তির কথা ভেবে। যাবত চরাচরের সমস্ত জীবের ভবিতব্যের কথা ভেবে। এবারে আর বাছাধনকে ফিরে যেতে হবে না। স্বপ্নের ভেতর দ্বারিকের চিন্তাগুলো কথা হয়ে বেরিয়ে এল। ঘুমের ভেতরই দ্বারিক মাছটাকে প্রশ্ন করল—কাঁহা যাতি? কোথায় যাচ্ছ? আর কোথায়ও যেতে হবে না—প্রশ্নের অন্তরালে এমনই একটা মনোভাব প্রচ্ছন্ন আছে।

তখন রাত শেষ হয়ে ভোর ফুটছে। ভোরের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদটা একটা জলছবির মত ভেসে আছে। মনে হল বিদ্যাধরী আর পাঠানখালির গাংভেড়ির মাঝামাঝি চাঁদটা আটক পড়েছে। আর কিছুক্ষণ পর আলো ফুটবে। সূর্য জাগবে। তখন চাঁদটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে।

স্বপ্নটা শেষ না হতেই মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়ায় দ্বারিকের ঘুমটা ভাঙ্গল! দোস্ত শুকরামের তখনও নাক ডাকছে। দ্বারিক দোস্তের নাক ধরে নাড়া দিল। কিন্তু শুকরামের জেগে উঠার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আর একটা ঠেলা মারে দ্বারিক। ঝাঁকুনি খেয়ে শুকরাম ধড়ফড় করে উঠে বসে চোখ রগড়ায়। দুশ্চিন্তা তারও আছে। কি জানি সুতো ছিঁড়ে ডাণ্ড নিয়ে মাছে পালায় নি তো। জড়িয়ে জড়িয়ে আগের রাতের মত সে আবার প্রশ্ন করে—কেনে রে? দ্বারিক আবার আগেকার মত হেসে ফেলে।

দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম কয়েক মুহূর্ত পাশাপাশি বসে থেকে জলছবির মত চাঁদটা দেখল। বুঝল ভোরের আকাশ ফুটছে। দুই দোস্তে তাড়াতাড়ি ডাণ্ডের দিকে এগিয়ে যায়। সুতো ধরে টানতেই শুকরাম সর্দার তিন হাত লাফিয়ে ওঠে। ওর ডাণ্ডে বড় রকমের একটা মাছ লেগেছে। ভেটকীই হবে বা। কিন্তু দ্বারিক মুখটা বিমর্ষ করে সপাং শব্দে টোপশুদ্ধ বঁড়শিটা জল থেকে তুলে আনল। আর দেখল টোপের অর্ধেকটা কোন মাছে খেয়ে গেছে। হয়ত বা স্বপ্নের মাছটা।

দোস্ত শুকরাম তখন মহা উৎসাহে ধীরে ধীরে মাছটাকে খেলিয়ে ডাঙায় তোলার চেষ্টা করছে। চোখ দুটি ওর খুশীতে ফুটি ফুটি। কোন দিকে নজর দেবার ওর এখন সময় নেই।

কিছুক্ষণ খেলিয়ে মাছটা তুলল শুকরাম। একটা বড় রকমের ভেটকী। সের চারেকের হবে বা। ভোরের আলোয় রূপালী আঁশগুলো থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। নীল চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। মুখটা আর কানকোটা তখনও অল্প অল্প নড়ছে। কতক্ষণ বঁড়শিতে ধরা পড়েছে কে জানে। মুখের কাছ দিয়ে খানিকটা রক্ত ঝরছিল। হয়ত এতক্ষণ বঁড়শির কাঁটা থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে মাছটা; পারে নি। পরিবর্তে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। বঁড়শি থেকে মুক্তি না পেলেও সে আজকের এই ভোরের প্রথম আলোতে দরিয়া থেকে মুক্তি পেল শুকরাম সর্দারের ডাঙে ডাঙ্গায় উঠে।

শুকরাম মাছটাকে শূন্যে নাচিয়ে এদিক ওদিক করে দেখতে লাগল। মাছটাকে সে সব দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে চায়। উলটিয়ে পালটিয়ে; ভরা পূর্ণিমার শিকার শুকরাম সর্দারের। তার চোখ দুটোতে খুশী ঠিকরে পড়ছে। মাছটাকে এ দ্বীপেই বেচবে সে। এর জন্য গোসাবা বা বেলতলা যেতে হবে না। এখানেই নিদেন সাত-আট টাকা মিলবে। দুচারদিন হাড়িয়া আর চালের অভাব হবে না। তাছাড়া মাথা মচকান বউটিকে কিছুটা শান্ত করা যাবে।

ভেটকীটা নিয়ে বিভোর থাকায় শুকরাম দেখতেই পায় নি দোস্ত দ্বারিক ডাঙের ওপর ভর দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। দুই দোস্তে মাছ ধরতে এসে একজন শুধু পেয়েছে, কিংবা কেউই পায় নি এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে, বিরল নয়; তার জন্য হা হুতাশ কেউ করে না। খানিকটা মদৎ, কিছুটা নসীব। তাতে হা হুতাশ করে লাভ নেই। কিন্তু আজকের ভোরবেলায় দ্বারিক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল দোস্তের হাতের ভেটকীটার দিকে তাকিয়ে। ভেটকীটার রঙিন চোখের মত দ্বারিকের চোখ দুটিও বড় করুণ দেখাচ্ছে। সোনামনি আর চরণ হয়ত আজকে অনেক আশা নিয়ে ভোরে উঠবে। কিন্তু হতাশ হবে মরিচঝাঁপি থেকে পিতাজীর ফিরে আসার রাত্রির মতই। দোস্তের ছলছলে চোখ; দাঁড়াবার ভঙ্গি, সবটা মিলিয়ে দেখল শুকরাম। মনে মনে বেশ লজ্জিত হল। এই ভাবে মাছটা নিয়ে তার বিভোর হয়ে থাকা উচিত ছিল না। আশেপাশে কি ঘটছে ভুলে যাওয়া উচিত ছিল না।

সে ছাড়া আর কে সমঝাবে দ্বারিক সর্দারের এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ।

মরিচঝাঁপি থেকে ফিরে এসে দোস্ত শুকরামের কাছে কেঁদেছিল দ্বারিক সর্দার। দোস্তের এমন কান্না সে জীবনে আর কোনদিনই দেখে নি। ধিক্কার হয়েছিল দ্বারিকের। ছেলে মেয়ে দুটোর ওপর তার অবিচারের কথা বলেছিল। কচি দুটো মনের আশাভঙ্গের কথা বলেছিল। আর দোস্তকে জানিয়েছিল দ্বারিক সোনামনির কথাটা। —পিতাজী, দুরমে ভাগ যাই চল্। আজও ছেলে মেয়ে দুটোর কথাই হয়ত ভাবছে দ্বারিক, মনে হল শুকরাম সর্দারের। এগিয়ে গিয়ে একটা হাত দ্বারিকের কাঁধে রাখল শুকরাম। ভাবল কিছু বলবে, কিন্তু কি ভেবে বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আস্তে আস্তে দোস্তের হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ডাণ্ডটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দ্বারিক। শুকরাম জিজ্ঞাসা করে—কাঁহা যাতি? কিছুটা ইতস্তত: করে ভেটকীটা দ্বারিকের চোখের সামনে তুলে ধরে শুকরাম তার সঙ্কল্পের কথা জানায় দোস্তকে। মাছটা বিক্রি না করে দুই ঘরে ভাগাভাগি করে খাওয়া যাক। সোনামনি আর চরণের উল্লেখও করে শুকরাম। দ্বারিক দু পা পিছিয়ে গিয়ে বেশ উঁচু গলায় বলে—নেহি। শুকরামের প্রস্তাবটা শুনে বিস্মিত হয়েছিল দ্বারিক। প্রস্তাবটা অভাবনীয়। দুই দোস্তে মাছ ধরতে এসে একজনার না পাওয়াটা এমন কিছু অঘটন নয়। কিন্তু তা বলে এই প্রস্তাব কেন! হয়ত তার মতও শুকরাম সোনামনি আর চরণের মুখ চেয়ে তার সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছে। কিন্তু সোনামনি আর চরণের আশাভঙ্গ বা হতাশা ওদের ডাগর চোখেই আটকে থাকবে, কিন্তু দোস্ত শুকরামের ঘরে যে বউটা আছে সেটা চেঁচিয়ে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার আকাশ বাতাস এক করবে। এবং আজ দশবছর ধরে দোস্ত শুকরাম এসব মুখ বুজে দেখে আসছে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে তাকালে দেখা যায় দোস্ত শুকরামের মুখে চোখে এই দশ বছরে একটা বেদনার রঙ ধরেছে, কেমন পীতাভ আর তামাটে।

কদবেল গাছটার নীচে দুই দোস্তে আবার কিছুক্ষণ দাঁড়াল। গইবাক্সের ভেতর দিয়ে জোয়ারের জল বেরাচ্ছে। শুকরাম জানে দ্বারিক

কিছুতেই মাছটা নেবে না। আরেকবার বলতে যাওয়া মিছে। এখান থেকে দুই দোস্তে ভিন্ন পথ ধরবে। দোস্ত শুকরাম ফিরবে মাছটা বেচার জন্য। দ্বারিক ঘরে ফিরবে দোস্তের ডাণ্ডটা নিয়ে।

গাংভেড়ি থেকে নেমে এল ওরা। তখন সূর্যটা ভোরের আকাশে দেখা যাচ্ছে। দোস্ত চলে যাবার পথের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্বারিকও এক সময় হাঁটতে শুরু করে।

॥ সতেরো ॥

দিন কয়েক পরে এক মেঘলা দুপুরে দ্বারিক এসে পথের বাঁকে সেই হিজল গাছটার তলায় বসেছে। কিছুক্ষণ আগেও ঝাঁ ঝাঁ রোদে দুপুরের আকাশ খল খল করে হাসছিল। সেই রোদের আকাশ মাথায় করেই দ্বারিক ঘর থেকে বের হয়েছিল। এক অশান্ত ইচ্ছার কবলে নানান পথ দিয়ে গাংভেড়ি, চৌকা, ঘুরে সে এসে বাঁকের হিজল গাছটার ছায়ায় বসেছে। যেন গাছটার ছায়ায় বসে দুদণ্ড বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছে। রোদ গলে গিয়ে কখন মেঘ ঘনিয়েছে সেদিকে খেয়াল নেই তার। মাঝ দরিয়ার একটা ঢেউয়ের মত দ্বারিক সর্দারের বুকটা নামা ওঠা করছিল যেন এখনই ফুঁসে ফেটে পড়বে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আর আষাঢ় শ্রাবণের দিনগুলিতে সে দরিয়ায় দরিয়ায় নৌকা নিয়ে ভেসেছে; সেই নৌকার তল ফুটো হল। সেই ফুটো দিয়ে উঠে এল সাতজেলিয়ার অনন্তলাল। মরিচঝাঁপির কালো জঙ্গলের সফরে পাড়ি দিল দ্বারিক। মাসখানেক সেই কালো জঙ্গলের ধূসল অন্ধকার, নোনাজলের কামোট ঢেউয়ের হুটোপুটি, চোরাকারবারের মাঝিগিরিতে শ্রান্ত হয়ে গোসাবার ফেরী ঘাট, পিড়ির ভাটিখানা। চরণ সোনামনির সুখ দুঃখ আর বিমর্ষভাব থেকে সাতদিন সাত রাত্রি আসমানের নক্ষত্রে চোখ রেখে ভেটকী ধরার রাত্রি পর্যন্ত সবই নসীবের নিশানা দিয়েছে। নসীবের বদলা নেই কিন্তু জমানা বদলায়। তার অপেক্ষায় অনেকবার শিনা ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে দ্বারিক, আবার মুষড়ে গেছে।

লাল জবার আধফোটা কুঁড়ির মত তার বিবির চোখ দুটো যেন সে দেখতে পাচ্ছে। পাঁচ বছর ধরে এই চোখ জোড়া তাকে অনুসরণ করছে; পাঁচ বছর ধরে কতগুলো প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি তাকে এই চোখজোড়া মনে করিয়ে দিচ্ছে। আজ এই ঘোর রোদের দুপুরে সেই চোখজোড়াই যেন

তাকে ঘর থেকে পথে বের করে আনল, লাট্টুর মত ঘোরাল, এক সময় এনে বসাল এই হিজল গাছটার তলায়। এসবে যেন দ্বারিকের কিছু হাত নেই, একটা মন্ত্রপূত বাণের মত যেন সে সব কিছু করে যাচ্ছে, সেখানে ওর ইচ্ছা অনিচ্ছাটা বড় নয় আদপেই নাগালের বাইরে।

সেই অঘ্রাণের ভোরে হিজলগাছের ডালে হৈমন্তিক কুয়াশায় তুলোর মত আটকে আছে। সন্ধ্যায় বিবি তার ঘরে ফিরল না। সন্ধ্যা উতরিয়ে ক্রমে রাত্রি হল তখনও না। আশঙ্কা নিয়ে দোস্ত শুকরামকে সাথে নিয়ে বের হল দ্বারিক। বিদ্যাধরী-পাঠানখালির ধার, বেদনা-সুন্দরী খালধার ধরে বিলে-বাদায়-চৌকায়, সম্ভব অসম্ভব নানান ঘরে খুঁজল সে তার বিবিকে। কিন্তু কোথাও খোঁজ মিলল না। ভোর রাত্রির দিকে পথের বাঁকে এই হিজল গাছটার তলায় এসে দাঁড়িয়েছিল তারা। সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম কথা মনে হচ্ছিল দুই দোস্তের ; শুকরামই প্রথম দেখল হিজল গাছের ডালে একটা লাস ঝুলছে। হেমন্তের কুয়াশায় সেটাকে চেনা যাচ্ছে না। শুকরামই সেটাকে নামিয়ে নিয়ে এল। ওরা দুজনায় দেখল সারারাত্রির হিম আর কুয়াশায় বিবির দেহটা খুব ঠাণ্ডা আর খটখটে শক্ত হয়ে গেছে। দুই দোস্তে লাসটিকে নামিয়ে রেখে পাথর হয়ে বসে।

শুক্রমনির সারা শরীরে অনেকগুলো ক্ষতের চিহ্ন। পরণের কাপড় ফালি ফালি হয়ে ছিঁড়ে গেছে। গলার কাছটায় একটা ভারী হাতের ছাপে নীল হয়ে গেছে। দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম যত শুক্রমনিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল তত যেন ভেতরে ভেতরে একটা অসহ্য যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে উঠছিল। বুঝতে কিছুই বাকী রইল না তাদের। যে কোন হাবলা মরদেই এ সব বুঝতে পারে। শুক্রমনির ইজ্জতের ওপর টান পড়েছে। একটি মাথা মচকান লোকের কারসাজি সব। আর ধ্বস্তাধস্তিতেই বিবির প্রাণটা বেরিয়েছে। তারপর এখানে এনে লাসটা বেশ টাঙিয়ে দিয়েছে ঘটনাটা অন্য ভাবে সাজানর জন্য ; যেন সবাই মনে করে আত্মহত্যা করেছে তার বিবিটা।

দুই দোস্ত অনেক সময় ধরে বসে বসে ঘটনাটার রহস্য কিনারা

করার চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না। যেন দুজনেই বোবা হয়ে গেছে।

এদিকে হেমন্তের কুয়াশা পাতলা হয়ে পূবের আকাশ ফর্সা হচ্ছে। আলো ফুটছে। আর বেশীক্ষণ বিবির লাস নিয়ে এভাবে বসে থাকা যায় না। দ্বারিক সর্দারের বিবির ইজ্জত নিয়ে টান দিয়েছে কারা—কথাটা জানাজানি হয়ে যাবে। সারা দ্বীপ সূর্যবেড়িয়া হাসবে, ঠাট্টায় তামাসায় ফেটে পড়বে। এমন কি যারা পিঁড়িয়ে দিয়ে গেছে তারাও ব্যাপারটা নিয়ে রসিকতা করতে ছাড়বে না, অথচ দ্বারিকের মাথা ঠোকা ছাড়া করবার কিছুই নেই। বিবিটা আর মুখ খুলবে না। দুই দোস্তে চোখাচোখি হল। দুজনেই তখন মন স্থির করে নিয়েছে।

শুক্রমনির লাসটা দুই দোস্তে ধরাধরি করে পাঠানখালির একটা নির্জন তীরে এসে দাঁড়াল, দ্বারিক নিজের হাতে শুক্রমনির দেহের সাথে বড় বড় মাটির চাপ বাঁধলে দড়ি দিয়ে, এতটুকু হাত কাঁপে নি ওর। দুই দোস্তে ধরে বিবিকে ভাসাল পাঠানখালির জলে। চোখের সামনে বিবি ধীরে ধীরে জলে ডুবে গেল। সে নিজের হাতেই ডুবাল বিবিকে।

বিবির চোখ দুটো কেমন নীল হয়ে গিয়েছিল। চোখজোড়া রক্ত জবার কুঁড়ির মত। ঠোঁটজোড়া একটুও নড়ে নি। কিন্তু চোখদুটি অনেক কথা বলেছিল দ্বারিককে। অনেক ইঙ্গিত দিয়েছিল। আর অনেক কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল দ্বারিককে দিয়ে। পাঁচ বছর ধরে সেই সব প্রতিজ্ঞাগুলো সে মনে মনে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বিবির চোখদুটো এখনও তাকে অনুসরণ করে। যখন অশান্ত হয়ে ওঠে দ্বারিক তখনই প্রতিজ্ঞাগুলো ওর মনে নড়ে চড়ে ওঠে। আজ দুপুরে তেমনি হয়েছে। আর সে ঘর থেকে বেরিয়ে নানান পথ ঘুরে হিজল গাছটার তলায় এসে বসেছে। পাঁচবছর আগে যেখানে সে বিবিকে খুঁজে পেয়েছিল।

কিন্তু সেকথা দোস্ত শুকরাম ছাড়া আর কেউ জানতে পারে নি দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায়। পরদিন ভোরে সবাই জেনেছিল দ্বারিক সর্দারের বিবিকে কুমীরে নিয়েছে। হয়ত কাঁকড়া খুঁজতে নেমেছিল ভাটার কাদায়। আর উঠতে পারে নি। দ্বারিকও পাঁচজনার মতামত জেনে নিয়ে চুপ করে গেছে। সব কথা প্রকাশ করে নি কারও কাছে। চরণটা তখন

তিন বছরের। মায়ি মায়ি করে কেঁদেছিল খুব ভোরবেলায়। আর মেয়েটা অবাক চোখে তাকিয়েছিল পিতাজীর দিকে। ভাবছিল অঘ্রাণের কুয়াশায় কেমন করে একটা মেয়ে মানুষ চিরদিনের মত হারিয়ে যেতে পারে। আজও যেমন সে ভেবে থাকে।

আশ্বিনের আকাশে এত মেঘ! দ্বারিকের একসময়ে হুঁশ হল রোদ চুপসে গিয়ে আকাশে মেঘ জমেছে। সমস্ত সূর্যবেড়িয়া তার কাছে গরম ঠেকেছে। তখন মনে মনে একটা ভীষণ মতলবে সে মত্ত হয়েছে।

ভেটকীটাও তার বঁড়শিতে ধরা পড়ে না। দিনটা এখন তার মন্দা পড়েছে। নসীবের বদলা নেই সে কথাও জানে দ্বারিক। কিন্তু জমানা পাল্টাতে হবে। আফশোস করে মধুর দিনগুলো হয়ত সে আর ফিরে পাবে না। কিন্তু ইজ্জতে চোট খেয়ে বেঁচে থাকার চিন্তাটা প্রতি দণ্ডে পলে তাকে কুরে খাচ্ছে। তার বদলা নেবে সে। তাতে নসীব না পাল্টাক, মনে মনে যে চোট নিয়ে সে দিন গুণছে তার আসান হবে।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দ্বারিক ডিঙ্গালঘেরির দিকে হাঁটতে শুরু করে। সারা মন জুড়ে একটা চিন্তাই তখন তার মনে ঠাঁই পেয়েছে।—বদলা, —ইজ্জতের বদলা। বিবির মৃত চোখের সামনে যে কসম খেয়েছে তার হক্ সম্মান রাখবে সে।

জাম, বেল, কলার বাগানের ভেতর রাঘব ডিঙ্গালের বাড়িটা। বাড়ির চারপাশে গড়খাই। একদিকে মাটি ফেলে বাড়ির পথে ঢোকার রাস্তা করা হয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে সন্তর্পণে ঢুকল দ্বারিক। কলা বাগানের অন্ধকার ছায়ায় গিয়ে চুপ করে বসল। কে যেন ওকে এখানে এনে বসাল। শুক্রমনির চোখদুটোই হয়ত বা। যে তাকে হলপ করে বলে দিয়েছে রাঘব ডিঙ্গালই ওর দেহটি নেড়ে চেড়ে হিম কুয়াশায় হিজলের ডালে লাসটাকে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। আর মনে মনে সেটা সত্য বলে মেনে নিয়েছে দ্বারিক। তাই কলাবাগানের অন্ধকারে একটা জান্তব প্রতীক্ষায় বসে আছে রাঘব ডিঙ্গালের জন্য। সে স্থির জানে আর কিছুক্ষণ পরেই রাঘব ডিঙাল বাগানে ঘুরতে বের হবে। ঘুরে ঘুরে বাগানে কলার কাঁদিটা, বেলগাছের বেল, ক্ষেতের শাকসব্জি দেখবে। তখন আচমকা দশ আঙুলের একটা

ফাঁস আটকে যাবে রাঘবের গলায়। এক সময় স্থূল বিরাট দেহটা কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে আসবে। অব্যর্থ সে ফাঁস থেকে নিস্তার পাবে না। এসময়ে রাঘবের পরিবার ডায়মণ্ডহারবারে থাকে। তাই নির্জন বাগান বাড়িতে সবার অলক্ষ্যেই কাজটা ঘটবে। দু-একদিন পর হয়ত লাসটা খুঁজে পাওয়া যাবে বাগানের কাঁটা ঝোপের ভেতর। তখন দেহটা ফেঁপে ফুঁপে গন্ধ বেরোচ্ছে, বিশ্রী এক কটু গন্ধ। দ্বারিক কাপড়ের খুঁট দিয়ে নাক চাপা দিল, যেন গন্ধটি পাচ্ছে সে। আর ভেতরে ভেতরে এই রকম নানা পরিকল্পনায় ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কলার বাগানের অন্ধকারে ওৎ পেতে বসে থাকতে থাকতে সেই ফয়সালার কথা ভাবছে সে।

বাগানের অন্ধকারে বেলগাছের গুঁড়িতে তিনটে কাঠবিড়ালী দৌড়াদৌড়ি করছে। একটা মা কাঠবিড়ালি দুটো তার ছানা। মা কাঠবিড়ালি খেলা দিচ্ছে ছানা দুটোকে। গুঁড়ি বেয়ে সড় সড় করে ছানা দুটো উঠছে কখনও ; কখনও বা নামছে। কোন সময় লেজ তুলে মার মুখের থেকে খাবার নিয়ে খাচ্ছে। দ্বারিক অপেক্ষা করতে করতে কাঠবিড়ালি তিনটেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। আর আশ্চর্য, কতক্ষণ ধরে সে কাঠবিড়ালির খেলা দেখছে তা তার মনে নেই। মাথার উপর একটা হরিয়াল ডাকল। দূর থেকে আরেকটি হরিয়াল সেই ডাকে সাড়া দিল। কিন্তু রাঘব ডিঙ্গালের কথা দ্বারিক যেন কখন ভুলে গেছে। দশ আঙ্গুলের ফাঁসের মতলব মন থেকে কখন চলে গেছে জীব জগতের এই সব অনুপম শান্তির ঘটনাস্রোতে, তার মনে তখন অন্য ঢেউ লেগেছে। সেখানে রাঘব ডিঙ্গালের হাঙর মুখের স্থান নেই। কোন বদলার মতলব নেই। ওৎ পেতে থাকা নয়। শুধু দুপুরের হরিয়ালের ডাকের মত, মা কাঠবিড়ালির স্নেহের মত, ছানাগুলোর সজীব ঘোরাফেরার মত এক জীবনের আকাঙ্ক্ষা। যেখানে স্নেহ, দয়া, অবিচল শান্তি বিরাজ করবে। এর বেশী কিছু নয়। এর কম কিছু নয়।

যেমন এসেছিল তেমন সন্তর্পণে দ্বারিক রাঘবের বাগান থেকে বেরিয়ে দোস্তের ঘরের দিকে পা বাড়াল। আর এমুখো হল না সে। সে বিচার অন্তিমকালেই হবে, সে তার মালিক নয়।

॥ আঠারো ॥

আশ্বিনের সকাল। আকাশে শরতের নীলিমা। দুই একটা শামুকখোল আর শঙ্খচিল নৈঋত আকাশে নৌকার বাদামের মত পাখা মেলে পাক খাচ্ছে। আষাঢ় শ্রাবণের জলে ওদের যে পালকগুলো ভিজে ভিজে বিবর্ণ হয়ে গেছে সেগুলো এখন শরতের সজীব রোদে বর্ণ ফিরে পাবে। যে চোখ যে পাখনা ঝাপসা আর অলস হয়ে উঠেছিল তা এখন চকচকে আর ক্লান্ত হবে দেখে দেখে, ঘুরে ঘুরে আশ্বিনের আকাশে। আর এইত সেদিন হঠাৎ শাঁখামুঠি দম্পতি গর্ত থেকে মুখ বের করে দেখল শ্রাবণ গিয়েছে; শরৎ এসেছে। দু-জোড়া হলুদ চোখে খুশীর হাসি ঝিলিক দিল। গর্ত থেকে বেরিয়ে এল দু-জনায়। মসৃণ হলুদ ডোরাকাটা শরীরটাকে টেনে টেনে স্বামী-স্ত্রীতে দ্বীপ সফরে বের হল। কেন না আশ্বিন এসেছে আকাশ নীল। বর্ষায় আষাঢ় আর শ্রাবণের আকাশে অনেক মেঘ ঘনাল; অনেক জল; সারাদিন ধরে জল; সারা রাত্রি ধরে জল ঝরেছে সূর্যবেড়িয়ার মাটির বুকে। এখন সে মেঘ উধাও, সে জল উধাও; কোলা-ব্যাঙগুলো বৃষ্টিভেজা নিশুতি সন্ধ্যায় আর বিচিত্র শব্দ তুলে ডাকে না, রাতজাগা ঝিঁঝিঁদের আর বিচিত্র কলরব শোনা যায় না। পরিবর্তে প্রশান্ত দিন, মিঠে রোদ, ফুরফুরে বাতাস।

সোনামনির মেজাজটা খুব খুশ। দিন দশেক সে ডিঙ্গালঘেরির সঞ্জয়বাবুর পাকা বাড়ী তৈরির কাজে লেগেছে। খোয়া ভাঙ্গার, ইট বইবার কাজ নিয়েছে সে। সর্দার পল্লীর আরও অনেকে লেগেছে এই কাজে। রোজকার পয়সা ঠিকাদার বাবুরা সন্ধ্যায় মিটিয়ে দেয়। হাতে কিছু পয়সা জমেছে। তাছাড়া দুর্গাপূজা এসেছে। পূজা উপলক্ষ্যে জানাঘেরিতে মস্ত বড় মেলা। বড় সামিয়ানা টাঙিয়ে ত্রিপল বিছিয়ে চলবে যাত্রা। যাত্রার দল গোসাবা আর মসজিদবাড়ি থেকে বায়না পেয়ে আসবে। চারদিন ধরে ঢাকের বাজনায় মেলার হৈ-হট্টগোলে

আর যাত্রাপার্টির ক্ল্যারিওনেটে, বাঁশীর আর বেহালার সুরে আনন্দের স্রোত বইবে। হাজার রকমের আতসবাজি জ্বলবে নিভবে। অনেক রকম বেরকমের বাজী পুড়বে। সাধারণতঃ দুর্গাপূজায় সর্দারপল্লীতে বড় বেশী সাড়া জাগায় না। ঘেরিতে আর পাঁচটা ব্যাপারেও যেমন এ ব্যাপারেও তেমনি তারা নির্লিপ্ত। উৎসবে যোগ দেবার কোন রেওয়াজও তাদের নেই সাধ্যও নেই। তবে পূজা উপলক্ষে বসে মেলা, মেলা উপলক্ষে যাত্রা। এই দুইয়ের আকর্ষণে সর্দার পল্লীর কোন কোন ছেলে মেয়ে, অতি উৎসাহী দু-একজন বয়স্ক সর্দার যে সেখানে যায় না এমন নয়। তবে সোনামনির আকর্ষণটা শুধু মেলায় বা যাত্রায় নয়। মধ্যরাত্রি ধরে চলবে যাত্রা। আর সেখানে সে রূপচাঁদের সাথে সাথে ঘুরে ঘুরে সব দেখবে। ভীড়ের ভেতর রূপচাঁদকে কাছে পাবে ; খোয়া ভাঙার কাজ রূপচাঁদই যোগাড় করে দিয়েছে। সেদিন সে কাজের সময় সোনামণিকে মনে করিয়ে দিয়েছে আর চারদিন পরে দুর্গাপূজা। সোনামনি বুঝেছে রূপচাঁদ কি বলতে চায়। সোনামনির মেজাজটা তাই খুশী, চরণকে সে সঙ্গে নেবে। সেদিন গাংভেড়িতে এসে চরণ দিদিকে শিউলিফুলের গন্ধেব কথা জানিয়েছিল। বাতাসে মিষ্টি গন্ধটা চরণের খুব ভাল লাগে। সে ভাললাগার কথাই সোনামনির গলা জড়িয়ে ধরে সে বলেছিল। তখনই সোনামনি চরণকে জানিয়েছে মেলার কথা, পূজার কথা। বড় বড় চোখ করে চরণ সব শুনে শেষে আবদার করেছে তাকে একটা বাঁশী কিনে দেবার জন্য ; যেরকম বাঁশী সে দেখেছে ডিঙ্গালঘেরির পুরুতের ছেলের হাতে। সোনামনি রাজী হয়েছে। ইতিমধ্যেই বেলতলীর হাটে দ্বারিকের সাথে সোনামনিও গিয়েছিল। সেখান থেকে পাঁচ দোকান পছন্দ করে কিনে এনেছে ডুরে শাড়ী। হাটের দোকানদারগুলোর কেমন যেন তেরছা কথা। যার দোকানে যে শাড়ীটা থাকে সেই বোঝাবার চেষ্টা করে শাড়ীটা সোনামনিকে মানাবে ভাল। কিন্তু সোনামনি ওতে ভুলে নি। পাঁচ রূপেয়া ঝনাৎ করে ফেলে নিজের পছন্দমত সে কালো-বেগুনি ডুরে শাড়ী কিনেছে। এছাড়া চরণের গেঞ্জী। পিতাজীকে একটা কেনার কথা বলেছিল সে। কিন্তু পিতাজী তাতে রাজী হয় নি। উদাম গা দেখিয়ে বলেছে এতেই চলবে।

পিতাজী খালি গায়েই সব সময় থাকে। শুধু শীতের দিনে কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়ায়।

সেই ডুরেকাটা শাড়ীটা পরেছে সোনামনি। চরণও নতুন গেঞ্জীটা গায়ে চাপিয়েছে। পূজা উপলক্ষে সর্দারদের নতুন জামা-কাপড় কেনার কোন প্রথা নেই। তবে নতুন শাড়ী আর গেঞ্জী কোথায়ও যেতে হলে পরতে কে না ভালবাসে। আজ বছর দুয়েক পর সোনামনি একটা আস্ত শাড়ী পড়ল। চরণও খালি গায়েই কাটায়। তাই নতুন গেঞ্জী পেয়ে সে আগেভাগে গায়ে চাপিয়েছে।

অনেক রকম ভাবে সোনামনি। নিজেকে আর পরনের ডুরেকাটা শাড়ীটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে। আরও তন্ময় হয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে। বছর দুই ধরে শতছিন্ন ময়লা শাড়ীটায় ভাল করে গা ঢাকে নি। মাঝে মাঝে রূপচাঁদের বাঁকা চাউনির সামনে ছেঁড়া শাড়ীটা ওর মনে কেমন লাজ ধরিয়েছে। তাই আজ আনকোরা নতুন শাড়ীটা মনে অনেক অনুভূতি জাগাচ্ছে। নতুন কাপড়ের একটি মিষ্টি গন্ধও পাচ্ছে সে। গন্ধটা বুকভরে টানছে সে। চরণেরও একই অবস্থা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুস্কিল আসানের প্রদীপটা দেখা গেল। ভাই বোনে দাওয়ার বাইরে এসে দাঁড়াল। আজ নতুন শাড়ী আর গেঞ্জী পরে মেলায় যাবার আগে তারা ফোঁটা নেবে রসুল ফকিরের কাছে। মুস্কিলের আসান হবে। নতুন শাড়ী আর গেঞ্জী আবার হবে। কদবেল গাছটা পেরিয়ে রসুল ফকির হাঁকল—মুস্কিল আসান। অন্য দিনকার মত চরণ আর সোনামনি এগিয়ে গেল। ভাই বোনকে দেখেই রসুল বুড়ো প্রদীপটা উঠিয়ে একগাল হেসে তর্জনীটা দিয়ে ফোঁটা দিল চরণের কপালে। ফোঁটা পরাতে পরাতে আশ্চর্য হাসল ফকির। সোনামনির কপালে ফোঁটা পরাবার সময় মিহি গলায় শুধাল—কাঁহা যাতি; জানা ঘেরি? সোনামনি ও চরণ সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ল।

ফোঁটা নিয়ে চরণ ও সোনামনি ঘরে ফিরে পিতাজীকে জানিয়ে জানা-ঘেরির পথ ধরল। দ্বারিক ছেলে মেয়ে দুটোকে নতুন জামা কাপড়ে দেখে বেশ খুশী হয়েছে। তবে সাবধান করে দিল ওদের। ফেরার সময় অনেক রাতে যেন চারা শুকরামের সাথে আসে। অনেক রাতে

সোনামনি আর চরণকে ডিঙ্গালঘেরির রাঘব ডিঙ্গালের দ্বারের পাশ দিয়েই ফিরতে হবে।

পূজা মণ্ডপে সন্ধ্যারতি চলেছে। দুটো লোক ধুপ-ধুনুচি নিয়ে হেলে দুলে কোমর বেঁকিয়ে নাচছে। ধুনুচিগুলো কখনও মুখে করে কখনও মাথার উপরে রেখে তারা কসরৎ দেখাচ্ছে। নাচের তালে তালে ঢাক বাজছে। মাঝে মাঝে একটি লোক ধুনুচিগুলোতে ধুনা ছিটিয়ে দিচ্ছে। তখন খুব জোরে ধোঁয়া উঠছে। পুরোহিত ঠাকুর জোরে জোরে মন্ত্র আবৃত্তি করছে। তার গায়ে নামাবলি। এই ঠাকুরকেই একদিন সোনামনি চাঁদের মুখ দেখার কথা বলে, মুখের চোখের চশমাটির সাথে ঠাকুরের চশমাটির মিলের কথা বলে ধমক খেয়েছিল। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেলা বসেছে; চা পান বিড়ির দোকান। সেখানে ভীড় খুব। তাছাড়া আছে কাচের চুড়ি, আলতা ফিতে, পাউডার, মাথার কাঁটার মনিহারি ছোট ছোট দোকান। সেলুলাইডের সুন্দর সুন্দর খেলনার দোকানও আছে একটা। আর আছে মিষ্টি আর পাঁপর তেলেভাজার দুই একটী চালা। মাঝখানে সামিয়ানা খাটিয়ে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। যাত্রা আর কিছুক্ষণ পরেই আরম্ভ হবে। যাত্রাদলের লোকেরা সেজেগুজেই মাঝে মাঝে নিজেদের তাঁবু থেকে বের হচ্ছে নানান সাজ ওদের। তখন ভীড়ে একটা ফিসফিস আওয়াজ উঠছে। রাজা-রাণী, মন্ত্রী সীতা-বিভীষণ ইত্যাদি। সব-মিলে মিশে একটি আজব পরিবেশ তৈরী হয়েছে।

এসে এসেই সোনামনি চরণকে একটী ভেপু বাঁশী কিনে দিয়েছে। চরণের খুশী আর ধরে না। বাঁশী পেয়েই সে সেই যে মুখে লাগিয়ে ফুঁ দিতে শুরু করেছে আর থামে নি। চাচা শুকরামের সাথে খানিক পরেই দেখা হয়েছিল। চরণ চাচাজীর সাথে ঘুরছে।

সোনামনি চরণকে চাচাজীর সাথে দিয়ে ভীড়ের ভেতর নজর চালিয়ে রূপচাঁদকে দেখবার চেষ্টা করে। যাত্রার দলের একটি লোক বোধ হয় রাজার সাজে মেকআপ নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে আর তার সামনে একটা ছোটখাট ভীড় জমেছে। একটা জটলা হচ্ছে। রাজামশাই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে খুব গম্ভীর ভাবে

সিগারেট টানছে। এসব জটলায় সে যেন কানই দিচ্ছে না। ছেলে ছোকরার দল তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। যাত্রার দলের রাজাকে সাক্ষাৎ দেখে, এত কাছে পেয়ে তারা যেন সবাই অবাক হয়েছে আর খুব খুশী হয়েছে। রূপচাঁদও দাঁড়িয়ে রাজা দেখছিল। ঠোঁট লাল। বেশ বড় দুটো গোঁফ। ঝলমলে সিল্কের পোষাক গায়ে আর মাথায় একটা বড় পালকের ছোট মুকুট। রূপচাঁদের মনে সুন্দরী থালে মিন পেতনী, কদবেল গাছে জিনের চেহারা যেমন রাজারও তেমনি কল্পনা। তাই সে যখন শুনল লোকটা রাজা বটে তখন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। তার চোখ দুটো বড় বড় আর মুখটা অনেক ফাঁক হয়ে গেছে। সোনামনি সেই ভীড়ে রূপচাঁদকে দেখতে পেল। ভীড় ঠেলে রূপচাঁদের মুখোমুখি হয় সে। ভীড় থেকে বেরিয়ে এল দুজনায় ; সোনামনিকে পেয়ে রূপচাঁদ রাজা দেখা ভুলে গেল। এমন সময় যাত্রার ঘণ্টা বাজল। যাত্রার দলের অধিকারী এসে মঞ্চে জোড় হাত করে কি যেন সভাস্থ সকলকে নিবেদন করছে। হয়ত পালার কথা।

বেহালায় ছড়ির টান পড়ল। কোঁ কোঁ করে বেজে উঠল বেহালা। বেশ একটা বাহারে সুর উঠেছে তাতে। মঞ্চের চৌকির উপর এসে এমন সময় একটা মেয়ে কলসী কাঁখে নাচতে লাগল। ভীড়ের সব হট্টগোল তখন নিমেষে চুপ। ঝুমুর বাজছে মেয়েটার পায়। তার সাথে তবলার তাল। আর হারমোনিয়ামের সুর। সভাস্থ সকলে বুঝলে কেন রাজকন্যা নদীতে জল নিতে এসেছে। কারণ রাজকন্যার মতই সাজগোজ মেয়েটির। কিছুক্ষণ নাচ চল্‌ল। এর মাঝে মঞ্চে আবির্ভাব হয়েছে এক রাজকুমার। হাতে তার তীরধনুক। হয়ত শিকারে বের হয়েছিল। রাজকুমারীকে দেখে রাজকুমার নদীর ধারে দাঁড়িয়ে গেছে। তার হাবভাব দেখে মনে হল সে রাজকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। সে মঞ্চের এদিক থেকে ওদিক মুখ তুলে চোখ নাচিয়ে ঘুরতে লাগল। যেন সে খুব অবাক হয়েছে নদীর ধারে অপ্রত্যাশিত রাজকন্যার দেখা পেয়ে। রাজকন্যা হঠাৎ রাজকুমারকে দেখে নাচ থামিয়ে কলসী মাথায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে মুখটা নীচু করে। যেন

সে খুব লজ্জা পেয়েছে এমন মনে হল। এমন সময় রাজকুমার গান ধরল—

মুখো পানে চাউ
ফিরিয়া তাকাউ
নয়নও ভরিয়া দেখি।

বেহালা আর হারমোনিয়ামে তখন অন্য সুর লেগেছে। সভাস্থ সকলে সে গান মাথা দুলিয়ে উপভোগ করছে। ধীরে ধীরে রাজকন্যার লজ্জা কাটছে। সে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। ভীড়ের ভেতর কে যেন গলা ছাড়ল আহা—আহা। দুয়েকটি চুটকি তার সাথে।

সোনামনি আর রূপচাঁদ একটু দূরে দাঁড়িয়ে যাত্রা দেখছিল। দুজনার চোখাচোখি হল। দু জোড়া চোখই হাসছে। ব্যাপারটি তারা যেন বেশ বুঝতে পেরেছে।

ইতিমধ্যে রাজকুমার আর রাজকন্যার বেশ ভাব জমে গেছে। তারা হাত ধরাধরি করে কদম তলায় বসেছে। একটা কদম ফুল রাজকুমার পরিয়ে দিল রাজকন্যার খোঁপায়। বেহালাটা মোচড় দিয়ে উঠল।

প্রথম দৃশ্য নির্বাক শুধু গান ছাড়া। রাজকুমার রাজকুমারীকে নিয়ে নদীর ধার দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দুজনাই হাত ধরাধরি করে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আর ছোট ছোট কদম ফেলছে। এখন শুধু মন্দিরা বাজছে। বেহালা আর হারমোনিয়াম থেমে গেছে। ভীড়ের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা। সবাই আশঙ্কায় থ বনে গেছে। কারও কারও ভয়ে বুক কাঁপছে। শেষে রাজকুমার পালাতে পারবে তো। এমন সময় ঝন্ ঝন্ ঝনৎ করে করতাল বেজে উঠল। রাজকুমার আর রাজকন্যা মঞ্চ থেকে বিদায় নিল।

একটা লোক মঞ্চের উপর একটা চেয়ার রেখে গেল। সবাই বুঝল সিংহাসন। রাজার দৃশ্য। রাজদরবার বসবে। সত্যিই কিছুক্ষণ পর রাজা প্রবেশ করল তার সাথে মন্ত্রী সভাসদ। রাজদরবার বসেছে।

এমন সময় কোটাল এসে খবর দিল। বড়ই দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে সে। কোন এক রাজকুমারের সাথে রাজকন্যা পালিয়ে গেছে। নদীর ধারে দুই একটা রাখাল ছেলে খবর দিল।

রাজা সিংহাসন ছেড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার সাথে মন্ত্রী আর সভাসদ। খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে রাজাকে। ভীড়ের ভেতরও একটা উত্তেজনা। হঠাৎ রাজা হুঙ্কার ছাড়ল। এতবড় স্পর্ধা তার, —যাও চারিদিকে সৈন্য পাঠাও। দেখি সে কতদূর যায়।

দৃশ্যটা দেখতে দেখতে সোনামনি আর রূপচাঁদ ঘেমে উঠেছে। উত্তেজনায় দুজনার বুক দুর দুর করে কাঁপছে। এখুনি বুঝি একটা অঘটন ঘটবে। রাজার সৈন্যরা হয়ত রাজকুমার আর রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে আসবে। ভাবতেই শিউরে উঠছে তারা। তখন সমস্ত রাজ্যের লোক হাসি-ঠাট্টা করবে। বড় দুঃখ ওদের।

হঠাৎ সোনামণির খেয়াল হল এই রাজাই যাত্রা আরম্ভ হবার আগেই ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। পা ফাঁক করে। তার বেশ দেখতে ভাল লাগছিল। আর তখনই সে একটা কথা ভেবে রেখেছে। সেটা এখন রাজাকে দেখে মনে পড়ল। সে রূপচাঁদের একটা হাত ধরে টান মারে। একটা পানবিড়ির দোকানের সামনে রূপচাঁদকে দাঁড় করিয়ে একটা সিগারেট কিনে দেয়। রাজার মত করে রূপচাঁদ সিগারেট খাক, সে দেখবে। চুটি নয় সিগারেট। রূপচাঁদ অবাক হল; কিন্তু সিগারেটটা নিয়ে ধরাতে হয় তাকে। দুজনায় তখন কথায় ডুবেছে। যাত্রার পালাটা নিয়েই ওদের কথা হচ্ছে বেশী। আলাপ আলোচনায় রূপচাঁদ আর সোনামনি বুঝল তারা একমত। পালাটা ঠিকই বুঝেছে তারা দুজনায়।

একসময় চরণ আর চাচা শুকরাম এসে সেখানে উপস্থিত হয়। রূপচাঁদ সিগারেটটা টানতে টানতে সরে পড়ে। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। ঘরে যেতে হবে। চাচা সোনামনিকে জানায়। তাছাড়া চরণের খুব ঘুম পেয়েছে। তার পা টলছে।

ফেরার আগে সোনামণির কি খেয়াল হল দুটো মাটির পুতুল কিনে এনে একটা চরণের হাতে দিল। আরেকটা চাচার হাতে দিয়ে বলল

নীলমণি কা। চাচার বাচ্ছা মেয়ের জন্য সে পুতলটা কিনে এনেছে। সোনামনির মন তখন খুশীতে হাসিতে ভরা।

ঘরের দিকে পা বাড়াল ওরা তিনজনে। ফেরার পথে অন্ধকারে শুকরাম সর্দার সোনামনির মুখের দিকে চাইতে চাইতে পথ হাঁটল। কি যেন ঠাওর করার চেষ্টা করল শুকরাম। কিন্তু সেটা সোনামনি ধরতে পারল না।

॥ উনিশ ॥

বনতুলসী আর বনঝাউয়ের ঝোপে একদিন কুয়াশা নামল। হেমন্ত এসে গেছে। সূর্যবেড়িয়ার ভোরের আকাশে কুয়াশা ঘনিয়েছে; এ ভোর শিশির-স্নিগ্ধ কচুর পাতার ফিকে রঙের ভোর নয়। শরতের নীল আকাশ আর কোথায়ও নেই। অস্পষ্ট, ধুসর, কুয়াশাগন্ধী।

মিঠে জলের তাগিদে সেই ভোরে মাথায় কলসী নিয়ে সোনামনিকে বের হতে হয়েছে। সঙ্গে আছে সর্দার পল্লীর অন্যান্য বউঝিরা। যে যার কলসীতে আপন আপন ঘরের মিঠে জলটুকু ডিঙ্গালঘেরির মিঠে জলের পুকুর থেকে ভরে আনবে। কুয়াশা কাটলে, ভোর ফুটলে, সূর্য হাসলে আরও কাজ আছে ওদের হাতে, তাই কুয়াশাচ্ছন্ন গাংভেড়িতেই বউঝি মেয়ের দল বেরিয়ে পড়েছে। তাছাড়া বিদ্যাধরীর পাশে সর্দার পল্লী থেকে ডিঙ্গালঘেরির মিঠেপুকুর কমটুকু পথ নয়; যেতে আসতে অনেক সময় লাগে।

কলসীতে জল ভরতে বউঝিদের ভেতর গালগল্প হয়। সোনামনিও সে গল্পে যোগ দেয়। একবার খরার সময় পুকুরটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন নোনাজল খেয়ে মাসখানেক কাটাতে হয়েছিল বর্ষার আগ পর্যন্ত। যে যার ঘরের খবর নেয়। নানারকম হাসিঠাট্টা চলে। কলসীতে জল ভরে একসময় পুকুরঘাট থেকে উঠে আসে ওরা।

এখন ডিঙ্গালঘেরির উঁচুনীচু পথ দিয়ে পাঁচজন সর্দার মেয়ে এঁকেবেঁকে হেঁটে চলেছে। মাথায় ওদের জলভরা কলসী। পাঁচজনার ছোট্ট মিছিলটা কুয়াশার ভেতর মিলিয়ে যাচ্ছে। বাঁয়ে রাঘব ডিঙ্গালের গড়খাই। তার পাশে ডিঙ্গালের পেঁপে কলার বাগান। মধ্যে ডিঙ্গালের বাড়ি। গড়খাইয়ের ধারে কয়েকটা মুরগী চরছে। এই ভোরেই মুরগীগুলো দানা খুঁটতে বের হয়েছে। গড়খাইয়ের জলে কয়েকটা রাজহাঁস। মাঝে মাঝে লম্বা গলা উঁচিয়ে ডাক ছাড়ছে। এ পথটুকু সর্দার মেয়েরা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে আসে। পা একটু জোরে চালায়। মাঝে মাঝে এই

ভোরেই রাঘব ডিঙ্গাল ওদের সামনে পড়ে যায়। জবুথুবু হয়ে মাথায় ঘোমটা টেকে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ওরা ডিঙ্গাল কর্তার পথ করে দেয়। সোনামনি ঘোমটা টানে না। শুধু ঘাড়টা ঘুরিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ায়। ভোরে ডিঙ্গাল মশাই দাঁতন করতে করতে পায়চারী করে। মুরগী আর হাঁসগুলোকে ঘুরে ফিরে দেখেন।

রাঘব ডিঙ্গাল কিছুটা দূরে চলে গেলে ওরা আবার হাঁটতে শুরু করে। কোন কোন বউ-ঝি নিজেদের ভেতর রসিকতা করে বলাবলি করে ওদের দেখতেই এই ভোরে হাঙর মিনসেটা দাঁড়িয়ে থাকে। হাসি-ঠাট্টা করতে করতে ওরা ঘরে পৌঁছায়।

ইতিমধ্যে কুয়াশা কেটেছে। হেমন্তের আকাশে সূর্য জেগেছে। কলসীটা নামিয়ে রেখে সোনামনি দ্বারিক আর চরণের খোঁজ করে। ডুটো ভিজে ভাত হাঁড়িতে ছিল। দ্বারিক আর চরণকে চারটি বেড়ে দিয়ে নিজেও চারটি খাবে ভেবেছিল। কিন্তু দ্বারিক আর চরণকে ঘরে দেখতে না পেয়ে সোনামনি ঘর হতে বের হল। বাইরে এসে সোনামনি দেখল হেমন্তের গাংভেড়িতে ছোটখাট একটা মজলিস বসেছে। দ্বারিক সেখানেই। চরণও পিতাজীর পাশে গা ঘেঁষে বসে। তাছাড়া আছে চাচা শুকরাম, সুবল, পিতাম্বর নাপিত, নস্কর সর্দার আর বুড়ি দুর্গামণি। হেমন্তের ভোরে এরকম মজলিস বসে। নানাধরণের গালগল্প হয়। নানা সুখদুঃখের কথা, জলের কথা, ফসলের কথা, আগামীতে নবান্নের কথা হয়। বর্ষা, শরৎ, হেমন্তের পর উত্তরের বাতাসের কথাও এসে পড়ে। কথায় কথায় দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার নানা কাহিনী উপকাহিনীর কথাও ওঠে। নানা ঘটনা দুর্ঘটনার, নানা পতন আর অভ্যুদয়ের। অনেকেই এতে যোগ দেয়। সোনামনি গাংভেড়ির দিকে চলল। এরকম মজলিসে বসে নানা গাল-গল্প শুনতে তার বেশ ভাল লাগে। একপাশে এসে বসে সোনামনি। একশ বছরের বুড়ি দুর্গামণি তখন হাত পা ছেড়ে এক কাহিনী ফেঁদেছে। তাঁর পাঁচ-দশ পুরুষ আগেকার কথা। সবাই মন দিয়ে সেই কথাই শুনছে। বেশ উপভোগ করছে।

সে সব অনেকদিন আগেকার কথা। মুখে মুখে একপুরুষ থেকে গল্পটা আরেক পুরুষে বর্তিয়েছে। দুর্গামণি শুনেছে তার ঠাকুরদার কাছে।

ঠাকুরদা শুনেছিল তার ঠাকুরদার কাছে। পাঁচ-দশ পুরুষ আগে তাদের নিবাস কোথায় ছিল সেকথা দুর্গামণি সঠিক বলতে পারে না। তবে সে সময় সর্দারেরা জঙ্গলে শিকার করে বেড়াত। তাদের আর কিছু করার ছিল না শিকার ছাড়া। আর মেয়েরা থাকত ঘরে। একদিন পাঁচদশ পুরুষ আগের মাটিতে বর্ষা নামল আর দুর্গামনির পুর্বপুরুষের এক মেয়ে দেখল রাত্রির বর্ষায় উঠানের এক কোণে মাটি ফুঁড়ে একটা অঙ্কুর উঠেছে। এরই কিছুদিন আগে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা ফল খেয়ে তারই বীজ মাটিতে ফেলেছিল ওরা। সেই বীজ ফুঁড়েই অঙ্কুর উঠেছে। মেয়েটি তারপর থেকে রোজ ভোরে চারা গাছটাকে বাড়তে দেখে। এই দেখে সে হাততালি দিয়ে ওঠে। তার বিস্ময় আর ধরে না। মনে মনে কিছু একটা সে ঠিক করে ফেলেছিল। একদিন ভোরে সে নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে একটা বীজ পুঁতে দিল। আর প্রতিদিন সেখানে জল দিতে থাকল। দেখল, কয়েকদিন পর আবার বীজ ফুঁড়ে অঙ্কুর গজিয়েছে। চারাগাছটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। মেয়েটা আবার হাততালি দিয়ে উঠল। তার মাথায় আবার বুদ্ধি খেলল। সে মনে মনে ভেবে দেখল যা কিছু তারা খায় সে সব ফলের বীজ ঘরের পাশের জমিতে পুঁতলে আর একটু যত্ন করলেই তার থেকে গাছ হবে। সে গাছ বড় হবে। এবং একদিন ফল ধরবে। তার জন্ত আর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে না। শিকার থেকে পুরুষেরা ফিরে এলে কথাটা তাদের জানাল মেয়েটা। মরদগুলো হেসেই খুন। তারা কথাটায় আমল দিল না। ভাবল মেয়েটাকে জিনে পেয়েছে তাই এমন আবোল তাবোল বকছে। কিন্তু পল্লীর অন্যান্য মেয়েরা কথাটার একটা অর্থ খুঁজে পেল। পুরুষেরা শিকারে বের হলে মেয়েটার নির্দেশমত তারা মাটি খুঁড়ে বীজ পুঁতে দিল। আর রোজ তাতে জল দেয়। একদিন মেয়েদের নিজের হাতের পোঁতা গাছের ফল খেয়ে পুরুষগুলোর মাথা ঘুরে গেল। তারা অবাক হল। এদিকে মেয়েরা ঘরের কোণে খানিকটা জমি নিয়ে তাদের কাজ শুরু করেছে। আর এই ভাবে নাকি ধীরে ধীরে চাষবাসের কাজ শুরু হয়েছে। ক্রমে চাষের কাজে মেহনত যত বাড়তে লাগল তখন এল মরদেরা।

সামনে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। ধানের বুকে দুধ জমেছে। সোনালী রঙ গাঢ় হয়ে কমলা হচ্ছে। ধানের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়েছে। দুর্গামনি চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু সে অনুভব করতে পারে হেমন্তের বাসন্তী ধানের ক্ষেত। নাক ভরে গন্ধ নেয় ধানের মিঠে সুবাস। ধান ক্ষেতের দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে বোঝাবার চেষ্টা করে পাঁচ দশ পুরুষ আগে তাদের ঘরের এক মেয়ে যে কথা প্রথম জেনে কাজ আরম্ভ করেছিল তারই পরিণতি আজ সূর্যবেড়িয়ার হেমন্তের সোনালী মাঠ।

দুর্গামণির কাহিনী কতখানি সত্য তা দ্বারিক শুকরাম সোনামনিরা জানে না। তবে হেমন্তের গাংভেড়িতে বসে এসব কথা শুনতে তাদের প্রত্যেকেরই ভাল লাগে। শুনতে শুনতে তাঁদের মনে কিরকম একটা রোমাঞ্চ জাগে।

আজ ওদের কারও জমিই নেই আর ; তবুও নিজের হাতে বোনা ফসল পাকতে দেখলে ওরা এ রকম রোমাঞ্চ অনুভব করে। সুখ-দুঃখের কথায় মেতে উঠে। শরতের সবুজ দ্বীপ যখন সকালে কমলা হয়ে ওঠে তেমনি কোন সকালে বা বিকেলের গাংভেড়িতে বসে ওরা জটলা করে আর মাঠের কমলা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কখনও হাসে কখনও বা কাঁদে। যদিও ওরা জানে জমি করে মধুর দিনগুলি ওরা আর ফিরে পাবে না।

দোস্ত শুকরাম হাতের লাঠিটা বারকয়েক ঠুকল মাটিতে। কোন কিছু মনে করার চেষ্টা করছে সে অথচ গুছিয়ে কথাগুলো মনে করতে পারছে না। এ সময় মাটিতে লাঠি ঠোকে সে। তারপর মনে আসতেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা তোলে। দ্বারিকও খুব উৎসাহে তাতে যোগ দেয়। দুই দোস্তে কোনদিন ভুলবে না সে'দিনগুলোর কথা। সেদিন যেন সূর্যবেড়িয়াকে মনে হয়েছে একটা হাঁপি কুত্তার মত জিভ বের করে দিয়ে ক্ষুধায় আর শ্রান্তিতে হাঁপাচ্ছে। তামাম সুন্দরবনেরই নাকি এমন হাল হয়েছিল। খাল বিল চৌকার শাপলা শামুকও তখন ফুঁকে গেছে। গাছের পাতা সিদ্ধ করে খেয়েছে ওরা। তাও দরজা বন্ধ করে। কেউ যদি ইজ্জত দিয়ে একমুঠো ভাত পেয়েছে তাহলে ঘরের দরজা

বন্ধ করে চুপি চুপি খেয়েছে। এই দ্বীপেই ছিল ঈশান মোল্লার ঘর। তার মেয়েটা খেতে না পেয়ে মরে গেল। মরে গেল তো ভালই হল। মেয়ের পচা মাংস খাবলে নিয়ে ঝলসে খেল ঈশান। তারপর পাগল হয়ে গেল। দেওয়ানা হয়ে হাসতে হাসতে বুকে দম ধরল। পাঁজর বের করা কলিজায় অত হাসি সহ্য হবে কেন। হঠাৎ ফুসফুসটা থেমে গেল। সবই ওদের নিজের চোখে দেখা। আজ আর দ্বারিকরা দরজা বন্ধ করে থাকে না। বিপদে-আপদে, অভাবে অনটনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বেলতলীর হাটে যায়। বেলতলীতে সভা হয়। কে কে ধানের গোলা ভর্তি করে? তারা কারা? কেনইবা? যোগ্য মজুরি মেলে না কেন? ছেলে মেয়ে বউ ঝিরা ভুখায় রোগে শোকে জিরায় কেন, কাদের জন্য—এমন কতশত প্রশ্ন মনে নিয়ে ফিরে আসে দ্বারিক, শুকরাম, নিবারণ সর্দার, পিতাম্বর নপিতের দল।

কথা বলতে বলতে শুকরাম সর্দারকে উত্তেজিত দেখায়। এসব কথায় তার উত্তেজনা আসে। আর সবাই হাঁ করে শোনে ওর কথাগুলো।

কিন্তু বেশীক্ষণ সবাই গাংভেড়িতে বসে গল্পগুজবে মশগুল থাকতে পারল না। আজ কালীপূজা। কেউ কেউ ওদের মধ্যে কালীপূজা করে। মাটির ঘটে তেলসিঁদুরের চিত্রি দেয়। ঘটে দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে। ঘটের সামনে নৈবিদ্যি দেয় দুই একটা হাঁস বা মুরগীর ডিম। হাত কেটে নিজের রক্তে ফোঁটা পরায় দেবীকে। মা সে রক্ত গ্রহণ করেন প্রসন্ন মনে। বংশানুক্রমে সর্দারদের এই প্রথা। তাছাড়া দেবদেবীকে পূজা দেবার মত ওদের আছেই বা কি, ভাবে ওরা। রক্ত হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র। সেই রক্তই গ্রহণ করে দেবী, বনবিবি, মা মনসা।

গাংভেড়ি থেকে উঠে দ্বারিক ঘরে এসে চারটি ভিজে ভাত খেয়ে ডাঙটি নিয়ে বের হল। নোনাঘেরির পাড়ে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে বসল সে। দুটো কেঁচো হাতে তুলে কচুর পাতায় রাখতে গিয়ে কেমন যেন মনে হল দ্বারিকের। কেঁচো দুটো যেন ছটফট করছে। এমন রোজ করে না। আজ কালীপূজা। সাক্ষাৎ সৃষ্টি ও ধ্বংসের

দেবী মা কালী। চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী। তাই মাটির তলায়, জলের ভেতর, আকাশে বাতাসে কেঁচো থেকে আরম্ভ করে নোনাঘেরির মাছগুলো, কদবেলের মগডালে শঙ্খচিলটা, গাংভেড়ির চালচড়া, ফাঁকে-ফোকরে শাখামুঠি, কেউটে দাঁড়াস। চৌকার ঘোগ আর করকা, মাঠে কোঁড়ার দল সবাই মিলে এক বিচিত্র আলাপ জুড়েছে। সে আলাপ এক আশ্চর্য্য কলরব হয়ে দ্বারিকের কানে পৌঁছাল।

উঠে দাঁড়াল দ্বারিক। সে আজ কেঁচো খুঁড়বে না। মাছ মারবে না। জগৎ সংসারে সমস্ত প্রাণী আজ মার প্রসাদ খাবে। সেই জন্যই এই কলরব। আকাশে, বাতাসে, জলে অন্তরীক্ষে। মাটির বুকে কান পেতে সেই কথাই শুনল দ্বারিক সর্দার। আর ডাঙটি নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের পথ ধরল।

॥ বিশ ॥

হেমন্ত এসে সবার আগে রতিকান্ত শ্যামলের দরজায় টোকা দেয়। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায় সব লোক একথাই বলাবলি করে। কিন্তু এবারে শরৎ গেল। কার্তিকের কমলা মাঠে সোনার ঢেউ খেলল অথচ সে খবর রাখল না রতিকান্ত শ্যামল। সেদিন সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোয় কমলার মুখ দেখে যে ভাবনাটা অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে ভেবেছিল রতি সেই ভাবনাটাই হেমন্তের কড়া নাড়ার শব্দকে ডুবিয়ে দিয়েছে; শুনতে দেয় নি। অন্যান্য বছর এসময় রতিকান্ত বেরিয়ে পড়ে গাংভেড়িতে গাংভেড়িতে, সর্দার পল্লীতে। কিন্তু এবারে এধারে তাকে কেউ দেখে নি। ডিঙালঘেরিতে অত বড় দুর্গাপূজার ধুমধাম গেল তাতেও রতিকান্ত শ্যামলকে দেখা গেছে দুই একবার। তাকে দেখে সবাই চমকে উঠেছে; মানুষটা যেন এ কয় মাসেই বুড়িয়ে গেছে অনেক বেশী। শক্ত সমর্থ চেহারাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। কেউ জিজ্ঞাসা করেছে—অসুখ হয়েছিল নাকি হে, কেউ বা কুশল জানতে চেয়েছে। রতি সংক্ষেপে জবাব দিয়েছে। আসলে এড়িয়ে গেছে।

বাড়ীর উঠানে পায়চারি করছে শ্যামল। ঘরের মেঝেয় পড়ে পড়ে কোঁকাচ্ছে কমলা, ওর বাচ্চা হবে। কমলার গোঙানিতে থেকে থেকে থমকে দাঁড়াচ্ছে রতি। ওর মনের কানাতে কানাতে একটা ভাবনা ঝিলিক মারছে। সেদিন মরিচঝাঁপি থেকে দ্বারিকের ফিরে আসার পর সর্দার পল্লী দিয়ে যেতে যেতে দুদণ্ড শুকরাম সর্দারের ঘরের কাছে দাঁড়িয়েছিল রতি। শুকরামের বউটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাঁখেতে বাচ্চাটা, রতিকান্ত তাকিয়ে দেখেছিল শুকরাম সর্দারের বউটাকে। সে অন্য এক দৃষ্টিতে, মেয়েটাকে মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাচ্চাটা কাঁখে নিয়ে ওর দাঁড়াবার ভংগীটা অখণ্ড রূপে ধরা দিয়েছিল রতির মনে। যেন মা আর শিশুতে মিলে একটা ছবি।

ছেলে কাঁখে অনেক বউ ঝিকে দেখেছে সে এর আগে। কিন্তু এ রকমটি হয় নি কোনদিন। গাংভেড়ি ধরে ঘরের পথে ফেরার সময় এ কথাগুলো ভেবেছিল রতিকান্ত। এর কদিন আগে রতি জানতে পেরেছে কমলার পেটে ছেলে এসেছে। যদিও খবরটা ওর অনেক আগেই রাখা স্বাভাবিক ছিল।

সন্ধ্যার ফিকে ছায়া গাঢ় হয়ে অনেক আগেই রাত্রি নেমে এসেছে। উঠানের অন্ধকারটা সামনের গাংভেড়ি ছাড়িয়ে বিদ্যাধরীতে গিয়ে মিশেছে অমাবস্যার রাত্রি ভীষণ অন্ধকার নেমেছে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার বুকে। উঠানের অন্ধকার সারৎসারে রতিকান্তর খেয়াল হল তার চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে।

আকাশের দিকে এক সময় চোখ তুলে তাকিয়েছিল রতিকান্ত। আকাশের বুকে তার পরিচিত নক্ষত্রগুলোকে দেখবে বলে।.. কিন্তু আকাশ দেখতে না পেয়ে, আকাশের বুকে পরিচিত নক্ষত্রপুঞ্জ দেখতে না পেয়ে, সামনের গাংভেড়ির ঝোপ-ঝাড়, গাছ-গাছালি দেখতে না পেয়ে সে বুঝল অমা-অন্ধকার। রতির ভাবনার রঙয়ের সাথে এই অন্ধকারের একটা অকৃত্রিম যোগাযোগ ঘটেছে যেন। সেই মুহূর্তে তার মনে হল সূর্যবেড়িয়ার আকাশে আর কোনদিন নক্ষত্র ফুটবে না। ফুটলেও তার পরিচিত নক্ষত্রগুলোকে সে আর কোন দিন খুঁজে পাবে না। এ আঁধার চিরস্থায়ী হবে। গাংভেড়ির গাছগাছালি, বিদ্যাধরী পাঠানখালির রূপালী জলও বুঝি ভোরের আলোয় আর দেখা যাবে না। রতির ইচ্ছে হল এই অনন্ত অন্ধকারে সেও মিশে থাকবে চিরদিনের মত, চিরকালের মত। তুলসী তলায় এসে দাঁড়াল রতিকান্ত। তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যা প্রদীপটা অনেক আগেই নিভে গেছে, কমলা সন্ধ্যায় জ্বালিয়েছিল। দু-পা পিছিয়ে এল রতিকান্ত। লজ্জা আর লজ্জা—অস্ফুটস্বরে কথা দুটি উচ্চারণ করল সে। যেন বহু যুগ থেকে তার উঠানের অন্ধকারে তুলসীমঞ্চে নিভে যাওয়া প্রদীপ সাক্ষী রেখে এ কথা দুটিই বলার জন্য রতি এতদিন ধরে বেঁচে আছে। লজ্জা আর লজ্জা, মুখ দেখতে লজ্জা। কৃতকার্যের জন্য লজ্জা, বেঁচে থাকতে লজ্জা। ভাবনাটা যেন রতির মনে লজ্জায় রূপান্তরিত হল। অবাক হয়ে রতি নিজেই বুঝল অন্ধকারে

সে সত্যি সত্যিই লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তাকে কেউ না দেখে ; এমন কি কমলাও না দেখে ফেলে। রতি যেন এই অন্ধকারেই গা ঢাকা দিতে চাইল।

রতির আঠারো কচি বউটার ছেলে হবে। মা হবে কমলা! রতি হবে বাপ! এতে লজ্জা কিসের! প্রশ্নগুলো রতি নিজের মনে নাড়াচাড়া করছে। এক সময় সে ঘুরে দাঁড়ায়। সে নিজের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের মুখোমুখি হতে চায়। লজ্জা আর লজ্জা। আবার কথা দুটি উচ্চারণ করল রতি বিড় বিড় করে। এত আস্তে যে গাংভেড়ির মাতাল হাওয়ায় সে কথা ফিসফিসানি মনে হল। আর রতির ক্ষীণ কণ্ঠে যেটুকু আওয়াজ বেরিয়েছিল তা বাতাসের এক ঝাপটায় বিদ্যাধরীর জলে গিয়ে আছাড় খেয়ে ঢেউয়ের সাথে মিলিয়ে গেল। হ্যাঁ, ছেলে হবারই লজ্জা। এতক্ষণ পর যেন রতি নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। প্রশ্নগুলো নিজের মনে নিজেকেই করল সে ; ছেলেটা কার? তার! রাঘবের! তার না রাঘবের!

রতিকান্ত শ্যামল। ঘর তার মেদিনীপুরে। সেই মাটিরই মেয়ে কমলা। সেই মেয়েকেই একদিন বিয়ে করে এনেছিল রতিকান্ত। সে বছর দুয়েকের কথা। রতিকান্ত ঘর ছেড়েছিল সেই ছোটবেলা। তারপর বছর পনেরো বয়স থেকে রাঘব ডিঙ্গালের কাছে আছে বিশ বছর ধরে। এই বিশ বছরের ইতিহাসটা তার নায়েব হবার ইতিহাস। আর সে কথা রতির নিজের চেয়েও ভাল করে জানে সূর্যবেড়িয়ার মাটির তলাকার দশবিশটা কঙ্কাল। স্ত্রী আর পুরুষের।

একদিন রতিকান্ত দেখল সিন্দুকে তার টাকা জমেছে বিস্তর। দেশে ফিরে বিয়ে করে আনল কমলাকে, কচি বউ তার। শাল পিয়ালের মাটির মেয়ে।

কিন্তু রতিকান্ত প্রথমে নায়েব পরে অন্য সব কিছু। এ কথাটা জেনেছে সে তার আশৈশব পোড় খাওয়া জীবনে। এবং কথাটা একদিন মনে করিয়ে দিল রাঘব ডিঙ্গাল। মাছ ধরতে এসে সে দেখেছিল কমলাকে। সকালের মাঠে কমলা গরু দুটোকে চরাতে এসেছে। চোখে রঙ ধরেছিল রাঘব ডিঙ্গালের। তাই অভিলাষ জানাল

রতিকান্তকে। যদিও বলার সময় একটু ভণিতা করতে হয়েছিল। টাকা থাকলে পুরুষ মানুষ দশটা বিয়ে করতে পারে। হুজুরের ইচ্ছাটা যেন তাড়াতাড়ি পূরণ হয়। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে… ইত্যাদি। শেষে খানিকটা চাপও দিয়েছিল রতিকে। কেন না রতি যেমন তার হুজুরের মেজাজ্‌ মর্জি দুর্দমনীয় ইচ্ছাগুলোর খবর রাখে, রাঘব ডিঙ্গালও রতিকে চিনতে, বুঝতে এতটুকু ভুল করে নি। তাই অত সহজেই প্রস্তাবটা করতে পেরেছিল রতিকান্তের কাছে।

রতিকান্ত শ্যামল রাঘব ডিঙ্গালের নায়েব। যেতে হল কমলাকে রাত গভীর হলে। সে সব অনেক অনেক অত্যাচারের কাহিনী। অনাথা কমলার সে ছাড়া আর গতিই বা কি ছিল। দেশে পালিয়ে যাবার কথা মনে হয়েছিল তার। কিন্তু পথ-ঘাট চিনেও যদি শেষে তার গ্রাম দুধকুণ্ডিতে গিয়ে সে পৌঁছাত সেখানেও আশ্রয়ের কোন আশ্বাস ছিল না। কুলত্যাগিনী, স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়েকে গ্রামে কেই বা আশ্রয় দেবে। তাই রফা হল, কমলা একদিন রাজী হয়ে গেল। হুজুরের সেবায় তেমন কি দোষ আছে গা! বলেছিল রতিকান্ত শ্যামল কমলাকে। কমলাকে যেতে হল। রাঘব ডিঙ্গাল অভ্যর্থনা জানাতে ত্রুটি করে নি।

সেই কমলার ছেলে হবে। ঘরের মেঝেতে প্রসব বেদনায় গোঙাচ্ছে সে। অন্ধকার উঠোনে দাঁড়িয়ে রতিকান্ত শ্যামল। লজ্জা আর লজ্জা। ভীষণ লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছে সে।

বাচ্চাটা দিন দিন বড় হবে। আর মুখ-চোখ-নাকের আদল দিন দিন স্পষ্ট হবে। আর শেষে একদিন কোন বদরসিক লোক যদি বলেই ফেলে—ভাই রতি, ছেলেটা দেখতে আমাদের ডিঙ্গাল কর্তার মত হয়েছে হে। অন্ধকারে রতিকান্তের সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। এত কাঁপুনি রতিকান্তের ভিতর ছিল একথা সেও আগে জানত না। এত লজ্জা তার মনে জমা হয়ে আছে একথা সে কোন দিন টের পায় নি। আজ বুঝল; এই প্রথম।

অন্ধকারে হাতের মুঠো দুটো শক্ত হয়ে আসছিল রতিকান্তের অনমনীয় এক চিন্তায়। মুঠো দুটো খুলে হাতের চেটো পাশাপাশি

রাখল রতি। হাতের সমস্ত রেখা-উপরেখাগুলো দেখতে চায় সে, এই মুহূর্তে হাতের কোন রেখা বদলায় কি না! কিন্তু অন্ধকারে সে চেষ্টা নিষ্ফল হল। কোন রেখাই চোখের সামনে ফুটে উঠল না। সব রেখা অন্ধকারে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

কখনও মনটাকে, কখনও বিবেকটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এই হাত দুটো দিয়ে অনেক কিছু করেছে সে। রাঘব ডিঙ্গালের বিশ্বাস, আস্থা অর্জন করিতে গিয়ে হাত দুটো অনেক জল ঘেঁটেছে। সে নায়েব হয়েছে। যোগ্যতা দেখাতে গিয়ে তার হাত দুটোই সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

সর্দার মরদদের জমিগুলো কেড়েছে এই হাত দুটোই, সিংহঘেরির ছোট কর্তাকে লোক লাগিয়ে খুন করেছে এই হাত দুটোই। জমি নিয়ে কাজিয়ার সময় এই হাত দুটোই···শিউরে উঠল রতিকান্ত পাঁচ বছর আগের অঘ্রাণের কুয়াশাচ্ছন্ন এক হিম রাত্রির কথা ভেবে। কুয়াশায় গা ঢেকে মধ্যরাত্রিতে বস্তায় করে একটা লাস এনে নামাল রতিকান্ত সর্দার পল্লীর বাঁকের হিজল গাছটার তলায়। রাঘবের নির্দেশ; হিজল গাছের ডালে টাঙিয়ে দিল রতি মেয়েমানুষের লাসটাকে। আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েছিল সে; কেউ যদি টের পায়, জানাজানি হয়; জানে খতম হয়ে যাবে সে। হুজুরকে বলেছিল লাসটাকে বাগানের মাটিতে পুঁতে দিতে। কিন্তু রাঘবের ঐ এক ইচ্ছা। শালার সর্দারটা জ্বালিয়েছে বড়। তার মাগীটাকে একটু নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে দেখে জানে মেরে ওদেরই নাকের ডগায় টাঙিয়ে দেওয়া হবে এর চেয়ে মজাদার কি আছে। বলেছিল রাঘব ডিঙ্গাল। মাথা নিচু করে যেতে হয়েছিল রতিকান্তকে। নায়েব সে। এই হাত দুটোই কমলাকে ঠেলে দিয়েছে রাঘবের বুকে। আড়ালে অনেকে বলেছে হাতদুটোই রতির পঙ্গু হয়ে যাবে। একথা কানে গেছে রতিকান্ত শ্যামলের। কিন্তু হয় নি কিছুই। এখনও অটুট আছে। বরং নানা কাজে চটপটে হয়ে উঠেছে। আগে যেটুকু দ্বিধা ছিল এখন সেটুকুও নেই। আজ ভোর পর্যন্ত এ নিয়ে তার গর্বও ছিল। কিন্তু অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে কমলার প্রসব বেদনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে গর্ব বোধ

তার ধুলিস্যাৎ হল। হাত দুটো এখন কেমন অবশ আর ঝিমঝিম করছে। পঙ্গু হয়ে যাবে না তো! বিদ্যাধরীর গাংভেড়িতে তেঁতুল গাছের উপর উকাশটা প্রথম রাত্রিতেই হঠাৎ চীৎকার ছাড়ল। সে চীৎকারে চমকে উঠল রতিকান্ত; ভয়ে ভয়ে হাত দুটো দিয়ে মুখ ঢাকল। উকাশটা ডাকে মাঝরাতে কিংবা ভোররাতে। প্রথমরাতে উকাশটার চীৎকার তার মনে কেমন একটা ধোঁকা ধরিয়ে দিল। উঠানময় পায়চারী শুরু করল রতি।

পায়চারী করতে করতে রতির সারা শরীরে ও মনে শিহরণ জাগে। বিষাদের ভাবটা, লজ্জার ভাবটা কেটে গেল তার। কেমন যেন একটা সুর লেগেছে তার মনে।

রাত পোহালে ভোর হলেই রাঘব ডিঙ্গালের মুখোমুখি দাঁড়াবে সে। একটা ফয়সলা করবে। যা আজ বিশ বছর ধরে পারে নি সে। নায়েব পদে ইস্তফা দিয়ে কলঙ্ক নিয়ে চলে যাবে সে সূর্যবেড়িয়ার মাটি ছেড়ে তার দেশ মেদিনীপুরে। কমলাকে শেষবারের জন্য ক্ষমা করতে বলবে রতিকান্ত। সব ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবে তারা শাল-পিয়ালের মাটিতে। সূর্যবেড়িয়ার অভিশপ্ত নোনামাটি ধীরে ধীরে ভুলে যাবে তারা। দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার আগে গাংভেড়িতে দাঁড়িয়ে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে রতিকান্ত। সর্দার পল্লীর দ্বারিক আর শুকরাম সর্দারের কাছে। হ্যাঁ, জানাঘেরির বড় কর্তাকে গিয়ে বলবে সে দশবছর আগে কার নির্দেশে কেমন করে ছোট কর্তা গুম হয়ে গিয়েছিল। গাঢ়ুর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলার প্ররোচনা কে জুগিয়েছিল। সব কথা খোলসা করে বলবে রতিকান্ত শেষবারের মত।

এক ছুটে ঘরে গেল রতিকান্ত। পাশে বসে কমলার মাথাটা কোলে টেনে নিল। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় কমলার মুখটা কেমন বিবর্ণ মনে হল তার। কেমন পাঁশুটে। কমলার সারা মুখে আর কপালে ঘাম জমেছে। কয়েকটা চুল সেই ঘামে কপালে লেপ্টে আছে। আস্তে আস্তে রতি চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিল কমলার। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিল। পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে কমলার মাথায় বিলি কাটতে শুরু করল সে। যাতে বেদনার একটু উপশম হয়।

এতক্ষণ কমলা থেকে থেকে গোঙাচ্ছিল। এবারে আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। বড় অসহায় বোধ করল রতিকান্ত, বড় অপরাধী মনে হল নিজেকে। ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়াল রতিকান্তের। পরিণত বয়সে জীবনে সে এই প্রথম কাঁদল। রতিকান্তের ছোট ছোট ঘোলাটে কুটিল চোখে তখন জলের বাষ্প জমেছে। কমলা এক সময় বিস্ময়ে দেখল রতির চোখে জল। ফুঁপানো কান্নাটা থামল তার। কি এক স্থির বিশ্বাসে রতিকান্তের কোলে সে ঘুমাবার চেষ্টা করল। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে।

দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার ডিঙ্গালঘেরির একচালার কুঠিতে দুটি স্ত্রী পুরুষের চোখের জল এক হয়ে মেশার সাক্ষী রইল অন্ধকার রাত্রি। সেই অন্ধকার সারৎসারে রতিকান্তের খুব ঘুম এল। কমলার মাথাটা আস্তে আস্তে বালিশে নামিয়ে রাখল রতি।

কমলার পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে আধো ঘুমের ভেতর সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। ঘুমের ভেতরই সে অনুভব করল এক পরম প্রশান্তি। সারা জীবনেও যার স্বাদ সে কোন দিনের জন্যে পায় নি।

ভোর। অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকারে গাংভেড়ির যে গাছগুলো একাকার হয়ে গিয়েছিল সেগুলো এখন ভোরের হাওয়ায় মাথা দুলাচ্ছে। আকাশ জাগছে। নদীতে জোয়ার শুরু হয়েছে।

ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে গত রাত্রির কথা মনে হল রতিকান্তের। কমলা তখনও ঘুমাচ্ছে। রাত্রির সঙ্কল্পগুলো এখন রতির মনে দলা পাকিয়ে গেছে। সে সব সঙ্কল্পের কথা ভালভাবে স্মরণেও আনতে পারছে না। তবুও যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেগুলোই নেড়ে চেড়ে দেখল সে। গাংভেড়িতে দাঁড়িয়ে দ্বারিক আর শুকরাম সর্দারের কাছে ক্ষমা চাওয়া হাস্যকর মনে হল তার। জানাঘেরির বড়কর্তার কাছে সব কথা ফাঁস করার কথা মনে করতে আঁতকে উঠল। কমলার কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাঘব ডিঙ্গালের মুখোমুখি দাঁড়ান, নায়েব পদে ইস্তফা দেওয়া, সূর্যবেড়িয়ার মাটি ছেড়ে চলে যাওয়া এ সবই একেবারে অসম্ভব মনে হল তার। বরং সে বিস্মিত হল কেমন করে সে গত রাত্রে এ সব কথা ভাবতে পেরেছে। অথচ ভেবেছিল সে ঠিকই।

অমাবস্যার রাত্রিতে স্তিমিত লণ্ঠনের আলোয় রতিকান্ত যে চোখে কমলাকে দেখেছিল, যে চোখে নিজেকে দেখেছিল, যে ব্যথা কমলার জন্য অনুভব করেছিল, যে প্রায়শ্চিত্তের কথা নিজের জন্য ভেবেছিল, এই ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। বরং বিপরীত একটা চিন্তা তখন তার মনে ধীরে ধীরে জাগছে।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে সেই চিন্তাটা একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাল তার মনে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর এল। দুপুরে প্রসব বেদনাটা আবার জাগল কমলার। অন্তিম প্রসব বেদনা বুঝল রতিকান্ত। ফতুয়াটা গায়ে চাপিয়ে ছাতাটা নিয়ে বের হল রতি ঘর থেকে। পাঠানখালির ধারে রাক্ষসবন্দি ঘাটের অজগর ময়াল বিষাক্ত প্রান্তরে ঝুমুরধাইয়ের ঘরে যাবে সে। যেতে যেতে কথাগুলো সাজাল সে মনে মনে। যে কথা তার ঝুমুরধাইয়ের সাথে হবে। কথাগুলো মনে মনে সাজাতে একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকাল রতিকান্ত। যেমন করে ঝোপ-ঝাড়ের খেঁকশিয়ালগুলো রাস্তা পার হয়। না, কাছে পিঠে কেউ নেই। নিশ্চিন্ত হল রতিকান্ত।

দূর থেকে ঝুমুর দেখল গাংভেড়ি ধরে রতিকান্ত শ্যামল তারই ঘরের দিকে আসছে। ঘোর দুপুরে রতির আবির্ভাবে ঝুমুর উৎসাহ বোধ করল। একগাল হাসি নিয়ে সে রতিকান্তর অপেক্ষায় রইল। মনে মনে সম্ভব অসম্ভব নানা কল্পনায় মেতে উঠল ঝুমুর। ঘরের দরজায় রতিকান্ত পৌঁছাতেই সে হাসিটা তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ঘরের দরজা ভেজিয়ে খাটিয়ার ওপর এসে বসল দু'জনায়।

কমলার ছেলে হবে, যেতে হবে। আর বাদ বাকী কথাটা না বলে দুহাতের ভংগীতে বুঝিয়ে দিল রতিকান্ত। জড়িবুটি সব আছে তো? কথাটা শেষ করল সে জড়িবুটির প্রশ্ন দিয়ে। ঝুমুরধাইয়ের কিছু বুঝতে আর বাকী রইল না।

তাকি আর না রাখিরে ভাই, এই পোড়া পেটটা যখন আছে। রতির কথার জবাব দেয় ঝুমুর একটু ঘুরিয়ে। তারপর সুর পাল্‌টিয়ে মুখে একটা নির্বিকার ভাব এনে বলে—কিন্তু কি জানিস, বুড়ো হতে চললাম, ওসবে আজকাল ডর আসে, তাছাড়া পরকালের কথাটা একবার ভেবে দেখতে

হয়। তাই বলি কি…। রতিকান্ত শ্যামলও পরকালে বিশ্বাস করে ; কিন্তু ঝুমুরের কথাটা শুনে তার কেমন যেন ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছে করল, রতিকান্ত জানে এটা ঝুমুরের চাপ দিয়ে কিছু বেশী আদায় করার মতলব। তবু সে শান্ত গলায় বলল—দর বাড়াচ্ছ ? যা চাইবে তাই পাবে, হ্যাঁ দেখ কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়।

—নারে ভাই, না। ঐ করেই তো খাই। ঝুমুর আশ্বাস দিল। সে খুশী হয়েছে বেশ কিছু মোটা রকম পাবে বলে।

সব গোছগাছ করে নিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে রতিকান্ত আর ঝুমুর যখন কমলার ঘরের দরজার কাছে পৌঁছাল তখন সমস্ত ঘরে একটা আঁশটে, হাওয়া পাক খাচ্ছে। কমলার পরণের শাড়ীটা রক্তে ভিজে গেছে। পায়ের কাছে বাচ্চাটা পড়ে চেঁচাচ্ছে ছুটে গিয়ে রতিকান্ত বাচ্চাটাকে দুহাতে তুলে নিল। তার দিকবিদিক জ্ঞান নেই তখন। সব যেন চোখের সামনে ঝাঁ ঝাঁ করছে। একটা বেটা ছেলে হয়েছে। রতিকান্ত খুব খুঁটিয়ে নবজাতকের মুখ চোখ নাক দেখতে লাগল। রতির ছোট চোখ দুটো তখন খুব বড় বড় দেখাচ্ছে। সদ্যজাত শিশুর মুখের আদলের সাথে অন্য কারও মুখের আদলের মিল খুঁজে পাওয়া যায় কিনা রতিই জানে। কিন্তু সে মুহূর্তে তার মনে হল এটা রাঘবের বাচ্চা। এই নির্ধারণে এক অদৃশ্য নিয়তি যেন তাকে পেছন থেকে তাড়া করছে। বাচ্চাটাকে মাটিতে আবার নামিয়ে রাখল রতিকান্ত। ইসারায় ঝুমুরকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে বলে।

ঝুমুরধাই তার কাজ এসেই আরম্ভ করে দিয়েছে। কয়েকটা শিকড় শিল নোড়ায় বেটে রসটা একটা গ্লাসে ঢেলেছে। আরেকটা বাটিতে দুফোঁটা মধু জলের সাথে মেশাল সে। ঘরে এসে কমলার মাথাটা কোলে তুলে নিল। বাচ্চাটাকে ধুইয়ে মুছিয়ে আগেই মধুর জল খাইয়েছে সে। চুক চুক করে খেয়েছে মধুটা। এবারে শিকড়ের রসটা চামচে করে কমলার মুখে ফেলে দিল সে। গ্লাসটা সরিয়ে রেখে হাত পাখায় কমলাকে হাওয়া করতে থাকল। ঝুমুর কমলার কপালে একটা চুমু খেল। কমলার মুখটা কালচে হয়ে আসছে বিষের ধকলে। ফিস ফিস করে এক সময় বলল—জ্বালা জুড়াক তোর মা ; পরজন্মে শান্তি নিয়ে ফিরে

আসিস। আমরা আসছি তোর পিছনে। কথাগুলো বলতে বলতে আঁচলের খুট দিয়ে···তারপর চীৎকার করে উঠল—ভুল হয়ে গেছে রে রতি, সর্বনাশ হয়েছে, সব শেষ হয়ে গেল। ঝুমুরের চীৎকারে বাচ্চাটা কেঁদে উঠেছে।

রতিকান্ত বাইরের বারান্দায় পায়চারী করছিল। ঝুমুরের চীৎকারে ঘরে এল। দেখল কমলার মুখ দিয়ে সবুজ ফেনা গড়াচ্ছে। সারা মুখ কালচে হয়ে গেছে। হিকা উঠছে তার। এখুনি শেষ হয়ে যাবে। চোখ দিয়ে আগুন ঝলসাল তার। ভাবল দশটা আঙ্গুলের ফাঁকে ঝুমরকে দম আটকে মারে। তারপর সাজিয়ে গুজিয়ে লাসটা পাঠিয়ে দেবে রাঘবের কাছে। নবান্নের ভেট। রাঘব দেখুক তার পুরানো মেয়েছেলেটার গতরে আর কোন স্বাদ সোয়াদ আছে কিনা! কিন্তু সামলে নিয়ে রতিকান্ত ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে বললে—যাও, ফিরে যাও যাবার মুখে সবাইকে বলে যাও ছেলে হতে গিয়ে কমলা মারা গেছে, তাকে বাঁচান গেল না।

বিকেলের গাংভেড়িতে কমলার চিতার পাশে বেশ ভীড় জমেছে। এসেছে অনেকেই। এমন কি ডিঙ্গালঘেরির কর্তা রাঘব ডিঙ্গালও। এ ভীড় এড়িয়ে ঝুমুর বসে আছে দূরে একটা সোঁদালগাছের তলায়। কমলার চিতার লাল হলুদ আগুনের হল্কায় রাঘবের মুখটা স্পষ্ট দেখছে ঝুমুর। অনেকদিন পর মুখটি দেখল সে। এ মুখ তার খুব পরিচিত। তখন ঝুমুরধাই ছিল ঝুমুর বিবি। একদিন যৌবনে পড়ল ভাটা। সামান্য ব্যাপারে খিটিমিটি আরম্ভ হল তখন। ছেঁড়া জুতোর মত হল পরিত্যক্ত। সেই থেকেই রাক্ষসবন্দিঘাটে ধাই বিদ্যা কিছু জানা ছিল তার সেই কারণ পেটটা চালাচ্ছে। কিন্তু সূর্যবেড়িয়ায় আর কটা মেয়েমানুষ বিয়োয়। তাই পেটনামাতেও যেতে হয় তাকে। তখন কিছু টাকা মেলে। রতিই এ ব্যাপারে তার সহায় ছিল। রতিরও দুপয়সা হয়। আজ দুপুরে রতি যখন প্রথম প্রস্তাবটা করে, ভালমানুষের মত সে রাজী হয়ে গেল। তাই বিষটা খাওয়াল কমলাকে বাচ্চাটার পরিবর্তে।

বাচ্চাটাকে দিল মধুর জল। তারপর চীৎকার ছাড়ল, ভুল হয়ে গেছে রে রতি, সর্বনাশ হয়েছে।

যৌবনে পোড় খাওয়া ঝুমুর বিবি চল্লিশের প্রান্তে এসে আঠারো বছরের মেয়ের মুখে তুলে দিল বিষের পাত্র। এ যেন তার হারান যৌবনটাকেই দ্বিতীয়বার গলা টিপে মারল সে। যে যৌবনটা তাকে অনেক জ্বালিয়েছে। ঝুমুর নির্ঘাত জানে কমলারও একদিন চটক ফুরাবে। তখন রং চটা পুতুল নিয়ে কি করবে রাঘব ডিঙ্গাল। রতিও হয়ত তার দেশ থেকে আরেকটা আঠারো কচি মেয়েকে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে নিয়ে আসবে হুজুরের নির্দেশে। আর কমলা। তার চেয়ে আগামী জন্মে একটু শান্তি নিয়ে ফিরে আসুক কমলা মাটির বুকে তাড়াতাড়ি।

কমলার চিতাটা নিভে আসছে। সারা অঙ্গ পুড়ে খাক হল। সোঁদালের অন্ধকারে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে অনন্ত রাত্রির কাছে, আকাশের নক্ষত্রের কাছে, পৃথিবীর ঘাস, জল, ফুল, মাটির কাছে, এক অদৃশ্য শক্তির কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানাল ঝুমুর ধাই —কমলার আরেক জন্মের জন্য, একটু শান্তি নিয়ে ফিরে আসার জন্য।

অজস্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে সে।

॥ একুশ ॥

কমলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায় ডিঙ্গালঘেরি থেকে শুরু করে সিংহজানাঘেরি পর্যন্ত অনেক গুজব রটল, অনেক জল্পনার সৃষ্টি হল। সে রটনা জল্পনা থেকে মোদ্দা ব্যাপারটা যে যার মত কল্পনা করে নিল। তবুও তারা একদিন আশ্চর্য্য হয়ে দেখল ছাতি মাথায় রতিকান্ত শ্যামল আবার সর্দার পল্লীর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, কে কে ফসল কাটার কাজে যাবে তার খোঁজ খবর নিতে। রাঘব ডিঙ্গালের জমিতে সস্তা দরে লোক পাকড়াবার মতলব তার। তেমনি মিষ্টি হেসে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছে সে। যেন কোন কিছুই ঘটে নি। কোন শোকের বা বেদনার ছায়াই তার মুখে ধরা পড়ে নি। শুধু পাঁচ কথার সময় একবার বলেছিল বউটা জবাব দিল, বাচ্চাটাকে বাঁচানো যাবে কিনা কে জানে! অবশ্য এর কদিন পরেই বাচ্চাটা মারা গেল। বাচ্চাটাকে নিজের হাতে পুঁতলো রতিকান্ত শ্যামল বেশ নির্বিকারে। সে দৃশ্যও সর্দার পল্লীর অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে।

অঘ্রাণের ভোর রাত্রি। হেমন্তের কুয়াশা ঘনিয়েছে সমস্ত সূর্য-বেড়িয়ার প্রান্তরে। ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ধানের সমুদ্রে, সুন্দরী বেদানা খালে, বিদ্যাধরী আর পাঠানখালির ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় এক মায়া সৃষ্টি করেছে। ধানের ক্ষেতের ভেতর থেকে কোড়ার ডাক ভেসে আসছে,—ডুক ডুক ডুক, থেমে থেমে। অঘ্রাণের রাত্রি ভোরে জ্যোৎস্না ভেজা প্রান্তরের বাতাসে সে শব্দ সারা সূর্যবেড়িয়ার ঘুম জাগা মানুষকে মনে করিয়ে দিল আজ নবান্ন। আলো ফুটলে, সূর্য উঠলে নবান্নের উৎসব শুরু হবে।

দ্বারিকের ঘুমটা অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। ঘর থেকে দাওয়ায়

এসে বসেছে সে। ভোর রাত্রিতে জেগে উঠে কুয়াশা ভেজা জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, অনেক কথাই মনে হচ্ছে তার। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার গাছগাছালি, কাছের ও দূরের ঘরবাড়ি সব অস্পষ্ট ধূসর দেখাচ্ছে। অনেক দূরে রতিকান্ত শ্যামলের চালাটা ঘন কুয়াশার ভেতর থেকে যেন দ্বারিকের চোখের সামনে ফুটে উঠল। রতির উঠানের তুলসী তলায় কবেকার নিভে যাওয়া সন্ধ্যাপ্রদীপটা হয়ত আর জ্বলে ওঠে নি। রাতভোরে কমলাকে একবার রাঘব ডিঙ্গালের বাড়ি থেকে বের হতে দেখেছিল দ্বারিক। সারা মুখে ঘামের ছোপ, পরনের শাড়িটা আলু-থালু। আর কোনদিন কমলা ভোররাতে চুপি চুপি ঘরে এসে রতির পাশে ঘুমিয়ে পড়বে না। কথাটা মনে হল দ্বারিকের। কমলার মৃত্যুর কথা মনে হল তার। কমলার মৃত্যুতে সূর্যবেড়িয়ায় নতুন করে ঝুমুর ধাইয়ের প্রসঙ্গে যে আলোচনা উঠেছে সে কথাও মনে করল সে। অনেক ভয় ভাবনার কথা মনে এল ওর। কিন্তু এ সব কথা দ্বারিকের মনে বেশীক্ষণ ঠাঁই পেল না। ভোরের নবান্নের কথাই বড় বেশী তার মন জুড়ে রয়েছে। সাধের পরবটাই রয়ে গেছে। নেই জমি, জমি থেকে উঠবে না অঘ্রানের ফসল। যাতে করে নবান্ন হবে। তবে আর পাঁচটা জিনিসের মত পরবটা চলে আসছে অনেককাল থেকে, জমিতে একটা টান আছে তাদের প্রত্যেকের।

ভোর হবার সাথে সাথেই নিবারণের জমির ধারে ভিড় করে এসেছে অনেকে। দ্বারিক, শুকরাম, সোনামনি, চরণ, নীলমনি, বুধু, কৈলাস সর্দার আর পাঁচদশজন সর্দার মেয়ে পুরুষ। নিবারণ আর রূপচাঁদ ডেকেছে সবাইকে। পরবের সময় কোন কাজিয়ার কথা মনে থাকে না ওদের। যে ফসল অঘ্রাণে নিবারণের গোলায় উঠবে তা নিবারণের একান্ত নিজস্ব। কিন্তু নবান্নের ভোরে এই পরবকে কেন্দ্র করে সবার মনেই যেন নতুন করে আশা আকাঙ্খার ছোঁয়া লেগেছে।

একগুচ্ছ ধানের গায়ে তেল সিঁদুর মাখাল নিবারণ আর তার বেটা রূপচাঁদ। ঘুনসির মালা জড়িয়ে দিল ধানের গুচ্ছের চারিদিকে। দুজনায় গড় হয়ে বসে মন্ত্র পড়ছে। চারিদিকে একটা পবিত্র ভাব-গম্ভীর আবহাওয়া। একসময় মন্ত্র শেষে উঠে দাঁড়াল দুজনায়।

রূপচাঁদ সঙ্গে এনেছে একটা কালো মুরগী। মন্ত্র পড়ে কালো-মুরগীটাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে আকাশে। তখন যে খুশী মুরগীটা ধরতে পারে। কালোমুরগী উড়ানো নবান্ন উৎসবের একটা অঙ্গ। বাঙালী হিন্দুদের যেমন হরিরলুটের বাতাসা। এ মুরগী যে পাকে সে ভাগ্যবান। লক্ষীঠাকুরুণ সারা বছর তার ওপর প্রসন্ন থাকবে। ভীড়ের ভেতর তাই সাড়া পড়ে গেছে। মরদ মেয়ে সব কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। মুরগী ধরতে হবে। নবান্নের কালো মুরগী।

মুরগীটাকে দুহাতে আকাশে ছুঁড়ল রূপচাঁদ। পাখা ঝাপটিয়ে মুরগীটা শূন্যে কিছুক্ষণ পাক খেল। সবাই তখন সেদিকে ছুটেছে ছেলে, বুড়ো, মরদ-মেয়ের দল। কিন্তু মুরগীটা ধরল একজনই। সে কৈলাস। কৈলাসের আনন্দ আর ধরে না। মুরগীটাকে সে ঘরে বেঁধে রাখবে। ঘরে তার লক্ষ্মী বাঁধা থাকবে।

বিকেলে ওরা বেলতলীর হাটে গেল। হাড়িয়ার রসে বুকটা গলাটা ভেজাতে। সন্ধ্যায় তা না হলে পরবের নাচটা জমবে কেন। দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম সন্ধ্যার আগেই ফিরেছে বেলতলী থেকে। বেশ নেশা ধরেছে দুজনার। আজ বুড়ি দুর্গামনি ঘরে বসেই হাড়িয়া গিলেছে। অনেকদিন পর সে হাড়িয়া খেল। সেই যৌবনে হাড়িয়া খেত। এমন পরবের দিনে হাড়িয়া না খেয়ে কেউ থাকতে পারে! তাই বেটাকে বলে দিয়েছিল হাড়িয়া আনতে। সেও যাবে পরবের নাচে। চোখে দেখতে না পাক মনের অন্য সব ইন্দ্রিয় দিয়ে সে অনুভব করবে পরবের নাচটাকে।

সুন্দরীখালের ধারে একটু একটু করে ভীড় জমছে। দুটো গরুকে তেল সিন্দুর হলুদ মাথায় শিংএ ও কপালে মাখানো হয়েছে। খুরে দেওয়া হয়েছে সিন্দুর। দোস্ত শুকরামের সব দেখে শুনে অনেকদিন পর কেমন যেন একটু নাচতে ইচ্ছে হল। দ্বারিকের হাত ধরে টান দিল সে। কিন্তু দ্বারিকের সোনামনি আর চরণের সামনে নাচতে কেমন যেন সঙ্কোচ আসে। লাজ লাগে। সে দোস্ত শুকরামকে ঠেলে দিল নাচের দলের দিকে।

নাচের সাথে মাদল বাজছে। আর গলা ছেড়ে সবাই গান ধরেছে। নাচের ছন্দে, গানের সুরে আর নেশায় সবাই মশগুল তখন।

মাঝে মাঝে সমস্ত নাচের দলটা থেমে গিয়ে গরুভুটোর পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করছে। ওরা বলতে চাইছে, হে ভগবান, তুমি সারাবছর আমাদের জন্য কত মেহনৎ কর, তাই অঘ্রাণে নবান্নের ফসল ঘরে উঠছে। সেই ফসল উৎসবে তোমাকে বন্দনা করি, তোমাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। জন্মে জন্মে এই কৃতজ্ঞতার শেষ নেই! এই করুণার শেষ নেই! তাই তোমাকে ঘিরে আজ আমরা নাচছি, গাইছি! উৎসবে মেতে উঠেছি!

অনেক রাত্রি ধরে নাচগানের পরব চলল। নেচে, গেয়ে, হল্লা করে ওরা একসময় ক্লান্ত হল। পরব শেষে যে যার ঘরের দিকে চলল।

দ্বারিক আর শুকরাম ভীড় থেকে সরে এসে একটা গেঁওগাছের আড়ালে দাঁড়াল। কি যেন শলাপরামর্শ হল ওদের। তারপর অন্ধকারের দিকে হাঁটল। ওদের সাথে চরণও আছে।

নবান্নের পরবকে মানত করে দ্বারিক একগুচ্ছ ধান জমি থেকে তুলে কোন ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখবে সোনামনির সাদির কথা ভেবে। দিন সাতেক পর যদি দেখে ঝোপের ভেতর ধানের গুচ্ছ অক্ষত রয়েছে, কেউ নজর দেয় নি তাহলে হবে মঙ্গল। যে কথা মনে মনে ভেবে ধানের ছড়া রাখবে, সে কাজে কোন বিঘ্ন ঘটবে না, সে কাজ শুভ হবে, সুখের হবে, শান্তির হবে।

জানাঘেরির পূজোর মেলায় সোনামনির আর রূপচাঁদের এই ঢলাঢলিটা শুকরামের ভাল লাগে নি। পরদিনই এসে বলেছিল কথাটা দোস্ত দ্বারিককে। সেদিনই দুজনায় বসে ঠিক করল সোনামনির সাদির কথা। তিন নম্বর ঘাটের গনেশ সর্দারের বেটার সাথে সাদির কথা দ্বারিক আর শুকরাম গিয়ে একরকম বলে এসেছে। মেয়ে দেখতে আসবে গণেশ; মাঠের ধান কাটা শেষ হলে। কাজটার নিশানা চায় ওরা। শুভকাজের আগে দেখতে চায় কাজটা সত্যিসত্যি মঙ্গলের হবে কিনা। তার নিশানা নেয় এই প্রথায়।

দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম যেতে যেতে কখন একছড়া ধান মাঠ

থেকে তুলে নিয়েছে। গাঢ়ুর ঘরের পাশ দিয়ে বেদনা খাল ছাড়িয়ে নোনাঘেরি ডাইনে রেখে ওরা এসে থামল গাংভেড়িতে। গাংভেড়ির একটা কাঁটাঝোপের সামনে এসে দাঁড়াল দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম। ঝোপটার মধ্যে ধানের ছড়াটা রাখল দ্বারিক বেশ ঢেকেঢুকে। যাতে কেউ না দেখতে পায়। দুই দোস্ত তখন সোনামনির সাদির কথা ভাবছে। শুকরাম সর্দার একসময় বলল যার সাথে কাজিয়া তার ঘরে বেটি দেবার নয়। রূপচাঁদ নিবারণের কথা বলল সে। চরণ ওদের পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। পিতাজী আর চাচাজীর কাণ্ড-কারখানা। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে সে। তাই কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে।

অনেকরাতে এক ঘুমের পর চরণের ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। সোনামনি আর পিতাজীর মাঝখানে সে শুয়ে আছে। দুজনাই ঘুমে অচেতন। চরণের ঘুম আসছে না। গভীর রাতে চরণের ঘুম না আসলে এলোপাথাড়ি ভাবে সে। ভোরে পরবের কথা, কালো মুরগীরটার কথা, বিকেলে নাচগানের কথা, বাড়ি ফেরার পথে পিতাজী আর চাচা শুকরামের সব কথাবার্তা একে একে মনে হল তার। ঝোপটার কথাও ভাবল সে, ধানের ছড়াটার কথা ভাবল। ওখানে তার বহিনের জন্য একটা ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে বলে মনে হল তার। পিতাজী আর চাচার মতলবের কথা ভাবল সে। বহিনের জন্য চরণের কেমন যেন একটা কান্না পেল। পাশেই সোনামনি ঘুমাচ্ছে। ঘুমালে সোনামনির মুখটা কেমন করুণ দেখায়। অনেক রাতে চরণ জেগে উঠে জোৎস্নায় সোনামনির মুখ দেখেছে। সব সময়ই একই কথা মনে হয়েছে তার। সেদিন পুজোতে চাচার কাছে তাকে দিয়ে সোনামনির চলে যাবার পর তার খুব গোসা হয়েছিল। পরে বাড়ি ফেরার আগে রূপচাঁদের সাথে সোনামনিকে দেখে তার অভিমানও হয়েছিল। কিন্তু দিদির দেওয়া বাঁশিটা বাজাতে বাজাতে তার সব গোসা, অভিমান জল হয়ে গেছে। আগের মত আবার সোনামনিকে ভাল লেগেছে তার। তিন নম্বর ঘাটের গনেশ সর্দারের বেটার সাথে পিতাজী সোনামনির সাদির ঠিক করেছে। সে কথাই দ্বারিক আর শুকরাম ঘরে ফেরার পথে বলাবলি করছিল। অথচ চরণ জানে এতে দিদির খুব কষ্ট হবে। কথাটা সোনামনি জানেও না। তারই

অগোচরে সব ঘটছে। চরণের সেই মুহূর্তে সোনামনির জন্য খুব কান্না পেল। আর সেই কান্নার ভেতর সে মনে মনে স্থির করল সব কথা সোনামনিকে জানাতে হবে। এমনকি ঝোপটাও দেখিয়ে দিতে হবে। ঝোপটা দেখিয়ে দেবার ব্যপারে তার যেটুকু দ্বিধা ছিল এই কান্নার ভেতর সেটুকুও কেটে গেছে।

রাত্রির ভাবনাগুলো ভোর হবার সাথে সাথে আরও প্রকট হল। ইচ্ছাগুলো দুর্বার হল চরণের। শিশু মনে সঙ্কল্পের ঠাঁই বড় জবর। আর জবর বলেই শুধু দুর্বার নয়, দুর্ণিবার। কিন্তু সোনামনিকে সে কথাগুলো কিছুতেই বলতে পারবে না। তাই ঘর থেকে বের হল সে রূপচাঁদের খোঁজে। যেতে যেতে সব কথা মনে মনে গুছিয়ে নিল সে। ঝোপটায় লুকিয়ে আছে পিতাজী আর চাচাজীর একগুচ্ছ মর্জি। মর্জিটাকে লুকিয়ে বিনাশ করবে সে। কারণ মর্জিটায় তার মন সায় দেয় না। তাহলে দিদির খুব তকলিফ হবে। তখন আফশোষের সীমা থাকবে না। কিসের তকলিফ, কি জন্য বা আফশোষ এ ব্যাপারগুলো সে যে ভাল করে বোঝে তা নয় তবুও মনে মনে সে এ রকমই চিন্তা করে। আর বুকটা তখন খুব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। মনটা শির শির করে।

এখানে সেখানে ফসল কাটা আরম্ভ হয়েছে। রূপচাঁদ সকালেই গেছে তাদের মাঠে। নিবারণ তখনও আসে নি; রূপচাঁদ কাস্তে দিয়ে ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে ধানের শীষগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছে কতটা পুষ্ট হয়েছে দানাগুলো। বাপ বেটার মেহনতের ফসল এবার তোলা হবে গোলায়। দালাল আসবে, ফড়ে আসবে। দাদন নিয়েছিল যাদের কাছে তারাও আসতে কসুর করবে না। তখন ধান বেচা কেনা হবে। সামান্যই অবশিষ্ট থাকবে তাদের গোলায়। তবুও নগদ পয়সার দরকার। তাই ধান বেচতে হবে।

চরণ এসে দাঁড়াল মাঠের আলে। হাত তুলে ইসারা জানাল রূপচাঁদকে। চরণের মাথার কাছাকাছি ধানের শীষগুলো ভাসছে। চরণ সেগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে বুড়ো আঙ্গুলে ভর করে দাঁড়াল। গলাটা উঁচু করে মুখটা তুলে রূপচাঁদকে ডাকল হাতের ইসারায়। একগুচ্ছ

ধানের শীষ হাতে নিয়ে রূপচাঁদ এসে পড়ল চরণের সামনে। চোখে রূপচাঁদের প্রশ্ন ছিল। হয়ত সোনামনি পাঠিয়েছে। আর চরণের মনে হল রূপচাঁদের হাতের ধানের গোছাটা রূপচাঁদের নসীবের ইংগিত দিচ্ছে। অথচ রূপচাঁদ সেটা জানে না। আর সে কথাটা জানতে এসেছে চরণ এই ভোরে রূপচাঁদের খোঁজে। সব কথা ওর মনে ঠেলাঠেলি করে জায়গা করে নিচ্ছে। হুটোপুটি করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুকটা চরণের জোরে ওঠানামা করছে। উত্তেজনার সময় এ রকমই হয়।

পিতাজী আর চাচা শুকরামের বাতচিতের কথা বললে চরণ। পরবের নাচের শেষে কাল সন্ধ্যায় ঘরে আসার পথে যা যা ঘটেছে সব বলল তিন নম্বর ঘাটের গনেশ সর্দারের বেটার সাথে সোনামনির সাদির কথাও বলতে ভুলল না। সব কথা বলে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল রূপচাঁদের দিকে। কিন্তু সে মুখের কোন পরিবর্তন দেখল না চরণ। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি মূহূর্তকাল দাঁড়িয়ে রইল রূপচাঁদ। হাত থেকে ধানের গোছাটা মাটিতে পড়ে গেছে তার। সেটা এক সময় তুলে নিল। হাসতে হাসতে চরণকে বলল সে স্বপ্ন দেখেছে ; ওসব কিছু নয়। চরণ আবার হাত পা নেড়ে রূপচাঁদকে বোঝাবার চেষ্টা করে এটা স্বপ্ন নয়। যা যা ঘটেছে সবই নিজের চোখে দেখা তার। যা যা শুনেছে সবই নিজের কানে। কিন্তু রূপচাঁদ তবুও হাসছে চরণকে কাছে টেনে এনে।

একসময় চরণ চলে এসেছে। অভিমানে, দুঃখে, রাগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না উঠল তার। তাকে না বোঝার জন্য, তাকে এই অবিশ্বাসের জন্য ; কিন্তু সে আর সোনামনির কাছে যাবে না। যা ঘটে ঘটুক।

॥ বাইশ ॥

ঘরের মেঝেয় একটা কেন্নোর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ঘারিক। অনেক দিন হতে সে জ্বরে বেহুঁশ। দোস্ত শুকরাম এসে এই কদিন পাঁচন তৈরী করে দিয়ে গেছে, বলেছে সেরে যাবে, ও কিছু নয়। কিন্তু সেরে উঠবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। আজ সন্ধ্যা থেকে জ্বরটা আরও ধুম হয়ে এসেছে। হু হু করে কাঁপুনি উঠেছে সারা গায়ে। তারপর একসময় ছেঁড়া কাঁথার তলে নিস্তেজ হয়ে গেছে সারা দেহটা। একটা কেন্নোর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে।

এখন শেষ রাত ; কৃষ্ণাচতুর্দশীর অন্ধকার সূর্যবেড়িয়ার বুকে একটা নিস্পন্দ নিশার তরঙ্গ তুলেছে। ঘরের কুটিল অন্ধকারে সোনামনি একা জেগে পিতাজীর কেন্নোর মত কুঁকড়ে যাওয়া শরীরটা অনেকক্ষণ ধরে দেখবার চেষ্টা করে এইমাত্র দেখতে পেল। কৃষ্ণাচতুর্দশীর আকাশের মত তার মনে একটা বিরাট অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শেষ রাতের আকাশের মত নিস্পন্দ নয়। গহীন কালো জলের তলায় মাছেরা বুড়-বুড়ি কাটে। বুড়বুড়িগুলো শ্যামা শ্যাওলার গাছে আটকে গিয়ে ঘুরপাক খায়, এক সময় ফেটে পড়ে। সোনামনির মনের অন্ধকার গহ্বরটায় তেমন কয়েকটা বুদবুদ উঠেছে। বুদবুদগুলো নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। এই অন্ধকারে সোনামনি এবারে চেষ্টা করল চরণের মুখটা দেখতে। মুখ হাঁ করে পিতাজীর পাশে শুয়ে আছে ছেলেটা। অন্ধকারে ইঁদুরের মত দাঁতগুলো চকচক করছে তার। সারা মুখে ঘামের সাথে লেপটে আছে এক প্রশান্ত সরলতা। এই রকমই শিশু সরলতা নিয়ে সে সব কথা বলতে গিয়েছিল রূপচাঁদকে। কিন্তু রূপচাঁদ হেসে ফিরিয়ে দিয়েছে, বলেছে সব স্বপ্ন। অন্ধকারে স্বর-পুঁটির মত সরল মনে হল ছেলেটাকে সোনামনির। এছাড়া আর কোন মিল খুঁজে পেল না সে। আষাঢ়

শ্রাবণে বৃষ্টির দিনে চরণ ভিজে ভিজে ভাঙা চালের তলার দাওয়ায় বসে বাদাম তোলা হেঁতালের নৌকা বানিয়েছে। এ রকম নৌকা তৈরী করা চরণ তার কাছ থেকেই শিখেছে। বর্ষাক্ষুব্ধ দিনগুলোতে দাওয়ায় বসে বসে নৌকা জলে ভাসিয়ে ধীরে ধীরে সেই নৌকা অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে পুলকে হাততালি দিয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বলেছে পিতাজীর মত সে মাঝি হবে। ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে পুরন্দরের মুখ দেখে আসবে। এক সময় খেলা শেষ হলে ভাত ভাত করে কেঁদেছে। কোলে টেনে সোনামনি - বুঝিয়েছে আর কদিন পরই তাদের ভাত জুটবে। মাঠের কাজ আরম্ভ হল। শ্রাবণের শেষে পিতাজী মরিচ ঝাঁপির সফরে বের হল। চরণ প্রথম কদিন পিতাজীর প্রতিশ্রুত পিরানের আশায় আশায় খুব আনন্দে কাটিয়েছে। পরে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

পিতাজীর ফিরে আসার রাত্রিটার কথা মনে হল সোনামনির। শাড়ি নেই, পিরাণ নেই, বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ি নেই। পুটলি ফাঁকা। আছে কটা চুটি। সব দেখে চরণ বোবা চোখে তাকিয়েছিল সোনামনির দিকে সোনামনি সে চোখের সামনে বেশীক্ষণ বসতে পারে নি। ধীরে ধীরে উঠে এসেছিল দাওয়া থেকে ঘরে। সোনামনি পিতাজীর সফরের দিনগুলিতে চরণকে বুঝিয়েছে পিতাজী এলে সব মিলবে। দুবেলা ভাত জুটবে তাদের। কিন্তু পিতাজী সব ঝুট প্রমাণ করেছে। এখন আর কি বলে আশ্বাস দেবে সে তার ছোট ভাইটাকে। শুধু একটা কথা ভেবে সোনামনি তৃপ্তি পেল ; পুজোর সময় চরণের জন্য তার কামানো রূপেয়ায় সে একটা গেঞ্জী কিনে দিতে পেরেছে বলে। পিতাজীকেও বলেছিল কিনতে, কিন্তু পিতাজী রাজী হয় নি। পুজোর মেলায় তার কিনে দেওয়া বাঁশীটা চরণ রোজ সারাদিন ধরে বাজায়। এখনও অনেক দিন ধরে বাজাবে। সেদিন চরণের আবদারে সে গাংভেড়িতে গিয়ে কয়েকটা রঙিন পোকাও সংগ্রহ করে দিয়েছে তাকে। চরণ খুব খুশী হয়েছে। শরৎ আর হেমন্তে চরণ অনেক পোকা সংগ্রহ করে তার ঝাঁপিতে রেখে দিয়েছে। পোকা খেলার দিন এল। ঝাঁপি শুদ্ধ সে সোনামনিকে দেখিয়েছে। একে একে তার পোকা সংগ্রহের

কাহিনী বলেছে দিদিকে। সোনামনি সব শুনে পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়েছে ভাইকে। অন্ধকারে এইসব স্মৃতি মিষ্টি লাগছে সোনামনির।

সোনামনি ওঠে। ঘরের কোণ থেকে পুটলি খুলে পুজোর সময় কেনা ডোরাকাটা বেগুনি শাড়িটা বের করল সে। পুটলিতে চরণের গেঞ্জীটাও আছে। পুজোর কটা দিন ছাড়া দুই ভাই বোনে নবান্নের পরবেই পরেছিল শাড়ি আর গেঞ্জীটা। তাছাড়া আর পরে নি। গেঞ্জীটা পুটলিতে বেঁধে রেখে ছেঁড়া কানিটা ছেড়ে নতুন শাড়ী পরল সোনামনি। চিরুণি নিয়ে এক সময় চুল আঁচড়াতে বসল সে। চুল পাট করে একটা এলোখোঁপা বাঁধল। খুব সন্তর্পণে সব কাজ করছে সে। যাতে চরণ না জেগে যায়। ঘরের দোরে পিতাজী যাতে বিরক্ত না হয়। কুলুঙ্গিতে নারকেলের মালা থেকে টিপটা নিয়ে সে কপালে পরল। লাল টকটকে টিপ। এমন সময় বাইরের দাওয়ায় কৃষ্ণাচতুর্দশীর অন্ধকারে একটা ছায়া পড়ল। সোনামনির মনের অন্ধকার গহ্বরে যে বুদবুদগুলো এতক্ষণ নড়ে চড়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল সেগুলো ফেটে গেল। একটা হিমশীতল স্রোত সোনামনির সারা মনে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এখন মনের গহ্বরটা ঠিক শেষ রাতের কৃষ্ণাচতুর্দশীর আকাশের মতই নিস্পন্দ। ক্রমে সোনামনি একটা মুরগীর জরায়ুর মত কুঁকড়ে গেছে। হাত পা-গুলো অসাড় মনে হচ্ছে তার। এতক্ষণ তার মনে একটা ফিকে আশা ছিল যদি সে না আসে……আর কিছু ভাবতে পারল না সোনামনি।

পিতাজীর মাথার কাছে বসে সে কাঁদছে। চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল গড়াচ্ছে, কিন্তু খুব নিঃশব্দে। এসময় শব্দ হলে বিপদ ঘটবে। তাই কান্নার বেগটা সংযত করে রাখবার চেষ্টা করছে সে। চরণরা যে জেগে যাবে শুধু তা নয় রূপচাঁদও ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন করবে রো-তা। রূপচাঁদ এসে গেছে, বাইরের দাওয়ায় তারই ছায়া পড়েছে।

পা টিপে টিপে দরজার কাছে এল সোনামনি। উত্তেজনা আর আশঙ্কায় তার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। চৌকাঠ পার হতে গিয়ে একবার মনে হল চরণের মাথায় একটা চুমু দিয়ে আসবে কিন্তু চরণের জেগে যাবার আশঙ্কায় তখন সে চৌকাঠ পার হয়েছে। রূপচাঁদের একটা হাত ধরেছে।

গাংভেড়ির কদবেল গাছটার মাথায় একটা উকাশ প্রহর ঘোষণা করল। রাত্রি ভোর হতে আর কয়েক দণ্ড বাকী।

সেই বেহুঁশ জ্বরের ভেতর দ্বারিক হঠাৎ চোখ খুলল। চোখ চেয়েই দেখল দুটো ছায়া দাওয়ায় নড়ছে চড়ছে। বাইরের দাওয়ায় ওদের ফিসফিসিনির শব্দ কানে এল তার। একবার মনে হল জ্বরের ঘোরে সে সব ভুল দেখছে আর শুনছে। কিন্তু ঘরের মেঝের চারিদিকে তাকিয়ে যখন সে দেখল সোনামনি কোথাও নেই তখন কোন সন্দেহই তার অবশিষ্ট রইল না। একটা আচমকা আশঙ্কায় ওর বুকটা ধ্বক করে উঠল। বেটিটা পালিয়ে যাচ্ছে তার দুষমনের বেটা রূপচাঁদের সাথে। সবই ভরা যৌবনের ভেলকী। কাঁচা রক্তের কারসাজি। ভাবল দ্বারিক, বেটিটা তার বেহুশ বাপকে রেখে, মা-মরা কচি ভাইটাকে রেখে ঘর ছাড়ছে এই ভাবনায় মনটা হুহু করে উঠল তার। পরক্ষণেই শিরদাঁড়া সোজা করবার চেষ্টা করল দ্বারিক। বেইমানির কসুর নেই; যেমন বেটির বুঝ নেবে সে, তেমনি রূপচাঁদের সাথে মোকাবিলা হবে। দেখা যাক জোয়ান রক্তের ভেলকী কত। ইজ্জতের টানাপোড়েনে কার খুনের বাহার কত খোলে। ঘরের কোণে বর্শাটার কথা মনে হল দ্বারিকের। উঠে বসবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু এপাশ ওপাশ করার শক্তিও তার রহিত হয়েছে। কেন্নোর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে রইল। একটা আহত বাঘের মত সমস্ত দ্বীপ কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়তে চাইল সে। যে চীৎকারে তামাম সূর্যবেড়িয়ার সব লোক একসাথে জেগে ওঠে। কিন্তু গলা দিয়ে একটা নেংটী ইঁদুরের মত চিঁ চিঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হল না। সে শব্দে দ্বীপসূর্যবেড়িয়ার কৃষ্ণাচতুর্দশীর অন্ধকার সারৎসারে একটা পোকা মাকড়ও জাগল না। দু'হাতে বুক চাপড়াতে ইচ্ছে হল দ্বারিকের। বড় বড় কোঁকড়ান চুলের গোছা ছিঁড়তে ইচ্ছে হল কিন্তু হাত দুটো অবশ হয়ে গেছে; খানিকটা উঠেই আবার বুকের ওপর পড়ে গেল। উত্তেজনায় বুকে হেঁটে বেটিকে ধরবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু চিৎ হতেও সে পারল না। নিস্তেজ হয়ে যেমন পড়ে ছিল তেমনি পড়ে রইল। উত্তেজিত হবার শক্তিটুকুও যেন তার লোপ পেয়েছে। তখন চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছে তার।

ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র চলেছে যেন। তার ভেতর দ্বারিক অসহায় একটা কাঁচপোকার মত শুধু লুটোপুটি খাচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে দ্বারিকের। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে সব আলো নিভে আসছে যেন। পৃথিবীর সব রঙ নিভে গিয়ে শুধু অনন্ত অন্ধকার। দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার আকাশে কোন বৃহস্পতি, কালপুরুষ বা সপ্তর্ষির আর আবির্ভাব ঘটবে না যেন। দ্বারিকের পরিচিত লাল তারাটি মাথার উপর আর কোনদিন জাগবে না। শুধু অন্ধকার, অমা-অন্ধকার, অনন্তকাল ধরে সূর্যবেড়িয়ার আকাশে বিরাজ করবে ; বায়ুমণ্ডল ক্রমেই দূষিত হবে, জল জমে বরফ হবে, পানীয়ের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না ; আর দ্বারিক সর্দার, দ্বীপসূর্যবেড়িয়ার অনেক কথা-কাহিনীর পয়লা নায়ক একটা কেন্নোর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে নিস্তেজ, নিঃসাড় হয়ে পড়ে পড়ে শেষের দিনগুলো কাটাবে, একটা চোট খাওয়া হাঁপি কুত্তার মত, একটা নেংটী ইঁদুরের মত, একটা ল্যাংড়া গাঙশালিখের মত। যতদিন না চোখের সামনে এই অন্ধকারকে আরেকটা অন্ধকার এসে ঢেকে না দেয়। ওস্তাদের স্মরণ নিল দ্বারিক সর্দার। এ ছাড়া আর কিছুই করবার বা ভাববার নেই তার।

সোনামনি আর রূপচাঁদ এসে দাঁড়িয়েছে সুন্দরী খালের পাশে। সেখান থেকে তিন নম্বর ঘাটের পথটা বেঁকে গেছে। সেই পথই ধরবে ওরা। তিন নম্বর ঘাটে ভোর রাতে কলের জাহাজ ভিড়বে। সুন্দরী খালের পাশে কলার বাগানে কৃষ্ণাচতুর্দশীর অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। তার সাথে নেমেছে কুয়াশা। কলার শুকনো পাতায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ উঠছে। হয়ত দু-একটা খটাস সজোরে যাওয়া আসা করছে। সোনামনি আর রূপচাঁদ কান পেতে শুনল শব্দটা ; আবার চলতে শুরু করল।

এখান থেকেই ডিঙ্গালঘেরি শেষ। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারেই রূপচাদ যেন শেষবারের মত তাদের ঘরের চালাটা, ঘরের পাশে খড়ের পেয়ালাটা, ধানের গোলাটা দেখবার চেষ্টা করল। খুব সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস চাপল রূপচাঁদ। কেউই কারও কাছে ধরা দিতে চায় না।

সোনামনিও থেমে পড়েছিল। আর কিছুক্ষণ পরেই ভোর হবে, এমন ভোরে বাবলার হলুদ ছায়ায় পরিচিত হেঁতালের ঝোপটার পাশে বসে ডাও নিয়ে মাছ মারবে চরণ। দুই একটি ট্যাংরা উঠলে রেখে দেবে চুকায়। কিন্তু সোনামনি আর কোন দিনই এসে পেছন থেকে উঁকি দেবে না। দেখবে না চরণের ডাঙে কটা মাছ উঠল। সোনামনি যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। রূপচাঁদ তার হাত ধরে একটা টান দিল। আবার দুজনায় চলতে শুরু করে। দুজনাই চুপচাপ পথ হাঁটছে। কেউই কোন কথা বলছে না। যেন সব কথাই ওদের ফুরিয়ে গেছে।

তিন নম্বর ঘাটে পেঁাছেই ওরা দেখল বিদ্যাধরীর বাঁকে কলের জাহাজের আলো। হয়ত এই মাত্র ছেড়েছে গোসাবা থেকে। নদীর বুকে সার্চলাইটের আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে। ঘাটে কেউ নেই অন্য কোন যাত্রী। সোনামনি আর রূপচাঁদ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের অপেক্ষায়। এক উলঙ্গ উচ্ছ্বাসে ওরা ঘর ছেড়েছে। কিন্তু অন্ধকার ফেরী ঘাটে জাহাজে পা বাড়াতে গিয়ে ওদের মনে হল, চরণ, দ্বারিক সর্দার, নিবারণ সর্দার, ধানের গোলা, খড়ের পোয়াল, ছোট এক টুকরো জমি, মুনিয়া, কালুয়া সমস্ত দ্বীপ সূর্যবেড়িয়া যেন হাত তুলে নিষেধ করছে ওদের দ্বীপ ছেড়ে পালাতে। আর সে নিষেধ শুনতে ওরা দুজনাই যেন প্রস্তুত। কিন্তু বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে। আর ফেরার উপায় নেই!

তিন নম্বর ঘাটে তখন জাহাজ ভিড়ল। কলের জাহাজের ক্রু সিঁড়ি ফেলে দিয়ে পারের যাত্রীদের তাড়াতাড়ি উঠে আসতে বলছে। আর সেই কাঠের পাটাতন বেয়ে জাহাজে গিয়ে চড়ল সোনামনি আর রূপচাঁদ। হাত ধরাধরি করে। দুজনার হাতের তালুই তখন ঘেমে উঠেছে।

. .

এই কলের জাহাজ দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার আসে অনেক খবর নিয়ে। সোনামনি রূপচাঁদের খবরও এ জাহাজ একদিন আনবে। খুব বেশী দূর যায় নি ওরা, বাসন্তীর ধানের কলে কাজে লেগেছে। কিংবা

সোনামনি আর রূপচাঁদ দুজনাই হয়ত একদিন একটা খবর হয়ে এ জাহাজে এসে সুর্যবেড়িয়ায় নামবে। সে অনেক পরের কথা।

কিন্তু যাত্রীর ভিড়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে থাকতে সে কথা এরা কেউই ভাবল না। সোনামনি তখন তার ডাগর চোখ দুটো রূপচাঁদের মুখের দিকে মেলে ধরে প্রশ্ন করছে—কাঁহা যাতি? ইঞ্জিন ঘরের বিকট একটানা শব্দে সে কথা বুঝতে না পেরে রূপচাঁদ শুধু ভুরু কুঁচকাল।

॥ তেইশ ॥

ওস্তাদের নাম স্মরণ নিতে নিতে দ্বারিক আবার একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। সমস্ত মনটা শূন্য হয়ে গেলে, মগজটা ফাঁকা হয়ে গেলে একমাত্র ঘুমই আসে। সূর্যবেড়িয়ার আকাশে ভোরের আলো কখন ফুটেছে, কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে। দ্বারিক তখনও ঘুমিয়ে। শুকরাম এই সকালেই দ্বারিকের খোঁজ নিতে এসে দেখল দোস্ত ঘুমাচ্ছে। কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বরটা অনেক কমে এসেছে। সারা গায়ে ঘাম দিয়েছে। কপাল বেয়ে ঘামের স্রোত নেমেছে। শুকরামের হাতের স্পর্শে দ্বারিক চোখ খুলল। তখনও তার ঘুমের রেশ কাটে নি। সকালের নরম আলো চোখে লাগতেই সে যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না, এ টা সকাল না দুপুর না বিকেল। কখনই বা সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কখনই বা সে জাগল। শুকরামকে সামনে দেখতে পেয়ে দ্বারিক যেন তার চেতনা ফিরে পেল। শুকরামের অস্তিত্বটা যেন তাকে বিগত রাত্রির সব কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। দ্বারিক কেমন যেন দিশাহারা হয়ে এদিক ওদিক তাকাল। শেষরাতের কৃষ্ণা-চতুর্দশীর অন্ধকারের সব ঘটনাগুলো যেন তার স্বপ্ন মনে হচ্ছে। এবং সেরকমই এক বিশ্বাসে সে চারিদিকে সোনামনিকে খুঁজল। যেন সে এখনই সোনামনিকে ঘরে বা দাওয়ায় দেখতে পাবে। কিন্তু সবদিকে নজর দিয়ে সোনামনিকে দেখতে না পেয়ে তার তখন স্থির প্রত্যয় হয়েছে সোনামনি নেই, বিগত রাতের ঘটনা স্বপ্ন নয়। সবই তার চোখের সামনে ঘটেছে। সে কেন্নোর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে নিঃসাড় দেহটা নিয়ে মেঝেতে পড়ে থেকে সব দেখছে। এই সব ঘটনার উপর তার কোন হাতই ছিল না।

দ্বারিক শুকরামের একটা হাত জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। দোস্তের হাতটা নিজের দু'হাতের ভেতর পেয়ে সে যেন

অচল-অসহায় অবস্থার ভেতর একটু নির্ভর পেয়েছে। আর সেই পরম নির্ভরতায় কান্নার বান এসে দ্বারিককে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দোস্ত শুকরাম দ্বারিককে একটা ছোট ছেলের মত কাঁদতে দেখে কেমন ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেছে। কি ঘটেছে ঠাওর করতে না পেরে দ্বারিকের মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে দোস্তের কান্নার হেতুটা জানবার চেষ্টা করছে। কান্নার প্রথম বেগটা কেটে যেতে দ্বারিক খানিকটা শান্ত হয়েছে। স্থির হয়ে দুর্বল শরীরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে একে একে সব ঘটনা বললে শুকরামকে যেন এই বলার ভেতর সে এক শান্তি খুঁজে পেল। পৃথিবীতে একমাত্র দোস্ত শুকরামকেই সে এই সব কথা খোলাখুলি বলতে পারে। সব শুনে শুকরামের মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। কপালে হাত ঠেকিয়ে নসীবের ইংগিত করেছে সে। কিন্তু দোস্তকে কোন সান্ত্বনা দেবার সে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। বস্তুতঃ তার নিজের মনেও তখন একটা জ্বালা ধরেছে। দ্বারিকের এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে তারও যেন কিছুটা গাফিলতী আছে। নিজেকে মনে মনে কেমন যেন অপরাধী মনে হল তার। কোন সান্ত্বনাই দ্বারিকের জন্য বা তার নিজের জন্য সে খুঁজে পেল না। পুতুলের মত বসে রইল দুই দোস্তে। যেন বসে বসে ওরা অপেক্ষা করবে আরও অনেকগুলো ঘটনার জন্য, যেগুলো আসতে আর বেশী দেরী নেই।

পিতাজীর কান্নার শব্দে চরণের ঘুম ভেঙ্গেছে। উঠে বসে পিতাজীকে কাঁদতে দেখে চরণ কেমন অবাক হয়ে গেছে। এরকম ভাবে পিতাজীকে কাঁদতে চরণ কোন দিন দেখে নি। পিতাজী তারই মত কাঁদছে। সে যেমন ভাত ভাত করে কাঁদে। তারপর কান খাড়া করে পিতাজীর সব কথা শুনেছে চরণ। শুনতে শুনতে পিতাজীর গা ঘেঁষে বসেছে সে। দিদি নেই, শেষ রাতে রূপচাঁদের সাথে ঘর ছেড়েছে। কথাটা ভাবতে গিয়েই সারা মনে তার ধাঁধা লেগেছে। সমস্ত মনটা মাঝ দরিয়ার ফুলন্ত ঢেউয়ের মত ফেঁপে ফুলে আবার ফেটে পড়েছে। রূপচাঁদের কথা মনে হল চরণের। রূপচাঁদের সেই হাসির কথা। চরণকে কাছে টেনে রূপচাঁদ খুব আস্তে আস্তে বলেছিল চরণ স্বপ্ন দেখেছে। ওসব কিছু নয়। চরণ এখন বুঝতে পারল রূপচাঁদ তাকে বুদ্ধু বানিয়েছে। একথা তখনই তার বোঝা উচিত ছিল। কাল পর্যন্ত রূপচাঁদ আর বহিন্‌কে জড়িয়ে তার

শিশুমনে একটা কোমল ধারণা ছিল। যদিও সেগুলি খুব অস্পষ্ট। আজ সেই কোমল ধারণাগুলোই যেন আঘাত দিল চরণের মনে, আর আঘাত পেয়ে ধারণাগুলো যেন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চরণের সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। তার কেমন ভয় ভয় করছে। সেও যেন হারিয়ে যাবে। এই হারিয়ে যাওয়া যেন তার ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে। সে ভয়ে ভয়ে পিতাজীর গা ঘেঁষে এসে বসেছে তাই। একসময় চরণের মনে হল সোনামণি আর রূপচাঁদের এই পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারও যেন একটা হাত আছে; যদি সে সব কথা রূপচাঁদকে না বলত······আর ভাবতে পারল না চরণ। পিতাজী আর চাচাজী গোপনে যে কাজ করেছে সে কথা প্রকাশ না করলেই হয়ত মঙ্গল হত। এমনটি ঘটত না। চরণ একবার ভাবল সব কথা পিতাজীকে বলে ফেলে। কিন্তু বলি বলি করেও সে শেষ পর্যন্ত কিছুই বলে উঠতে পারল না। কেমন যেন অসহায় আর নিরুপায় মনে হল নিজেকে। পিতাজী আর চাচাজীর সামনে সে আর বসে থাকতে পারল না। এক দৌড়ে বাইরে এল। চোখ মেলে দেখল হেমন্তের আকাশে হলুদ রোদ। গাংভেড়ির হেঁতালের ঝোপে কুয়াশার ছাট তখনও শুকায় নি। দুই একটা চালচড়া ফুর ফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে যেন কুয়াশার গন্ধ এখনও লেগে আছে। সব মিলে-মিশে একটা মিষ্টি সকাল। সবখানেই খুশীর ছোঁয়া। দ্বীপসূর্যবেড়িয়া যেমন ছিল তেমনি আছে। মাঝ থেকে বহিন তার হারিয়ে গেল। চরণের হঠাৎই মনে হল সে যেন সোনামনিকে খুঁজে বের করতে পারবে। বেশীদূর যায় নি সে। আস্তে আস্তে গাংভেড়ির দিকে রওনা হল চরণ। যে পথটা দিয়ে সোনামণি রাক্ষসবন্দি ঘাটের দিকে যেত সেদিকে পা বাড়াল সে। ঐ পথেই সোনামণির দেখা মিলবে।

দুপুরের দাওয়ায় বসে চরণ বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে আকাশটা দেখছিল। ঘরের মেঝেয় পিতাজী শুয়ে আছে। চাচা শুকরামই ঘর থেকে বার্লি তৈরী করে এনে দ্বারিককে খাইয়ে গেছে। চরণও চাচার ঘরে নীলমণির সাথে দুটো জলভাত খেয়ে এসেছে। অন্যান্য দিন চারটি জলভাত খেতে কত মিষ্টি লাগে। আজ কিছু ভাল লাগে নি চরণের। তাই একলা বসে দুপুরের দূর আকাশে একটা শাংখালের ঘোরাফেরা

দেখতে দেখতে সে কেমন আনমনা হয়ে পড়েছে। এমন সময় ভিন পাড়ার কার্তিকের দল এসে তার সামনে হাজির হয়েছে। গাংভেড়িতে মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে পোকা খেলায় ডাকছে তাকে। চরণ আপত্তি জানায় আজ আর সে পোকা খেলতে যাবে না। শরীরটা তার ভাল নেই। কিন্তু কার্তিক নাছোড়বান্দা। সে থাকে ডিঙ্গালঘেরির শেষে। কিন্তু কার্তিক খেলতে আসে চরণদের সাথে। চরণের চেয়ে সে বছর দুয়েকের বড়। অর্থাৎ দশের কাছাকাছি। সে চরণকে খুব করে আবদার জানাচ্ছে। অতদূর থেকে এসেছে, ধেৎ যদি ফিরে যেতে হয় তাহলে আর কোনদিন আসবে না। অগত্যা চরণকে উঠতে হয়। অনিচ্ছা সত্বেও ঘরের কুলুঙ্গি থেকে হেঁতালের তৈরী পোকার ঝাঁপিটা বের করে নিয়ে আসে সে।

গাংভেড়িতে একটা কাঠি দিয়ে গোল দাগ কাটল কার্তিক। পোকা খেলার ঘর। সব দাঁতগুলো বের করে হেসে ফেলে সবাইকে খেলা আরম্ভ করতে বললে। হাসলে কার্তিকের দাঁতগুলো সব বেরিয়ে পড়ে। অন্যদিন হলে চরণ ছড়া কেটে কার্তিককে ক্ষেপাত। কিন্তু আজ আর কিছু করল না।

প্রথমেই লক্ষ্মী তার ছোট শিশি থেকে একটা লাল কমলা পোকা বের করে ঘরের মাঝখানে রাখল। তার দেখাদেখি আরও কয়েকজন রাখল তাদের পোকা। যে যার পোকার গায়ে হাত ছুঁইয়ে রেখেছে। তখন চরণ আর কার্তিক বাকী। ওদের ভাবখানা এমন যে সবার শেষে পোকা বের করে ওরা তাক লাগিয়ে দেবে। আবার এ নিয়ে দুজনার ভেতর পাল্লা চলে। চরণ যদি তার হেঁতালের ঝাঁপি থেকে একটা মাঝারি রকমের পোকা বের করে তাহলে কার্তিক বড় দেখে বুড়ো আঙুলের নখের সমান একটা কালো কুচকুচে পোকা তার টিনের কৌটা থেকে বের করবে। তবে এবছর ওরা কে কেমন পোকা সংগ্রহ করেছে তা ওরা কেউই জানে না। আজই প্রথম খেলা হচ্ছে। তবে পোকা সংগ্রহের ব্যাপারে সর্দার পল্লীর চরণ আর ডিঙ্গালঘেরির কার্তিকই সবচেয়ে ওস্তাদ বেশী। তাই ওস্তাদের রেশারেশি।

ঝাঁপি থেকে চরণ বের করল একটা মেটে রংয়ের নোনা পোকা। তাই দেখে কার্তিকের চোখ দুটো টান হয়ে গেল আর সব দাঁতগুলো বের করে

সে একবার হেসে নিল। পরে আস্তে আস্তে খুলল তার টিনের কৌটার ঢাকনাটা। চরণ ও অন্যান্য সবাই খুব উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে কার্তিকের মরচে পড়া টিনের কৌটাটার দিকে। একটি লাল-সোনালী ছিটের বড় পোকা বের করল কার্তিক। বছরের প্রথম দিনের খেলায় সাইতের পোকা হবে এইটাই, কার্তিকের এই রকমই বিশ্বাস। অবশ্য এই বিশ্বাস নিজের নিজের পোকা সম্বন্ধে প্রত্যেকেই রাখে। এবং রাখতেও হয়।

গোল দাগের মাঝখানে সবার পোকাগুলো জড়ো করে ছেড়ে দেওয়া হল। যার পোকা ঘরের ভেতর থেকে দাগ পেরিয়ে প্রথম বাইরে আসবে সেই সব পোকাগুলো জিতবে। চরণ, কার্তিক, লক্ষ্মী—আর সবাই দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে গোলের চারপাশে বসে অধীর আগ্রহে চেয়ে রইল আপন আপন পোকার দিকে। এই চেয়ে থাকার ভেতর, এই অপেক্ষায় বেশ উত্তেজনা আর আশঙ্কা থাকে সেইটুকুই পোকা খেলার আনন্দ। এই আনন্দে উত্তেজনায় সর্দার শিশুরা হেমন্তের আর শীতের গাংভেড়িতে বসে মিষ্টি রোদে পিঠ পেতে খেলায় মাতে। তাদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা পোকা খেলা।

সবাই দেখল তিনটে পোকা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। তার ভেতর কার্তিকের পোকাটা আগে সবার। চরণের পোকাটা ঘরের মাঝখানেই ঘুরপাক খাচ্ছে। শেষে কার্তিকের পোকাটাই প্রথমে দাগ পেরিয়ে বাইরে এল। কার্তিক একে একে সব পোকাগুলো তার কৌটায় উঠিয়ে রাখার সময় একবার আড় চোখে চরণের দিকে তাকাল। তখন কার্তিকের হাতে চরণের মেটে পোকাটা। আবার সবাই যে যার পোকা বের করে হাত রাখছে। প্রথম বারের পোকা দ্বিতীয় বারে দেওয়ার কোন রেওয়াজ নই। তাই কার্তিক এবারেও অনেক দেখে শুনে আরেকটা লাল পোকা বের করল। পোকাটার ঠ্যাংগুলো বেশ মজবুত। চরণ ততক্ষণে একটা সবজে-লাল পোকা বের করেছে। কার্তিকের এই তেরছা চাহনি তার কাছে অসহ্য লাগে; তাই এবারে হেরে গিয়ে সে কার্তিককে আচ্ছা জব্দ করতে চায়। দেখে দেখে চরণ তার সবচেয়ে মারকুট্টি পোকাটা বের করেছে। ধরার পর থেকেই পোকাটার ওপর নজর ছিল তার।

চরণ দেখেছে ঠ্যাং উঁচিয়ে মারামারিতে পোকাটা শিরোমণি। এবারে সবার পোকাগুলো হাতে নিল চরণ। ঘরের মাঝখানে সব পোকাগুলো ছেড়ে দেবার এবারে তার পালা। এই সুযোগে ছেড়ে দেবার সময় কার্তিকের পোকাটার পাশে চরণ নিজের পোকাটা রাখল।

চরণ আর কার্তিকের পোকা দুটো পাশাপাশি চলেছে। চরণ বেশ উৎকণ্ঠা নিয়ে দেখছে মারকুট্টি পোকাটা কখন ঠ্যাং উঠিয়ে কার্তিকের পোকাটাকে আক্রমণ করে। চরণ দেখল তার পোকাটা একটু পিছিয়ে এসেছে, এসেই হুমড়ি খেয়ে কার্তিকের পোকাটার উপর পড়েছে। দুই পোকার লড়াই শুরু হল। কার্তিক রাগে গর গর করে কিন্তু করবার কিছু নেই। ছাড়িয়ে দেবার নিয়ম নেই। সে এরকম লড়াই পছন্দ করে না। কার্তিকের মুখটা শুকিয়ে আসছে। দাগের কাছাকাছি এসে চরণের মারকুট্টি পোকাটা তার পোকাকে আক্রমণ করেছে। এখন দুটোতে জড়াজড়ি করে গড়াচ্ছে আর সারা গায়ে ধুলো মাখছে। এদিকে সবাই দেখল লক্ষ্মীর পোকাটা প্রায় দাগ ছুঁই ছুঁই হয়েছে। এখনই বেরিয়ে যাবে। বেরিয়েও গেল। আর ঠিক সেই সময় কার্তিকের পোকাটা চিৎ হয়ে পড়ে ছটফট করছে। একটা ঠ্যাং ভেঙ্গে গেছে পোকাটার। ব্যাস, খতম—চরণ হাততালি দিয়ে উঠল কার্তিকের দিকে চেয়ে। লক্ষ্মীর জিত ও কার্তিকের পোকাটি এই চিৎ হয়ে পড়ে থাকায় সে খুব খুশি হয়েছে। চরণের পোকা যখন লক্ষ্মী ঘর থেকে তুলে নিচ্ছে তখন চরণ বলল-বাহাদুর পোকা। এবং দুটো পোকার বদলে এ পোকাটা সে ফিরিয়ে নিতে রাজী এরকম ইংগিত করে রাখল লক্ষ্মীকে।

এবারের খেলাই শেষ খেলা। চরণ প্রস্তাব করল দুটো করে পোকার খেলা। কয়েকজন তাতে রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু কার্তিকের মাথায় খুন চেপে গেছে। সে রাজী হল, অগত্যা সবাইকে রাজী হতে হল। দুটো করে পোকা সবাই ঘরের ভেতর দেবে। যে জিতবে তাকে আরেকটা করে পোকা সবাই দিয়ে দেবে। দুটো পোকার খেলায় সবাই বেশ চিন্তায় পড়েছে। পোকা ঠিক করা নিয়ে। কার্তিক আর সবাই যখন পোকা ঠিক করে উঠতে পারে নি তখন চরণের হাতে একটা পটল ছিটের হলুদ পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পোকাটার চোখ দুটো মাকড়শার মত জ্বল জ্বল

করছে। এটা চরণের বাজিমাতের পোকা। অঘ্রাণের প্রথমে পোকাটা ধরেছে সে। প্রত্যেকদিন কিছুটা সময় ছেড়ে দিয়ে চরণ দেখছে পোকাটা খুব ছোটে; আশ্চর্য রকমের। তাই দুই পোকার খেলায় সে বাজিমাত করা পোকাটাই বের করল। সুদে আসলে সব উঠিয়ে ঘরে ফিরবে। কার্তিকের মুখটা একবার আঁচ করার চেষ্টা করল চরণ; যদিও কার্তিক সামনেই বসে আছে। সে বের করল একটা ঘন সবুজ বেগনী ছিট নোনা পোকা।

ও পাড়ার বুধু এবারে সব পোকাগুলো হাতে নিয়ে গোলের মাঝে ছেড়ে দিল। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নিজের নিজের পোকার ওপর। কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে চরণের পোকাটা ছুটল ঝড়ের মত। কার্তিক আর বুধুর পোকাটাও খুব পাল্লা দিয়েছিল। কিন্তু চরণের পোকাটা অনেক আগেই দাগ পেরিয়ে এসে আবার চরণের হাতে আদর খাচ্ছে। চরণ একে একে সব পোকাগুলো হেঁতালের ঝাঁপির অন্য এক খোপে তুলে রাখে। জিত তালের পোকাগুলো আলাদা করে রাখে সে। চরণ যখন পোকা গোছাতে ব্যস্ত তখন কার্তিক, হরি আর বুধু উঠে দাঁড়াল। কার্তিক একবার ভাবল আরেকটা পোকা না দিয়েই দৌড় দেবে কিনা।

তার দুই সাকরেদ হরি ও বুধুও তার দিকে চেয়ে ইশারার অপেক্ষা করছে। কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করে তার টিনের কৌটাটা খুলে কার্তিক আরেকটা পোকা চরণকে দিল। তার দেখাদেখি বুধু ও হরি তাদের পোকা বের করল। প্রথম দিনের প্রথম খেলায় কোন্দল করতে কাজিয়া করতে কার্তিকের মন চাইল না। তাছাড়া সে নিজেই চরণকে খেলতে ডেকে এনেছে, চরণ আসতে চায় নি।

চরণ আর লক্ষ্মীও ফিরে চলছে ঘরে। লক্ষ্মীর থেকে তখন চরণ দ্বিতীয় পোকাটি নেয় নি। এতক্ষণ খেলার জগতে ডুবে ছিল চরণ তাই আর কোন কথা মনে আসে নি তার। ঘরে ফেরার পথে সোনামনির কথা মনে হল তার। সকালে রাক্ষসবন্দী ঘাটের পথে অনেক খুঁজেছে চরণ সোনামনিকে। ঝুমুর ধাইকে পথে দেখতে পেয়ে ভয়ে ভয়ে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে দিদিকে দেখেছে কিনা। ঝুমুর বলছে

পারে নি। সেই সোঁদাল গাছটার তলায় অনেক সময় বসে রয়েছে চরণ ; যেখানে সোনামনি অনেক অনেকদিন একা এসে চুপ করে বসে থাকত। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে ফিরেছে চরণ, আর কোন দিন বহিনের দেখা মিলবে না। কথাটা ভাবতেই একটা অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেছে সারা শরীর দিয়ে। পোকা খেলায় জিতলে তার হেঁতালের ঝাঁপিটা সে গিয়ে সোনামনির সামনে তুলে ধরত। বহিনটা খুব খুশী হয়ে উঠত। এই সেদিনও সোনামনি গাংভেড়ি থেকে ছুয়েকটা পোকা তাকে সংগ্রহ করে দিয়েছে। তার পোকা সংগ্রহের অনেক গল্প বসে থেকে শুনেছে। আজ আর কারও সামনে গিয়ে সে তার ছোট ঝাঁপিটা খুলে ধরতে পারবে না। ঝাঁপিতে রং বেরংয়ের পোকাগুলো দেখিয়ে একটা পুলক আর গর্ব অনুভব করতে পারবে না এই কথা ভেবে চরণ কেমন মুষড়ে পড়ল। তার চোখের সামনে তাদের অন্ধকার চালা ঘরটা ভেসে উঠল। পিতাজীর বেদনাক্লিষ্ট বিবর্ণমুখটা মনে করবার চেষ্টা করল সে। সারা মুখে পাঁশুটে দাড়ি। ভোরে চাচাজী হাত জড়িয়ে ভয়ে পিতাজী যখন কাঁদছিল তখন সেই রূপালী দাড়িগুলোকে বর্ষায় ঝাপটা খাওয়া আকাশটার মত মনে হচ্ছিল চরণের ; কেমন পাঁশুটে বিবর্ণ আর ধূসর। হঠাৎ চরণের মনে হল পিতাজী ঘরে একা। এসব কোন দিন মনে হয় নি তার। আজ নিজেকেও বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে চরণের। সব কিছু বড় নিরানন্দ ঠেকছে তার। ঘরে ফেরার পথে কদবেল গাছের ডালে পড়ন্ত বেলায় নরম রোদে শালিক ছুটোর কিচিরমিচির ঝগড়া দেখে সে অকারণে খুশী হয়ে উঠত। আজও ছুটো শালিক তেমনি ঝগড়ায় তাল ঠুকছে। কিন্তু চরণ সেদিকে ফিরেও তাকাল না। পৃথিবীতে যেন সব পুলক আনন্দের কারণ ফুরিয়ে গেছে। আর কোনদিনই সে অকারণ পুলকে হাততালি দিয়ে উঠবে না।

সব খুশীর রংগুলো যেন তার কাছে হঠাৎ ফিকে হয়ে গেছে। চলতে চলতে ঘরের কাছে এসে সে ফিরে দাঁড়াল। লক্ষ্মীর হাতে তার সাধের হেঁতালের ঝাঁপিটা দিয়ে চরণ বলল—লে যা, তুই পেলি সব, সব পোকা। আর কিছু বলতে পারল না চরণ। ঠোঁট ছুটো তার থর থর করে কাঁপছে। লক্ষ্মীও বিস্মিত হয়ে গেছে এক

সাধের ঝাঁপিটা তাকে দিয়ে দিচ্ছে দেখে। আর কোনদিন খোকা খেলতে যাবে না চরণ! একটা কান্নার বেগে উথলে ওঠে সে। তারপর ঘরের দিকে ছুট দেয়। পিতাজী ঘরে একা আছে। ঘরের অন্ধকারে তারই মত নিঃসঙ্গ একাকী। দাওয়ায় পৌঁছে মুখটা বাড়িয়ে দেখল চরণ ঘরের মৃদু অন্ধকারে আধ বোঝা চোখে পিতাজী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আপন মনেই কি যেন বিড় বিড় করে বলছে; কখনও হাসছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখল চরণ, পরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গলা ফাটিয়ে তার বলার ইচ্ছে হল আর কোনদিন পিতাজীকে একা ফেলে সে কোথাও যাবে না। এবার থেকে পিতাজীর সাথেই ছায়ার মত থাকবে সে; নইলে বোনের মত কোথাও হারিয়ে যেতে পারে।

এরকম অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে চরণ পিতাজীর গা ঘেষে গিয়ে বসে। ঝড়ের রাতে জল পায়রাগুলো যেমন একটা আর একটার গা ঘেঁষে থাকে।

॥ চব্বিশ ॥

ডাঙ্গা থেকে সুগা আলাই।

উত্তরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেই সাথে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ায় নেমেছে হাজার টিয়া। ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্যবেড়িয়ার প্রান্তরে সবুজ টিয়ার দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, শীত এল। ধান কাটা হয়ে গেছে। সারা মাঠ জুড়ে খড়ের কুটো প্রান্তরের রিক্ততায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঠে কোন ব্যস্ততার লক্ষণ নেই। জমির বুকে এখন কুমীরের পিঠের মত দাগ জেগেছে। খাল নালা দিয়ে জমিতে যে জল এত দিন আটকে ছিল তা বেরিয়ে গেছে। জমির ফাঁকে ফোকরে দু-একটা কচ্ছপ উঁকি মারছে। সর্দার পল্লীর কয়েকজন এখন মাঠের কাদায় পা ডুবিয়ে সেই কচ্ছপ ধরতে উঠে পড়ে লাগল। কাদায় টান ধরলে কচ্ছপগুলো পিঠ ঢাকা দেবে। তাহলে এমন শীতটা বেহুদা যাবে। তাই নরম কাদায় পা ডুবিয়ে ওরা সকাল-দুপুর কচ্ছপ মারছে।

শীতের দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে দ্বারিক বসে বসে রোদ পোহাচ্ছে। জ্বরটা তাকে কাহিল করে দিয়েছে। তাই শীতটা কেমন জড়িয়ে ধরল। অন্যান্য বার সেও এই সময় কচ্ছপ ধরতে ব্যস্ত থাকে। কাদায় পা ডুবিয়ে সারা মাঠ ঘুরে ঘুরে সকাল সন্ধ্যা কচ্ছপ ধরবার ভেতর একটা আমেজ আছে। কিছু রূপেয়া আসে; আর খানিকটা মাংস খেয়ে বাঁচে ওরা। কিন্তু এবারে মাঠে গিয়ে কচ্ছপ ধরার কোন বাসনাই জাগে নি তার। না মন, না দেহ কোনটাই একাজে উৎসাহ যোগায় নি। সকাল সন্ধ্যা কখনও ঘরে, কখনও দাওয়ায় বসে বসে সে শুধু ঝিমোয়। কোন কোন দিন শুকরাম এসে গাংভেড়িতে টেনে নিয়ে যায়। দোস্তের অনুরোধে ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হয় তাকে। তাও বেশীক্ষণ বসে

না মজলিসে। বসতে ভাল লাগে না, কোন গাল-গল্পেই যোগ দিতে ইচ্ছে যায় না তার। একসময় সবার অলক্ষ্যেই চুপি চুপি উঠে আসে। দাওয়ায় বা ঘরের অন্ধকারে বসে বুঁদ হয়ে থাকে। জীবনের সব উদ্যম যেন শেষ হয়ে গেছে, সব বাসনা কামনা যেন চিরতরে বিদায় নিয়েছে। বাপ-ঠাকুরদার মুখে শোনা গল্পের পেঁচার মত শুধু এক চোখ দিয়ে জীবন ও জগৎ দেখা যেন তার আরম্ভ হল। গল্পের পেঁচা বনে গেছে সে। ঘরের অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে কখনও বা ঘোর দুপুরে কখনও বা শীতের ধূমল সন্ধ্যায় সে অনেক ছায়া দেখতে পায়। রঙ-চঙে ছায়ারা সব পুলক-পুচ্ছ নাচিয়ে তার চোখের সামনে ঘোরা ফেরা করে। তখন দ্বারিকের চোখে ঘোর লাগে। ছায়ারা সবাই তার পরিচিত। গায়ে তাদের পরিচিত সুবাস। সুবাসের ঘ্রাণ পায় সে, দ্বারিক তখন চোখ বোজে। আহা, ছায়ারা শীতের হিমেল অন্ধকারে একটু ঘোরা ফেরা করুক, গন্ধ ছড়াক, চোখ মেললেই হয়ত মিলিয়ে যাবে। আসমানে তাদের খুঁজতে হবে। ঘরের অন্ধকারে দ্বারিক তাদের সাথে কথা বলে। চরণ বিস্মিত হয়ে দেখে পিতাজী চোখ বুজে কার সাথে কথা বলছে অথচ ঘরে কেউ নেই। মাঝে মাঝে দ্বারিক চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে ওঠে—যাতি যাতি। যাচ্ছে যাচ্ছে। চরণ দেখে ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে একটা চড়ুই উড়ে পালাল। সব কিছু কেমন অবাক লাগে চরণের। পিতাজীর এই সব কাণ্ড দেখে দেখে চরণ যেন ঘরের অন্ধকারে একটা রহস্যের পুতুল বনে যায়।

শীতের আকাশে ননীর মত মেঘ। অথচ রোদের কমতি নেই। দু-একটা বাবুই চক্কর দিচ্ছে মাথার ওপরে। গাংভেড়িতে কয়েকটা প্রজাপতি আর গাং-ফড়িং মিলে ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা শব্দ উঠছে ঝিন ঝিন। দ্বারিক বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে কেমন অবাক দৃষ্টিতে সব কিছু দেখছে এক অপরিচিতের চোখ দিয়ে। বহুদিন যেন সে এ সমস্ত কিছুই দেখে নি। বহু বছর পর সে যেন দ্বীপ স্বর্যবেড়িয়ায় ফিরে এল। তাই সব কিছু কেমন আধ-চেনা, অপরিচিত। অথচ একদিন সব কিছুই তার খুব পরিচিত ছিল। তার চেতনায় ঐ

আকাশের বাবুই গাংভেড়ির প্রজাপতি সবাই ধরা দিয়েছিল। তারই একটা আবছায়া রেশ মনের কোথায়ও রয়ে গেছে। তাই দেখতে দেখতে সে কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছে। চেনা অচেনার মাঝখানে সব কিছুই তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। অথচ সেগুলোকে হলপ করে ঠাওর করার কোন চেষ্টাই করছে না সে। সব কিছুর প্রতিই সে যেন কেমন নির্বিকার।

কালুয়াটা পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছে। হোগলার খুপরিতে মুনিয়াটা থাকলে এতক্ষণ নাক ডাকত। কিন্তু দোস্তের পরামর্শে সেটা দ্বারিক হাটে বেচে দিয়েছে। সেটাকে দেখবে শুনবেই বা কে; তাছাড়া হাতে কিছু নগদ রূপেয়ার দরকার। হোগলার খুপরিতে এখন মোরগটি বন্দী আছে। দোস্ত শুকরাম একরকম জোর জবরদস্তি করে দ্বারিককে গোসাবার হাটে নিয়ে গিয়ে ঐ মোরগটি নিজের ট্যাঁকের রূপেয়া দিয়ে কিনে দিয়েছে। বলেছে সময় আসলে শোধ করতে। পৌষ মাসে মোরগের লড়াই শুরু হয়েছে। সে লড়াইয়ে দুই দোস্তে যোগ দেবে না, এটা কোন কথাই নয়। যতই দুঃসময় আসুক। দোস্তের ইচ্ছার সামনে দ্বারিক পরাস্ত হয়েছে। গোসাবায় যেতে হয়েছে শুকরামের সাথে। মোরগও কিনতে হয়েছে। আজ তিন দিন থেকে মোরগটি বন্দী আছে হোগলার খোপে। চরণই ওটাকে দেখাশোনা করে। দানাপানি দেয়। দ্বারিক শুধু মাঝে মাঝে নির্দেশ দেয়। তার বেশী কিছু নয়। তিন দিন এক নাগাড়ে বন্দী থেকে মোরগটা খুব তেজিয়ান হয়েছে। আর পেট ভরে দানাপানিও খেয়েছে প্রচুর। কেঁচো, ধানের খুদ, গুগলি শামুক রোজ চরণ যোগাড় করে এনে দেয়। তাই দানা খেয়ে পুষ্ট হয়ে হোগলার খোপে ডাক ছাড়ছে গলা ফাটিয়ে। গলায় গোসার ঝাঁঝ। তিনদিন আটক থেকে খুব গোসা হয়েছে মোরগটার। এখন ছাড়া পেলেই সব ঠুকরে শেষ করবে।

একটা খরিশ ধীরে ধীরে চৌকার ঝোপ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে হোগলার খোপের দিকে এগোচ্ছে। পাটকিলে রঙয়ের মসৃণ শরীরে শীতের রোদ ঝকঝক করছে তার। দ্বারিকের নজর গেল সাপটার দিকে। সে বিস্মিত হল। শীতের ঋতুতে দ্বীপ সূর্যবেড়িয়ার সব সাপ গর্তে

ঢোকে। শুধু সকাল দুপুর গর্ত থেকে লেজ বের করে দিয়ে রোদ পোহায় হিম শরীরটা একটু সেঁকে নেয়। এখন খরিশটার ঘুরে ফিরে বেড়াবার সময় নয়। অথচ সেটা হেলে দুলে আসছে হোগলার খোপের দিকেই। দ্বারিক নড়ে চড়ে বসল। সাপটার চোখ দুটো বঁইচির ফলের মত কেমন ঘোলাটে লাল ; ঈষৎ কালচে। চোখ দুটো নরম আলোয় জল জল করছে। দ্বারিকের মনে হল এই শীতের দুপুরে খরিশটা যেন তার ঝিমধরা আবেশকে ছিঁড়ে খান খান করে দেবার জন্য ক্রমশই এগিয়ে আসছে। একটা চাঞ্চল্য, একটা উত্তেজনা তার ভেতর যেন জাগিয়ে দিতে চায়। এই নির্বিকার অবস্থা থেকে তাকে বিকারে নিয়ে যেতে চায়। সাপটার এই লীলায়িত ভঙ্গিতে হেলে দুলে এগোনর ভেতর যেন একটা গূঢ় ইচ্ছার যোগসাজস আছে। মুখ দিয়ে হু'বার শব্দ করল দ্বারিক। হাতের তালুতে একটা শব্দ বাজাল। কিন্তু সাপটা তার দিক পরিবর্তন করল না। যেমন আসছিল তেমনি হোগলার খোপের দিকে এগোতে লাগল। দ্বারিক খুব ঘাবড়ে গেল। খরিশের মার সব ঝাড়-ফুঁকের বাইরে। তা সে ওঝারা যতই বুক চাপড়াক না কেন। খরিশের বিষ নামাতে আজ পর্যন্ত দ্বারিক কোন ওঝাকে জীবনে দেখে নি। তাই মানুষ যেমন সাপটার দূরে দূরে থাকে সাপটাও তেমনি মানুষের কাছে সহজে আসতে চায় না। কিন্তু আজ দ্বারিকের সাড়া পেয়ে সাপটার যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। অথচ দ্বারিক অনেকবার দেখেছে মুখ দিয়ে একটু শব্দ জাগালেই খরিশেরা অন্য পথ ধরে। সাপটার এই ব্যতিক্রম মতিগতিই খুব ঘাবড়ে দিয়েছে। দ্বারিক উঠে দাঁড়াল। উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। ঘরের কোণ থেকে বর্শাটা নিয়ে এসেছে সে। সাপটা তেমনি এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে।

বর্শাটা বাগিয়ে ধরে দ্বারিক শেষবারের মত মুখ দিয়ে শব্দ করল। সেই শব্দে সাপটা থেমে গিয়ে ফণা তুলে কোমর দুলাচ্ছে। এখনই ছোবল মারবে বুঝি। দ্বারিক আর অপেক্ষা না করে বর্শা ছুড়ল। বর্শাটা সাপটার মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সেই চোটে মাথাটা থেঁতলে দিয়ে গেছে। সাপটা শেষবারের মত ফণা তোলার চেষ্টা করে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। থরথর করে লেজটা কাঁপতে কাঁপতে খুব ঘুরপাক খেল। খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেতে খেতে খানিকটা জায়গা জুড়ে চক্কর দিল মাটিতে। এক

সময় থেমে গিয়ে মাথাটা আকাশের দিকে তুলে মুখটা হাঁ করে রইল। খুব বিরাট হাঁ একটা। দ্বারিক ঝুঁকে পড়ে দেখল সাপটার বিষ দাঁতগুলো। মুখের ভেতরটা টকটকে লাল সাপটার; কেমন ভয় ধরিয়ে দেয়। মুখটা তেমনি হাঁ করে অনেক সময় থাকল সাপটা। ক্রমে মুখটা বুজে আসছে। দেহটা স্থির হয়ে আসছে। লেজটা এখনও থরথর করে কাঁপছে শুধু। দ্বারিক বর্শাটা তুলে এনে একবার দুবার তিনবার আঘাত করল সাপটাকে। সাপটা চারখণ্ড হয়ে গেছে। চারটে টুকরোর দিকে দ্বারিক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এক অশান্ত ইচ্ছা তাকে যেন পেয়ে বসেছিল। সাপটার এই চারটে টুকরো দেখবার জন্যই হয়ত। ছোট জীবন এখন চারটে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে। তাই এখন সে মৃত। অথচ দ্বারিক যখন প্রথম সাপটাকে দেখেছিল তখন এরকম কোন ইচ্ছাই ছিল না। শুধু মুখ দিয়ে শব্দ জাগিয়ে সাপটার চলার গতিপথ অন্য দিকে করা ছাড়া।

অনেকক্ষণ দ্বারিক চারটে টুকরোর দিকে তাকিয়েই ছিল স্থির চোখে, তার হুঁশ হল শুকরামের ডাকে। শুকরাম তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁধে একটা মোরগ। বেলতলীর হাটে দ্বারিককে নিয়ে মোরগের লড়াইয়ে যাবে সে। তাই দোস্তকে এসেছে ডাকতে। দ্বারিকেরও শুকরামকে দেখে মনে হল আজ বেলতলীর হাটে মোরগের লড়াই। কোন কথা না বলে তোগলার খোপ থেকে মোরগটা বের করল সে। মোরগটা দুই তিন বার জোরে পাখা ঝাপটাল। কিন্তু ততক্ষণে দ্বারিক মোরগটাকে বাগে এনে কাঁধে ফেলেছে। শুকরামের সামনে এসে দাঁড়াল সে। একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে চরণের নাম ধরে ডাকল। ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে দ্বারিক।

দোস্তের এই চটপটে ভাব দেখে শুকরাম সর্দার খুব অবাক হয়েছে। সেই নিস্তেজ, ঝিমমারা ভাবটা যেন দোস্তের কেটে গেছে। মোরগটাকে কাঁধে ফেলে গাংভেড়িতে গিয়ে দোস্তকে ডাকতে আসার সময় শুকরাম ভেবেছিল তাকে খুব বেগ পেতে হবে। দ্বারিক হয়ত যেতেই চাইবে না, কিন্তু এখন সে দেখল দোস্ত যেন অন্য মানুষ, সকাল অবধিও যেমনটি ছিল তেমনটি আর নেই।

চরণ কদবেল গাছটার তলায় বসে বসে সারা দুপুর দুটো শামুকখোলের ঝগড়া দেখছিল। সে আজকাল বেশী দূরে যায় না। ঘরের আশেপাশেই থাকে। পিতাজীর ডাক শুনে কদবেলের ছায়া থেকে উঠে এল। অনেকদিন পর পিতাজী তার নাম ধরে গলা ছেড়ে ডাকল।

চরণ এসে দাঁড়াতেই ওরা তিনজন বেলতলীর দিকে রওনা দিল। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। ফিরতে সেই সন্ধ্যা।

আজকের হাটে জনসমাগম একটু বেশী। শীতের প্রথম লড়াইয়ের দিন। তাই গোসাবা রাঙাবেলিয়া থেকেও লোক এসেছে। কেউ বা লড়াইয়ে যোগ দিবে, কেউ কেউ দেখতে এসেছে। সবখানেই একটা উত্তেজনা, জটলা আর লড়াই নিয়ে আলোচনা চলছে। আর কিছুক্ষণ পরেই লড়াই শুরু হবে। সুন্দরবনের মোরগের লড়াই। হাঁকডাক খুব আছে। এই লড়াইকে কেন্দ্র করে হাটে অনেক সুযোগ সন্ধানীরা এসে জোটে। মোরগের ব্যাপারীরা আছে। এমনিতেই শীতকালে বাদা অঞ্চলে লড়াইয়ের মরশুমের সময় মোরগের দাম দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আট-দশ টাকার কম একটা জোয়ান মোরগ পাওয়াই যায় না। লড়াইয়ের দিন দাম আরও চড়ে। ব্যাপারীরা ঠিক জানে, নেশা করে, উত্তেজনার মাথায় হেরে গিয়ে আরেকবার লড়াইয়ে নামবার জন্য সর্দার বা মুরারীরা কোনও দামে পিছপা হবে না। তখন টাকা যেন ভূতে জোগায়। ব্যাপারীরা ঝোপ বুঝে কোপ মারে। তাছাড়া দালালের দল, কড়া সুদে টাকা ধার দেয় তারা। সবার ট্যাঁকে রূপেয়া থাকে না। অথচ মোরগ কিনতে হবে। যে কোন সুদে রাজী হয়ে যায়; তখন লড়াইটা বড় কথা।

সাহাজীর ভাটিখানায় আজ বান ডেকেছে। তার তিনটে কর্মচারী এতটুকু ফুরসৎ পাচ্ছে না, সমানে খদ্দেরকে হাঁড়ি আর হাড়িয়ার যোগান দিতে হচ্ছে। সাহাজী নিমীলিত চোখে বসে বসে বিড়ি টানছে। আর মাঝে মাঝে দুয়েকটা ঝগড়া-বিবাদে মধ্যস্থতা করছে। চারিদিকে একটা হৈ হট্টগোলের, জটলার, জল্পনা-কল্পনার আর উত্তেজনার মৌরসিপাট্টা বসেছে যেন।

দ্বারিক আর দোস্ত শুকরাম চরণকে সাথে নিয়ে সাহাজীর ভাটিখানায় ঢুকল। হাটে এসেই দ্বারিক চরণকে জিলিপী কিনে খাইয়েছে। চরণ জিলিপী এই প্রথম খেল। দুই দোস্তে পাঁচমিশালী ভাজা কিনে চিবোচ্ছে। এখন খানিক হাড়িয়া গিলে চাঙ্গা হয়ে নিতে হবে। লড়াইয়ের জন্য দরকার খানিক উত্তেজনা; আর তার জন্য চাই হাড়িয়া। একথাটা সাফ্‌ সাফ্‌ জানে দ্বারিক আর শুকরাম সর্দার। তাই এসেছে হাড়িয়ায় গলাটা ভিজাতে। দ্বারিক অনেকদিন পর সাহাজীর ভাটিখানায় ঢুকল। সেই এসেছিল নবান্নের পরবের সময়। আর এই আসা।

দুই দোস্তে হাঁড়া নিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় বসেছে। মাটির ভাঁড়ে হাড়িয়া ঢেলে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছে। একটা মৌতাতের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে দুজনাই। দ্বারিক একসময় দোস্তকে জিজ্ঞাসা করল নিবারণের কথা। নিবারণ সর্দার লড়াইয়ে এসেছে কিনা সেটাই জিজ্ঞাসা করল দোস্তকে। এখন নিবারণের কথা কেন জানি তার মনে এল। রূপচাঁদের ঘর ছাড়ার পর নিবারণ কয়েকদিন ঘুর ঘুর করেছে দ্বারিকের ভিটার পাশে। কি যেন বলি বলি করে বলতে পারে নি সে। শেষে গাংভেড়িতে একদিন মুখোমুখি হয়ে দ্বারিকের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল তোর বেটী আমার বেটার বহু হলে তুই হতি পয়লা কুটুম্বী কিন্তু এর লেগে বেটা-বেটির ঘর ছাড়ার কি জরুরৎ ছিল। শাই-জোয়ান বেটা আমার বুড়া বাপ, জমিন, সব ফেলে দেওয়ানা হল, আমার হাল কি হবে রে! দ্বারিক কিছু বলতে পারে নি। মনে মনে সে বুঝেছিল নিবারণ সর্দারের শাই জোয়ান বেটার শোক। সেই শোকে সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই তার। হাড়িয়ায় চুমুক দিতে দিতে সেই সব কথা মনে হল দ্বারিকের। নিবারণ সর্দারের দুঃখ, এর সাথে তার দুঃখটা যেন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। বুকের পাঁজরে দুজনার বেদনাই এক। সেটা দ্বারিক আর নিবারণ ছাড়া আর কে সমঝাবে। এই ক'দিন দ্বারিক কারও সাথেই কোন কথা বলে নি। এমন কি দোস্তের সাথেও না। আজ অনেকদিন পর হাড়িয়ার মৌতাতে অনেক কথা মনে আসছে তার; অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। তাই দোস্তকে ঝোঁকের মাথায় এটা সেটা প্রশ্ন করছে।

একসময় ওরা উঠল। লড়াই শুরু হয়েছে। হাটের পুব কোণে একটা ফাঁকা মত জায়গায় বেশ ভীড় জমেছে। কয়েকটা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেছে ভীড়টা। ছোট ছোট দলগুলি পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে হাড়িয়ার নেশায় আর লড়াইয়ের উত্তেজনায় চেঁচামেচি শুরু করেছে। হাত পা ছুঁড়ছে কেউ কেউ। দ্বারিক আর শুকরাম সর্দার চরণকে সাথে নিয়ে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল। কয়েকটা লোক তাদের মোরগের একটা পাখা ধরে শূন্যে দোল খাওয়াচ্ছে। মোরগগুলো বাতাসে পাখা ঝাপটাচ্ছে। কেউ কেউ নিজের নিজের মোরগকে নানা কথায় সোহাগ করছে। কেউ বা মোরগের চোখে নেকড়ার পটি বেঁধে রেখেছে। লড়াইয়ের সময় খুলে দিবে। শীতের বেলায়ও উত্তেজনায় লোকগুলো ঘেমে উঠেছে। একদিকে একটু ফাঁকা জায়গায় দুজন লোক চেয়ার পেতে বসেছে। লোক দুটোকে পুলিশের লোক বলে মনে হচ্ছে। তাদের গায়ে খাঁকী পোশাক। মাথায় টুপি। শুকরাম দ্বারিকের কানে কানে বলল—সন্দেশখালির বড় আর ছোট দারোগাবাবু। কি একটা খুনের তদন্তে এসেছে দু'জনায়। হাটবারে মুরগীর লড়াই শুনে লড়াই দেখবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল। হাটের মহাজন শিবু ডিঙা তাড়াতাড়ি দুটো চেয়ার পাঠিয়ে দিয়েছে হুজুরদের বসবার জন্য। কথাটা হাটে এসে শুনেছিল শুকরাম। এখন দ্বারিককে বলল। তার কোনও চিনতে ভুল হল না ঐ দুটো দারোগা বাবুই।

গোসাবার পাঁচু মুরারী তার মোরগটার একটা পাখনা ধরে বুক চাপড়াচ্ছে। লড়াইয়ে ডাকছে সে অন্য কোন মরদকে। ভাবখানা এমন যেন লড়াইটা তার মোরগের সাথে নয়, তার সাথেই। দ্বারিক দোস্তকে এক ঠেলা দিয়ে পাঁচু মুরারীর এই রোয়াবের জবাব দিতে বলল। শুকরাম তার মোরগটা নিয়ে এগিয়ে গেল। দুজনাই মোরগের পায়ে ধারাল ইস্পাতের ছোট ছোট ছুরি বেঁধেছে। লড়াই শুরু হল।

চারিদিকে একটা হল্লা উঠেছে তখন। কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই শুকরামের মোরগটা চোট খেয়ে হঠাৎ পিছন ফিরে দৌড় মেরেছে। গোসাবার সর্দার মুরারীদের মধ্যে হাসির রোল উঠল।

শুকরাম হাত পা ছুঁড়ে মোরগটাকে উৎসাহ দিচ্ছিল ; তার সাথে দ্বারিক। চরণও লাফিয়ে লাফিয়ে চাচাজীর হয়ে চীৎকার করছে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মোরগটা পেছন ফিরে দৌড় মেরেছে। পাঁচু মুরারী এক লাফে হুঙ্কার ছেড়ে শুকরামের মোরগটা ধরে তার এক সাকরেদকে দিল। তার মোরগটা এখন পায়ের কাছে ঘুরপাক খাচ্ছে। লড়াইয়ে জিত হয়েছে তার। তাই শুকরামের মোরগটি সে পাবে। দ্বারিক দোস্তের উপর খুব চটে গেছে। কেমন মোরগ এনেছে সে যে একটু চোট খেলেই লেজ তুলে দৌড় মারে। হাটের মাঝে লোক হাসাবে। দুকথা শুনাবে সে দোস্তকে ভাবল। কিন্তু দোস্তের দিকে তাকিয়ে দেখল সে কেমন যেন বেকুব বনে গিয়ে ভিড়ের মাঝে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এতটা বেইজ্জতি হতে হবে সে ভাবে নি। দ্বারিক দোস্তের কাছে গিয়ে ভাল দেখে দুটো ধারাল ছুরি তার মোরগটার পায়ে শক্ত করে বাঁধল। মোরগটার নাকের উপর খুব করে দুটো ডলা দিয়ে সে পাঁচু মুরারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ল। পাঁচু রহস্য হেসে তার মোরগটা নিয়ে এগিয়ে আসছে। লড়াইয়ে প্রস্তুত সে। দুটো মোরগ মুখোমুখি করে ছেড়ে দিয়ে দ্বারিক আর পাঁচু সরে এসেছে। লড়াই শুরু হল।

পাঁচুর মোরগটা দেখতে না দেখতেই আক্রমণ শুরু করেছে। কিন্তু দ্বারিকের মোরগটা সেই প্রাথমিক আক্রমণ বাঁচিয়ে একখানে দাঁড়িয়েই শুধু পা দিয়ে ধুলো উড়াচ্ছে। সারা শরীরটা নাচাচ্ছে অল্প অল্প। ঠিক যেন নাচছে। সেই দেখে পাঁচুর মোরগটা রেগে শূন্যে পা ছুড়ছে আর পাখা ঝাপটাচ্ছে। দুদিকেই হল্লা উঠেছে খুব জোর। লড়াইটা জমবে বটে। সবাই বলাবলি করছে। একসময় দুটো মোরগই মাথা নিচু করে সামনাসামনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথায় মাথায় ঠোক্কর লাগবে এখনই। সমস্ত ভিড়টা উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে। পাঁচুর মোরগটা দ্বারিকের মোরগের পেটে খানিকটা চিরে দিয়েছে। পাঁচু মুরারীর সাঙ্গপাঙ্গরা উল্লাসে ফেটে পড়েছে। এমন উৎ কণ্ঠা আর উত্তেজনার ভেতর লড়াই চলল অনেকক্ষণ। ধুলোয় চারিদিক ঢেকে গেছে। তার সাথে ভিড়ের চীৎকার হট্টগোল আর উল্লাস ধ্বনি। একসময় দ্বারিক মুখ

দিয়ে এক বিকট আওয়াজ করল। ভিড়টা থমকে গেছে সেই আওয়াজে। আর সবাই দেখল কোন ফাঁকে সূর্যবেড়িয়ার দ্বারিক সর্দারের মোরগটা পাঁচু মুরারীর মোরগটার গলায় ধারালো ছুরিটা বসিয়ে দিয়েছে। মোরগটা অন্তিম চীৎকার ছেড়ে কাৎ হয়ে মাটিতে পড়ল। কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির হয়ে গেল একসময়। দ্বারিক দৌড়ে গিয়ে ধুলো ঝেড়ে পাঁচুর মোরগটা তুলে এনেছে। তার সাথে নিজের মোরগটাও কাঁধে ফেলেছে। চোখেমুখে তার জয়ের উল্লাস। দোস্ত শুকরাম এসে দ্বারিকের পিঠে একটা বিরাশী সিক্কার চাপড় মেরে সাবাস জানাল। দ্বারিক তার বেইজ্জতের পাল্টা নিয়েছে। শুকরাম সর্দার খুব খুশি। এমন না হলে দোস্ত! চরণ পিতাজীর কাছে এসে ঘুর ঘুর করতে লাগল। এই জিতে তারও খানিকটা অংশ আছে। সে রোজ কেঁচো, ধানের খুৎ মোরগটাকে জোগাড় করে এনে খাওয়াত। দেখাশুনা করত। মোরগটা সে কথা মনে রেখেছে। লড়াইয়ে জিতে সূর্যবেড়িয়ার মুখ রেখেছে। চাচাজী, পিতাজীর নাম রেখেছে। তাই চরণ খুব খুশি। কাল সকালেই সে মোরগটার ক্ষত স্থানে কদবেলের আঠা গরম করে লাগিয়ে দেবে। দেখতে দেখতে কাটা জোড়া লাগবে।

দ্বারিক, শুকরাম চরণ ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। আসতে আসতে তারা শুনল অনেকে দ্বারিককে সাবাস জানাচ্ছে। একখানা লড়াই হয়েছে বটে। আবার কবে লড়াইয়ে আসছে দ্বারিক একথাও অনেকে জানতে চাইল। দ্বারিক সব প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিয়ে ভিড় থেকে ছাড়া পেল। এবারে ঘরের পথে রওনা হবে তারা। কিছু সামান্য কেনা-কাটা সেরে নিয়ে।

সাঁঝের বেলা ঘনিয়ে এল। দুই-একটা তারা ছিটিয়ে ছড়িয়ে আকাশে উঠেছে। বেশ রাত করে ভাঙ্গা চাঁদ আকাশে দেখা দেবে। তাই সন্ধ্যার ভেড়ি অন্ধকার। হাড়িয়ার নেশায় আর লড়াই-এর উত্তেজনায় ওরা স্খলিত পদে গাংভেড়ির পথ ধরল। কিন্তু এই ক্লান্তির সাথে জয়ের আনন্দও মিশে আছে। যেমন ঘামের সাথে কাজের আনন্দটুকু।

চরণের কাঁধে তাদের মোরগটা। মোরগটা চরণের পোষ মেনেছে। তাই কাঁধে চুপ করে চোখ বুজে পড়ে আছে। দ্বারিক মরা মোরগটা

পিঠে ঝুলিয়ে পথ হাঁটছে। মোরগটার গলা থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। সারা পথ সে রক্ত চিহ্ন আঁকবে। নিশানা তৈরী করবে। উদাম পিঠে মোরগটার রক্তের স্পর্শ পেয়ে সেই কথাই ভাবল দ্বারিক, অন্ধকার গাংভেড়িতে পথ হাঁটতে হাঁটতে। অনেকদিন পর তার মনে হল সূর্যবেড়িয়ার মাটিতে সর্দার পল্লীর কদবেল গাছটার পাশে তার একটা ছোট ঘর আছে। আর সেই ঘরের পথেই রওনা হয়েছে সে। সঙ্গে আট বছরের বেটা চরণ আর বাচপানের দোস্ত শুকরাম সর্দার।

গাংভেড়ির পাশে বিদ্যাধরীর নোনা স্রোতটা তির তির করে বইছে। উত্তরের কনকনে হাওয়ায় নদীর ধারে গেঁও হেঁতালের ঝোপ-ঝাড়ে একটা মৃদু শব্দ উঠছে। দুয়েকটা কোরাল বা জলতিতির মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ছে। মাঝ নদীতে দুই-একটা গৃহস্থ নৌকা। নৌকার টিম টিম আলো নোনা জলে চিক চিক করছে। যাওয়া স্রোতটা তখন স্পষ্ট হচ্ছে। সেই স্রোতটা দ্বারিকের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে। যেখানেই পথ হারাক না দ্বারিক এই স্রোতটা ঠিক তাকে ঘরে পৌঁছে দেবে।

ভেড়ির পাশে নোনা স্রোতের রেখা আর গাঙভেড়ির আঁধারে মোরগটার লাল রক্তের ধারা যেন পাশাপাশি বয়ে চলেছে। আর দুটোই দ্বারিকের মনে জীবনের সাড়া জাগাচ্ছে। ঘরের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। ঘরের কথা মনে আসতে আরও অনেক সঙ্কল্পের কথা মনে আসছে। অনেক বাসনা-কামনার। অনেক আশা-আকাঙ্খার। সেগুলো দ্বারিকের মনে দূর আকাশের তারার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সব দিয়ে দ্বারিক একটা মালা গাঁথতে পারে নি। অথচ মালা গাঁথার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু সারা জীবনে সে সুযোগ আর অবসর তার মেলে নি। তাই অনেক কিছু হারিয়ে গেছে চিরদিনের মত! অনেক কিছু ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে। তীরভূমির কাঁকড়ারা, গেঁও-হেতালের ঝোপ-ঝাড়ে বাতাসের মৃদু স্পন্দন, গৃহস্থ নৌকার টিম টিম বিধুর আলোয় বিদ্যাধরীর চিকচিকে নোনা স্রোতটা, দূর আকাশের টাটকা ফোটা তারারা সবাই স্মৃতির চামর বুলাল দ্বারিকের মনে। অবসাদগ্রস্ত মনে তাই একটা তরঙ্গ উঠেছে। জীবনে বোঝাপড়ার, হিসেব নিকেশের শালতামামির একটা বিশেষ

অবস্থা। আর এসবকিছুই দ্বারিককে পথ হাঁটতে সাহায্য করছে যেন। গাংভেড়ির অন্ধকার পথে একটা সুর জাগাচ্ছে ;পাঁওদলের সুর।

বিদ্যাধরী যে জায়গায় হঠাৎ মোড় ঘুরেছে। সেই বাঁকের মাথায় এসে দাঁড়াল তিনজনে। চরণই প্রথম আঙুল দিয়ে পিতাজী আর চাচাজীকে আকাশের দিকে নির্দেশ করল। তিনজনেই থেমে গিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। অনেকখানি আকাশ জুড়ে একটা আলো পড়েছে। সেই আলোর আকাশ চোখ মেলে দেখছে ওরা। আকাশের বুকে এমন আলো অনেকদিন আগে একবার দেখেছিল সর্দার পল্লীর সবাই। আর আজ আরেকবার দেখতে পেল। আলোর আকাশ কেমন তাদের মনের বিস্ময় জাগিয়েছে।

বিদ্যাধরী, বাসন্তী ছাড়িয়ে পুরন্দরের মুখ। সেখান থেকে কলের জাহাজ মাতলার বুকে জল কেটে ক্যানিং বন্দরে এসে থাকবে। ক্যানিং বন্দরে লোহার পথে কলের জাহাজের মত কলের গাড়ি অপেক্ষা করে আছে যাত্রীর জন্য। সেখান থেকে দেড় ঘণ্টায় কলের গাড়ি পৌঁছে দেবে সে এক মহানগরীতে! সেখানে আছে উঁচু উঁচু ঘরবাড়ি, কলের গাড়ি, কলের মানুষ, হরেক কলের কারসাজি সেখানে! আর সেখানে আজব আলোর মেলা। আজব তার আয়োজন। সেই আলো লক্ষ-হাজার, শত শত মাইল ছুটে চলেছে এদিক ওদিক। কিন্তু তিরিশ মাইল আগে এসে থেমে গেছে ক্যানিং বন্দরে। সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে অন্ধকার নোনা সমুদ্র। আর তেমনি কোন অন্ধকার তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে নোনা তীরের মানুষেরা দেখতে পায় অন্ধকারের বুকে আলো। সে মহানগরী! কিন্তু তার খোঁজ এরা রাখে না। শুধু পুলক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

দ্বারিক শুকরামকে বলে এমনি এক আলোর দেশের গল্প শুনেছে সে তার ঠাকুমার কাছে। রূপকথার গল্প তা। ছোটবেলায় পশ্চিমের ঘরে বৃষ্টির দিনে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঠাকুরমার গা ঘেঁষে বসে এসব গল্প শুনত ওরা। শুকরাম মাথা নাড়ল। আলোর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্বারিকের এক সময় মনে হল অন্ধকার গাংভেড়ি থেকে কে যেন বলছে—পিতাজী দূরসে ভাগ যাই চল্……।

চমকে উঠল দ্বারিক, সারা গায়ে তার কাঁটা দিয়েছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল শুধু ওরা তিনজন। আগে পাশে কেউ নেই। শুধু অন্ধকার। চরণটা যখন ভুখায় ধুঁকত, সারা সকাল-সন্ধ্যা ভাত ভাত করে কাঁদত আর বৃষ্টিতে ভাঙ্গা চালার তলায় বসে বসে ভিজত, সে যখন পারে যাত্রী নেই বলে জলে নৌকা না ভাসিয়ে ঘরে বসে ঝিমাত, তখন মাঝে মাঝে সোনামনি, ষোলঋতুর বেটীটা তার খুটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে শান্ত গলায় বলত—পিতাজী দূর ভাগ যাই চল। কতদিন কাছে টেনে বেটীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে দ্বারিক। আজ অন্ধকার গাংভেড়িতে দাঁড়িয়ে একটা সত্য দ্বারিক যেন হঠাৎই উপলব্ধি করল বেটীটা তাকে নিশানা দিয়েই ঘর ছেড়েছে ; পথে পা দিয়েছে।

অন্ধকার গাংভেড়িতে অনেকে এসে ভিড় করেছে যেন দ্বারিকের পাশে। রাক্ষসবন্দী ঘাটের অজগর ময়াল প্রান্তরের বাসিন্দা ঝুমুর ধাই, রূপচাঁদের বুঢ্ঢা বাপ নিবারণ সর্দার, অন্ধ বুড়ি দুর্গামণি, রাঘব ডিঙ্গালের নায়েব রতিকান্ত শ্যামল, তার আঠার-কচি বউ কমলা, আর দ্বারিকের সাধের বিবি শুক্রমনি। সব জীবিত ও মৃতদের ভিড়। আর সবার মাঝখানে ভাঙ্গা ছাতির তলায় রঙ-বেরঙের তালিমারা আলখাল্লা গায়ে আসান প্রদীপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রসুল ফকির। ঠোঁটে তার রহস্যের মিষ্টি হাসি। রতিকান্ত শ্যামল যেন সত্যি সত্যিই এবারে দ্বীপ ছাড়বে। ঝুমুরধাই তার জড়িবুটির পুটলি পাঠানখালিতে ডুবিয়েছে। শুক্রমনির চোখজোড়া আধ-ফোটা রক্তজবার কুঁড়ির মত আর লাল নয়। গড়খাইয়ে ফুটে থাকা পদ্মের মত নীল হয়ে গিয়ে মধুর হাসছে। সবাই মিলে তাকিয়ে আছে আকাশের আলোর দিকে।

দুপুরে সেই মৃত খরিশের অন্তিম 'হাঁ' এর কথা মনে পড়ল দ্বারিকের। বর্শায় বিদ্ধ চারটি খণ্ডের কথা মনে পড়ল। দুপুরের রোদে যে খরিশটা দ্বারিককে অবসাদ থেকে জাগিয়েছে, অথচ দ্বারিকের হাতেই মরেছে। এই রাত্রির অন্ধকারে মনে হল যেন আবার তার চারটে খণ্ডকে জোড়া লাগাতে পেরে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অনেক পথ বুকে হেঁটে সাপটাও এসেছে তীরভূমির অন্ধকার বাসরে।

যেখানে কান্না হবে আলো। বর্শা হবে বাঁশী। আর নোনাজলে সাঁতার কেটে একদিন মিঠে জলে পৌঁছাবে তারা। সবাই মিলে।

বিদ্যাধরীর মাঝ দরিয়ায় হাসনাবাদের কলের জাহাজ জল কাটে। যেন রাজহাঁস রে। সে শব্দে হুঁস হল ওদের।

ঘরের পথে কদম ফেলল ওরা তিনজন। এখনও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।